পত্রাদি পাইয়া তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, ইংরাজদিগের অসহনীয় অত্যাচার ও ব্রিটিশ হস্ত হইতে গরীয়সী জন্মভূমিকে উদ্ধার করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের পরিশিষ্ট সার্থক করিবেন। তিনি সঙ্কেতে বলিয়াছেন যে, "তিনি রুষরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—তিনি প্রাণপণে রুষরাজের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যত্নবান হইবেন, ইহার জন্য তিনি অর্থ কিম্বা কোনরূপ পুরস্কার প্রার্থনা করেন না, কারণ তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে তাঁহার আবশ্যক মত অর্থ দান করিয়াছেন। মহারাণী হইতে তাঁহার কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট ৩২ বৎসর কাল যথেষ্ট সদ্ব্যবহার পাইয়াছেন, তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, যে শঠ বঞ্চকের করকবলে নিপতিত হইয়া তাঁহার যে রাজ্য ও প্রভূত সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ কেবলমাত্র এইরূপ সভ্যতানুরুদ্ধ সদ্ব্যবহার হইতে পারে না। অনেক অর্থ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, এ কথাও তিনি বলেন। পরিশেষে তিনি শাসন নীতি সম্বন্ধে রুষ ও ইংরাজের তুলনা করিয়া ইংরাজদিগকে সন্ধিচুক্তি-ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক প্রতারক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।" ষ্টেটস্‌ম্যান ৮ই অক্টোবর, ১৮৮৭।

মহারাজা দলীপসিংহ কতদূর পর্য্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি বিলাতে থাকিতেই বলিয়াছেন। ইহার সত্যাসত্যের বিষয় আমরা কিছুই বলিব না। সুচতুর পাঠক, আমরা যে খানকয়েক পত্র ও সম্বাদপত্র উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারিবেন।

সম্বাদপত্রের কার্য্য সম্বাদ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করা। দলীপের কথা এ কাণ সে কাণ হইতে হইতে ক্রমে যথানিয়মে সম্বাদ পত্রে স্থান পাইল। সম্পাদক লিখিলেন "দলীপ বলেন—ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক তাঁহাকে (৫০,০০০ পাঃ) পঞ্চ লক্ষ্য মুদ্রার অধিক দিবেন এইরূপ কথা; কিন্তু তিনি (২৫,০০০ পাউণ্ড) দুই লক্ষ্য পঞ্চাশ হাজার টাকার কিছু বেশি পাইয়াছেন। বক্রী টাকা সুদ সমেত প্রায় তিন ক্রোর টাকা হইবে এবং ইহাই তাঁহার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রাপ্য। তিনি এই টাকা প্রথমে মিঃ গ্লাডষ্টোনের নিকট চাহিয়াছিলেন, মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোন তাঁহাকে ইণ্ডিয়া অফিসে চাহিতে বলিলেন। ইণ্ডিয়া অফিস্ আবার তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের নিকট চাহিতে বলিলেন। তিনি আর কি করিবেন, পরিশেষে আদালতে যাইবেন, স্থির করিলেন। কিন্তু আদালত হইতে তিনি শুনিলেন যে, আদালত বিলাতের সমস্ত ব্যক্তিরই জন্য, তাঁহার জন্য নহে। এইরূপে নানা স্থানে তাড়িত বিতাড়িত হইয়া অন্য কিছু উপায় না দেখিতে পাইয়া এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, যদি তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করা হইত, তবে তিনি ইংরাজ অধীনে থাকিতেন, থাকিতে ভালও বাসিতেন।" ব্রিষ্টল মার্কারী, ৩০ মে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

৪ঠা জুনের ব্রিষ্টল ডেলিনিউস্ উল্লিখিত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিষয় একরূপই, অনুবাদ আর করিলাম না। "* * * * and has suddenly discoverd that there are arrears of

allowances due to him which, with interest, amount to over two millions sterling. In pressing his claim he first had recourse to Mr. Gladstone, who referred him to the India Office. The India Office pointed out that the question of his allowances was a matter for the Government of India; and when he proposed to have the matter tried in a court of law he found that was impossible. * * *"

এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাৎসরিক কত প্রাপ্য। দলীপ বলেন, পাঁচ লক্ষের অধিক, অর্থাৎ ৫০,০০০ পাউণ্ড; কিন্তু "টাইমস" তাহা বলেন না। "টাইম্‌স" বলেন, চারিলক্ষের অধিক অর্থাৎ ৪০,০০০ পাউণ্ড, আর বলেন যে, তাঁহাকে তাহা সমস্তই দেওয়া হইত। কিন্তু দলীপ তাহা বলেন না, দলীপ ২,৫০,০০০ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ ২৫,০০০ পাউণ্ড ভিন্ন আর অধিক পাইতেন না। এখন কাহার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব? ইংরাজ দলীপের কথা বিশ্বাস করিবেন না, কারণ দলীপ ভারতবাসী, তাঁহারা টাইম্‌সের কথাই বিশ্বাস করিবেন। এ অবস্থায় আমরা কাহার কথা মানিয়া লইব? আমরা যাহা কিছু জানি শুনি, তাহা ইংরাজ মহাত্মাদিগের নিকট হইতে, তাহা রঞ্জিত হউক বা অতিরঞ্জিত হউক, সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাহা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে; কারণ, আমাদিগের দেশে শিক্ষিত লোক অনেক আছেন, কিন্তু ইতিহাস-লেখক নাই, কোন বিষয়ের গবেষণাও নাই, তাহার জন্য যত্নও দেখি না। খুঁজিয়া লইয়া অল্প পরিশ্রম করিয়া কোন বিষয়ের সত্যাসত্যের বিষয় প্রমাণে সদাই পরাঙ্মুখ। আমরা বাঙ্গালী, অত গোলোযোগ বুঝি না বা গোলোযোগের ভিতর যাইতেও চাহি না।

আমি বাঙ্গালী ইতিহাস-লেখককে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করিতেছি;—"পঞ্জাব গ্রহণের অঙ্গীকার পত্রে দলীপসিংহ ও তাঁহার পোষ্যবর্গের জন্য বার্ষিক বৃত্তি অন্যূন ৪ লক্ষ ও অনধিক ৫ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল,কিন্তু রাজ্যচ্যুতির পরে দলীপ সিংহ প্রথমে বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পাইতেছিলেন। সাত বৎসর পরে উহা বাড়াইয়া বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা করা হয়। ১৮৫৮ অব্দ হইতে দলীপসিংহকে বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়।" আর্য্যকীর্ত্তি পৃঃ ৯৫। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দলীপ আড়াই লক্ষ টাকা বই আর অধিক কিছু পাইতেন না। কিন্তু বাঙ্গালী ইতিহাস-লেখকের বা দলীপের কথা কেহ বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু একজন হিন্দু বিরোধী ইংরাজ সম্পাদক বলিতেছেন "তিনি বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা পেনসান্ পাইতেন।" তাঁহার আর দুই এক ছত্র তুলিয়া দিলে তিনি কি প্রকৃতির লোক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন ও সহজেই তাঁহার কথা বিশ্বাস হইবে। তাহার পর লিখিতেছেন;—

"and if it is proved that he is trying to stir up sedition in the Punjab or to excite hostility against England in Russia or elsewhere, the first and proper thing to do is to stop his supplies entirely and order him off

But Englishmen very wisely laugh at the idiotic vagaries of bragging Irishmen and fanatical Sikhs. Let them go and bluster where some one cares two straws about them, say Belfast and Cabul. There would be some credit in that."

An English Paper, June, 3. 1887.

বিলাতে চিরকাল অবস্থিতি করিতে দলীপের ইচ্ছা ছিল না। তিনি বিলাত পছন্দ করিতেন না। কেন করিতেন না, তাহার অনেক কারণ আছে। এস্থলে তাহা আমার বলিবার অধিকার নাই। তবে একটু না বলিয়াও থাকিতে পারি না, বিলাত তাঁহার হাড়ে হাড়ে বিধিয়াছিল, হাড় ভাঙ্গা করিয়াছিল, বিলাত তাঁহার সহিত একীকরণ হইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি পছন্দ করিতেন না।

যখন সিপাহি বিদ্রোহানলে ভারত প্রজ্বলিত হয়, তখন দলীপের বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তিনি তাহা এখানে আসিয়া নিবাইয়া দেন। ইংরাজ তাঁহাকে সে সময়ে আসিতে দিলেন না, তখন তিনি বেশ জানিলেন, তিনি বন্দী। ইংরাজও তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য কিছু টাকা বাড়াইয়া দিলেন। অগ্নি নিবাইতে আসিতে দিলেন না।

আবার তাঁহার স্বদেশ আসিবার ইচ্ছা হইল। ইংরাজ বুঝিলেন, স্বদেশ আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই আবার বুঝি পেন্‌সনের টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, দলীপ এইরূপ মনে করেন; কিন্তু এবার তাহা করা হইবে না, এখন ত ভারতে কোন গোলোযোগ নাই। তবে এখন তাঁহাকে আর যাইতে দিবার বাধা কি? বিলাতে মিছামিছি টাকা লইয়া গোলোযোগ করিতে না দিয়া বরং তাঁহাকে এখন ভারতে যাইতে দেওয়াই শ্রেয়। এই ভাবিয়া ইংরাজ তাঁহাকে স্বদেশে আসিবার অনুমতি দিলেন, তাঁহারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। বিলাতে যাহা কিছু তাঁহার ছিল, সমস্তই বিক্রয় করিলেন। তিনি এখানে আসিবার পূর্ব্বে বিলাত হইতে তাঁহার গরীয়সী জন্মভূমি পঞ্জাবের অধিবাসিদিগকে সম্বোধন করিয়া লিখিলেন ;—

"প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ! ভারতবর্ষে যাইয়া বাস করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সত্যগুরু সকলের বিধাতা। তিনি আমা অপেক্ষা ক্ষমতাশীল। আমি তাঁহার ভ্রান্ত জীব। আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাঁহার ইচ্ছায় ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, ভারতে যাইয়া, সামান্য ভাবে বাস করিব। আমি সত্যগুরুর ইচ্ছার নিকটে মস্তক অবনত করিতেছি; যাহা ভাল তাহাই হইবে।"

"খালসাগণ! আমি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করাতে, আপনাদের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু যখন আমি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হই, তখন আমার বয়স বড় অল্প ছিল।"

"আমি বোম্বাই উপস্থিত হইয়া শিখ ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। * * * * বাবা নানকের অনুশাসন অনুসারে চলিব এবং গুরুগোবিন্দ সিংহের আদেশ পালন করিব।"

"আমার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও আমি পঞ্জাবে যাইয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; এই জন্য আপনা-

দিগকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।”

“ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তাহার সমুচিত পুরস্কার পাইয়াছি। সত্যগুরুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।” ওয়া গুরুজীকি-ফতে, প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ, আমি আপনাদের নিজের মাংস ও রক্ত—দলীপ সিংহ।”*

ইহার স্বফল কি ফলিল, তাহা পূর্ব্বেই আমি উল্লেখ করিয়াছি। ইহার ফল এডেনে তাঁহার গতিরোধ।

মহারাজ দলীপ সিংহের এতদিন পরে হৃদয়ে এ ভাব উদ্রেক হইল কেন? এতদিন ত বেশ আমোদ আহ্লাদে দিন যাপন করিতেছিলেন, তবে এ ভাবে কেন?

ইহার গুটিকতক কারণ আছে—১। মহারাজ দলীপসিংহ মহারাজোচিত কার্য্য কলাপ ও উচ্চ মনের পরিচয় প্রায়ই জনসাধারণকে দিতেন। তাঁহার অর্থব্যয় বিস্তর ছিল। এই সকলের জন্য অনেকে তাঁহাকে “Lives in England in the most aristocratic set.” বলিয়া বৃথা দোষারোপ করিত ও ঈর্ষান্বিত চক্ষে দেখিত। তিনি ইংরাজ বণিক নহেন। এই মহাত্মারা আবার ইহুদিদিগকে “সাইলক্ দি জু” বলিয়া গালি দেন। তিনি বিলাতি জমীদার নহেন বা ধনী নহেন, তিনি বিলাতি লর্ড নহেন। তাঁহার বিলাতে জন্ম নহে বা ইংরাজ রক্ত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত হয় না যে, তিনিও অর্থ-পিশাচ হইবেন, অর্থের জন্য তিনি সকলি করিবেন। অর্থই ধর্ম্ম, অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলেই মোক্ষফল লাভ হইল, এরূপ তিনি মনে করেন না। তিনি মহারাজা, শুদ্ধ মহারাজা নহেন, মহাবীর মহারাজ রণজিৎসিংহ-তনয়। তাঁহার যে অধিক অর্থ ব্যয় হইবে, ইহার বিচিত্র কি? তাঁহার যে দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ টাকায় চলিত না, ইহাতেই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তাঁহার যাহা পাইবার কথা, তাহা তিনি পাইতেছেন না, তাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দিতেছেন না। ইহা অপেক্ষা আর ক্ষোভের বিষয় কি হইতে পারে?

একটী হইতে অন্য আর একটী, আর একটী হইতে অপর একটী ভাবের, এইরূপ ক্রমে ক্রমে অনেক ভাব হৃদয়ে উদয় হয়। ইহা স্বভাব-সিদ্ধ। দলীপ তাঁহার রাজ্যের আয়ের সহিত আর যাহা তিনি ইংরাজের নিকট হইতে পাইতেছিলেন, তাহা মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, “তাঁহার খাস সম্পত্তির একটী হইতে বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা আয় হইত। লবণের খনি হইতে বৎসরে প্রায় ৪০ চল্লিশ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত শাল, অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যজাত ছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সম্পত্তির অছি স্বরূপ ছিলেন। তথাপি গবর্ণমেণ্ট অসঙ্কুচিত চিত্তে উহা বিক্রয় করেন। সিপাহি যুদ্ধের সময়ে দলীপ সিংহের ফতেগড়ের আবাস বাটীতে অন্যূন আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট উহার জন্য ৩০ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।”—৯৪ পৃঃ আর্য্যকীর্ত্তি।

২। কহিনুর।—এক দিন তিনি কোন কারণবশতঃ মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। মহারাণী নাকি তাঁহার

* পত্রখানি রজনী বাবুর অনুবাদ।

পিতৃধন কহিনূর বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি মহারাণীর বক্ষে কহিনূর দেখিয়া রাগ ও ক্ষোভে অধীর হইয়া সর্ব্বসমক্ষে মহারাণীকে বলিয়াছিলেন "রত্নখানি পিতার নিকট হইতে চুরি করিয়া তাঁহার অবমাননার জন্য তাঁহার সাক্ষাৎ কালীন বক্ষে ধারণ করা হইয়াছে।"*

আর একজন উদারচেতা কহিনূর সম্পর্কে কি বলিতেছেন, শুনুন।—"All sorts of stories are told and credited of Dhuliph singh, one of them being that his envy of the Koh-i-noor, and wrath at its being in the Queen's possession, embitters his existence. It is to him a talisman that was his father's, and ought to be his, and the annuity granted to him by England was only an insult when the Koh-i-noor was withheld. *True or false, the Moharajah's feeling would not be unnatural were we similarly situated.*"

"* * * * "সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, মহারাজের হৃদয়ে এরূপ ভাবের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। আমরা যদি ওরূপ অবস্থায় নিপতিত হইতাম, তাহা হইলে আমাদিগের ও হৃদয়ে ওরূপ ভাবের উদ্রেক হইত।"

The "East Anglian Daily Times."
June 17, 1887.

৩। বাল্যকাল—তাঁহার বাল্যকালের কথা এতদিনে মনে পড়িল। তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট হেনেরি লরেন্স কিরূপে লাহোর হইতে শেখপুরের নির্জ্জন স্থানে বিনাপরাধে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। বরোদাধিপতি গাইকুয়ারকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে একরূপ বিচার করিয়া শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল। মহারাজ নন্দকুমারের ত সাধারণ বিচারালয়ে বিচার করিয়া ফাঁসি দেওয়াসাব্যস্ত হয়। কিন্তু তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে কিরূপ করিয়া সামান্য একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট শেখপুর কারাগারে প্রেরণ করিলেন, তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। তায় তখন তাঁহার রাজ্য স্বাধীন ছিল। তাহার পর "রেসিডেণ্ট" সার্ ফ্রেডরিক্ ক্যারি কিরূপ করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ঝিন্দনের নিষ্কাসন-লিপি তাঁহার সহি করাইয়া লন, তাহা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, আর অনুতাপে হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। প্রথমে মহারাণী ঝিন্দনকে ফিরোজপুর, তৎপরে বেনারস বা কাশীতে প্রেরণ করা হয়। ঝিন্দন রাজমহিষী ও দলীপের জননী হইয়া মেজর জর্জ্জ ম্যাক্‌গ্রেগর নামক একজন সামান্য সৈনিক পুরুষের তত্বাবধানে রহিলেন। ইহা দলীপের দুঃখের বিষয় নহে? ইহা অপেক্ষা আর কি দুঃখের বিষয় হইতে পারে যে, তনয়বৎসলা মহারাণী ঝিন্দন, অনেক কষ্ট ও অপরিয্যাপ্ত দুঃখ সম্ভোগ করিয়া, পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থায় হীনচক্ষে সপ্ত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, প্রাণাধিক তনয়ের পার্শ্বে ১৮৬৩ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। অপরিচিত অজ্ঞাত স্থানে সামান্যা রমণীর ন্যায় আপনার জন-

"* * * Denounced the Queen in the presence of several persons, for insulting him by wearing on her breast, at an interview with him, a jewel which she had "stolen" from his father."

The Society, June 4, 1887.

নীকে ইহলীলা পরিত্যাগ করিতে দেখিলে কাহার না হৃদয় ফাটিয়া যায় ? তাঁহার মনে হইল, এ সকলের কারণ কে ?

৪। রাজ্য।—ইংরাজ তাঁহার পিতার পরম বন্ধু। অনেক সময় অনেক বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেক উপকার করিয়াছেন। বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার রাজ্যকে ইংরাজের তত্ত্বাবধারণে রাখিলেন, তাহার ফল কি শেষ এই হইল, উপকারী পরম বন্ধুর তনয়ের রাজ্যচ্যুতি ? এগার বৎসরের শিশু এমন কি গুরুতর অপরাধ করিলেন, যাহাতে তাহার রাজ্য বিনষ্ট হইতে পারে ? প্রতিবাসীর জন্য, ভৃত্যের জন্য বা মাতার জন্য এক জনের বিষয় কখন বিনষ্ট হইতে পারে না। যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী কে ? তত্ত্বাবধারক কি নহে ? কিন্তু ইংরাজ রাজনীতি অন্যরূপ। সাধারণ নীতি হইতে ইহা বিভিন্ন। দলীপ বুঝিলেন "যেই রক্ষক সেই ভক্ষক"—ইহাই ইংরাজ রাজনীতি।

৫। ধর্ম্ম।—প্রথম বয়সে প্রায়ই মানুষের ধর্ম্মের দিকে ততটা মতি থাকে না। ক্রমে ক্রমে যতই বয়স বড়িতে থাকে, ততই ধর্ম্মের দিকে মতি হইতে থাকে। ইহাই মানব ধর্ম্ম। দলীপ এগার বৎসর বয়সে খ্রীষ্টীয়ান হন। ১৮৫৩ খৃঃ ফতেগড়ের একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক তাঁহাকে খ্রীষ্টীয়ান করিয়া ইংরাজ ও খ্রীষ্টীয়ান মহলে বড়ই "বাহবা" লন ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় দেন। এত অল্প বয়সে দলীপকে কোন্ আইনানুসারে খ্রীষ্টীয়ান করা হইল, তাহা দলীপ এখনও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন না যে, তিনি ও তাঁহার রাজ্য পঞ্জাব পৃথিবীর সাধারণ আইন কানুন ছাড়া ; স্বর্গেরও তাহাই, বাইবেলে শয়তান ও হিন্দুর নরক রাজ্যের আইনে ঐ সকল পাইবেন।

দলীপের ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখের বা অধিক ক্ষোভের কারণ কি হইতে পারে ? সমস্ত যৌবনই রঙ্গরসে কাটাইয়াছেন। যৌবনের পরসীমা আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়াছেন, ধর্ম্মের দিকে তখনও লক্ষ্য পড়ে নাই। প্রৌঢ়াবস্থার অন্তিমে, বার্দ্ধক্যাবস্থার প্রারম্ভে ধর্ম্মের দিকে মতি যাইল। হৃদয় অনুতাপানলে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। তিনি ভারতে আসিতে চেষ্টা করিলেন ;—কিন্তু তাহা বিফল হইল।

আর দু একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ শেষ করিব। দলীপ স্বদেশে গিয়া ভাল করিয়াছেন কি না ? আমার মতে তিনি ভাল করেন নাই। তাঁহার বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। এ বয়সে তাঁহার এ কাজ সাজে না। এখন তাঁহার ধর্ম্ম চর্চ্চা করাই শ্রেয় ছিল। কারণ,—

"বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন,
দাসত্বের পরিবর্ত্তে দাসত্ব স্থাপন।"
"নাহি কাজ অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতোপরি, দেখি বিধি বিধাতার।
কেন মিছে খাল কেটে আনিবে কুমীরে ?
প্রদানিবে স্বীয় হস্তে স্বগৃহে অনল ?
* * * * * *
* * * * * *
ঘুচিবে কি অত্যাচার বল নৃপবর !
অধীনতা, অত্যাচার নিত্য সহচর।"

পলাশির যুদ্ধ ৩০।৩২।৩৩।পৃঃ

প্রথমাংশ সমাপ্ত।

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ।

গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়—উপসংহার।

আমরা ভারতচন্দ্রের জীবন তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তিনি ১৬৩৪ শকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। সেই তিন অংশের মধ্যে প্রথম অংশ ২০ বৎসর, ১৬৩৪ হইতে ১৬৫৩ শক পর্য্যন্ত। আমরা এই অংশকে "বাল্য-জীবন" আখ্যা প্রদান করিয়াছি। এই বাল্যজীবনে তিনি বিদ্যা শিক্ষা ও বিবাহ করেন। দ্বিতীয় অংশ ২০ বৎসর ১৬৫৪ হইতে ১৬৭৩ শক পর্য্যন্ত। আমরা এই অংশকে "মধ্যজীবন" আখ্যা প্রদান করিয়াছি। এই মধ্যজীবনে তিনি বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে ২।৩ বৎসর বর্দ্ধমানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৬।১৭ বৎসর উদাসীনের বেশে নীলাচলে দেবদর্শন ও শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত হয়। উড়িষ্যায় শঙ্করাচার্য্যের মঠে অবস্থান কালে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এক বৎসর কাল শ্যালীপতি ভ্রাতার বাটীতে, শ্বশুরালয়ে এবং ফরাসডাঙ্গায় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট অবস্থান করেন। তৃতীয় অংশ ৮ বৎসর, ১৬৭৪ হইতে ১৬৮২ শক পর্য্যন্ত। আমরা এই অংশকে "অন্ত্যজীবন' আখ্যা প্রদান করিয়াছি। এই অন্ত্যজীবনই তাঁহার জীবনের প্রধান অংশ। এই অন্ত্যজীবনে তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ নিযুক্ত হয়েন এবং মুলাযোড়ে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে সপরিবারে বাস করেন। এই অন্ত্যজীবনের ৮ বৎসর মধ্যে মাত্র এক কি দুই বৎসর কাল কবিতা রচনাতে অতি-বাহিত হয়। অন্ত্যজীবনের প্রথম বৎসরে রাজ সভাসদ্ নিযুক্ত হইয়াই তিনি অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।

ভারতচন্দ্র যে জন্য বঙ্গদেশে পরিচিত, অর্থাৎ যে সমস্ত রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত, তাহার জন্য তিনি শুধু এক কি দুই বৎসর মাত্র পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যখন তিনি সাংসারিক সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়া অবশিষ্ট জীবন পুস্তক রচনাতে ব্যয় করিবেন, মনে করিয়াছিলেন, এবং সেই অভিপ্রায়ে চণ্ডীনাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখনই তিনি মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়েন। তাই নিশ্চিন্ত মনে গভীর গবেষণা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া যে সমস্ত গ্রন্থ জগতে প্রচার করিতে পারি-তেন, তাহা তাঁহার মনেই রহিয়া গেল। সুতরাং তাহার সৌন্দর্য্য আর কেহ দেখিতেও পাইল না।

ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা কহিয়া থাকেন। কেহ কেহ তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিতেই ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা বলেন, গুণাকর সুন্দর সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দবিন্যাস করিয়া মনোহর ছন্দোবন্দ করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন মাত্র কিন্তু কবি হইতে যাহা আবশ্যক, তাহা তাঁহার ছিলনা। অন্য পক্ষে কেহ কেহ তাঁহাকে সাহিত্য-জগতে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতে কিছুই দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাদের কাহারও সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাই। আমরা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই পাঠকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

এইখানে বর্ত্তমান সময়ের পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে একশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গের সামাজিক অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা বর্ণন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আজিকালি শিক্ষা গুণে সমাজ যতদূর উন্নত হইয়াছে, পূর্ব্বে এই প্রকার ছিল না, তখন জনসমাজে ভালরকম শিক্ষা অল্প লোকেরই হইত। আজ কাল যেমন সংবাদ পত্র ইত্যাদি দ্বারায় বঙ্গদেশের নানাস্থানের নানা কথা জনসমাজে প্রচারিত হয়, ইতিপূর্ব্বে তাহার নাম গন্ধও ছিল না। তবে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ কি প্রকারে সমস্ত বঙ্গে প্রচারিত হইয়াছিল? এই কথা বুঝাইতে হইলে তখনকার সমাজের গঠন বুঝান আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।

গান আবহমানকাল হইতে লোকের চিত্তরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বঙ্গবাসী যাত্রাওয়ালাদিগের মুখে অথবা পাঁচালীওয়ালাদিগের মুখে গান শুনিত। আজকাল সেই সমস্ত গান ভিন্ন সমাজের অনুকরণে বিভিন্ন ভাবে থিয়েটারওয়ালাদিগের মুখে গীত হইয়া থাকে। তাই আজকাল পাঁচালী অথবা যাত্রাওয়ালাদের তত আদর নাই। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন থিয়েটারের নাম মাত্রও ছিল না। তখন সকলেই আগ্রহাতিশয় সহকারে যাত্রা গান অথবা পাঁচালী শুনিত। সেই সমস্ত যাত্রা অথবা পাঁচালীর বিষয় সকল রামায়ণ, মহাভারত হইতে সংগৃহীত হইত, কোন কোন স্থলে খ্যাতনামা কবিদিগের রচিত বিষয় সকল যাত্রা রূপে পরিণত হইয়া গীত হইত। রামের বনবাস, রাবণ বধ, ভরত মিলন, মানভঞ্জন, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, খ্যাতনামা পুরুষদিগের কথা তখনকার সমাজে পাঁচালী ও যাত্রাওয়ালার মুখে প্রচারিত হইত। বিদ্যাসুন্দরের কথাও যাত্রাওয়ালারা প্রথমে প্রচার করিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নীলমণি সমাদ্দার নামক একজন গায়ককে পালা বাঁধিয়া অন্নদামঙ্গল গান করিতে আদেশ করেন। নীলমণি সমাদ্দার সেই সকলে তাল লয় সংযুক্ত করিয়া তাহা রাজসভায় গান করিয়া সকলকে শুনাইতে লাগিলেন। সেই গান লোকসমাজে অন্য আকার ধারণ করিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। যাঁহারা যাত্রাগান প্রস্তুত করিতেন, তাঁহারা সেই সকল গান লোকসমাজে যাহাতে বিশেষ আদৃত হয়, সেই রকম করিয়াই প্রস্তুত করিতেন, কিন্তু নায়ক নায়িকার চরিত্র গঠনের উৎকর্ষতা সম্পাদন করিতে ততদূর চেষ্টিত হইতেন না। অনেকের ঈশ্বরদত্ত গান বাঁধিবার ক্ষমতা খুব ছিল, কিন্তু ভাল রকম শিক্ষা না হওয়াতে বর্ণিত নায়ক নায়িকার চরিত্র ভাল রূপ বুঝিতে সক্ষম হইতেন না, সুতরাং তাঁহাদের মনোমত তখনকার রুচি অনুসারেই সেই সমস্ত গান রচনা করিতেন। সেই সমস্ত গানই যাত্রাওয়ালাদিগের মুখে লোকসমাজে প্রচারিত হইত।

মুসলমান রাজত্বের অবসান সময়ে বাঙ্গালার সমাজ যে খুব হীন ছিল এবং তখনকার লোক সমাজের রুচি যে তদনুসারেই গঠিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয় অনেক

গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর যে বিকৃতভাবে সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। যাঁহারা বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যাসুন্দরের চরিত্রগত গুণ উপেক্ষা করিয়া সমাজের উপযোগী গান রচনা করিয়াছিলেন। সেই জনাই বিদ্যাসুন্দর আজ কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট হেয়। অনেকেই হয়ত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ ভাল করিয়া পড়েন নাই, তাঁহাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়তঃ যাত্রাগান-লব্ধ, তাই তাঁহারা ভারতের উপর খড়্গ-হস্ত। তবে ভারতচন্দ্রের একটী দোষ ছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই অংশ না থাকিলেই ভাল হইত।

যাঁহারা জগতে কবি নামে পরিচিত, তাঁহারা নানাজনে নানা পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ বা পুষ্পের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া পুষ্প-নির্ম্মাতার অনন্ত কৌশল হৃদয়ে অনুভব করিয়া সেই অনন্ত ভাব জগতে প্রচার করিয়াছেন। জগতবাসী তাঁহার প্রচারিত অনন্তের মহিমায় সেই ভাবে বিভোর হইয়াছেন। কেহ বা স্বভাবে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাহাই জগতে প্রচার করিয়াছেন। কেহবা শিশুর সুকুমার ভাব দেখিয়া নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময়ের অনন্ত ভালবাসার উৎস হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা জলন্তভাবে জগৎকে দেখাইয়া জগৎবাসীকে মাতাইয়াছেন। আবার কেহ বা সূর্য্যের উত্তাপে, চন্দ্রের কীরণে, পৃথিবীর গঠনে, মানবজাতির অভ্যুদয়ে ও যেখানে সেখানে করুণাময়ের করুণা দেখিয়া তাহাই জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন; কেহ বা গগণভ্রষ্ট নক্ষত্রের পতনে তাহার দুঃখরাশি অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আবার কেহবা দুই স্রোতস্বিনীর সম্মিলনে প্রেমের গভীরতা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এ সমস্ত এক শ্রেণীর কবি। ভারতচন্দ্র এ দলে আসন পাইবার উপযুক্ত নহেন।

অনেকে নন্দনকাননস্থিত পারিজাতের সৌন্দর্য্য রোগীর শিয়রে, গৃহস্থের গৃহে এবং মানবের প্রফুল্ল বদনে অনুভব করিতে পারেন। অনেকে অবিচ্ছিন্ন বিমল আনন্দ রাজার গৃহে অন্বেষণ না করিয়া, যাহারা নিত্য ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা জীবন রক্ষা করে, তাহাদের সেই শান্তি পূর্ণ বদনে প্রতিভাত হইতে দেখেন। অনেকে আবার সরল, সংসার-জ্ঞানশূন্য, অসাংসিক তাপসে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া সেই সৌন্দর্য্যের উজ্জল আভা উজ্জল রূপে চিত্রিত করিয়া সমস্ত জগতকে সে সৌন্দর্য্যে ডুবাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র এদলেও আসন পাইবার উপযুক্ত নহেন। তাঁহার যাহাতে অধিকার, তাহা অন্য রকম।

ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। রাজার যাহা আছে এবং রাজার যাহা আবশ্যকীয়, ভারতচন্দ্র তাহাই সুন্দর ও মধুর করিয়া জগত সমক্ষে ধরিয়াছেন। যাঁহারা নন্দনকাননের পারিজাত প্রভৃতি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পরাশির মধ্যে বহুমূল্য রত্নাসন স্থাপন করিয়া তদুপরি মোহন বেশভূষাযুক্ত শচী ও শচীপতিকে উপবেশন করাইয়া, নানালঙ্কার বিভূষিতা অনিন্দ্য কান্তি অপ্সরাগণের মুখে শ্রুতিমধুর ভাবময় সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ভালবাসেন, যাঁহারা অপূর্ব্ব সৌধ সকলের সুনিপুণ কারুকার্য্য দেখিয়া মোহিত হয়েন, যাঁহারা সুশোভিত চন্দ্রাতপের নীচে উপবিষ্ট বিবিধ রাজসজ্জায় ভূষিত নৃপতির চক্ষু

ঙ্গিকে নানাপ্রকার মনোমুগ্ধকর দ্রব্যাদিতে মোহিত হইয়া ঐ সকলকেই আপন বর্ণনার বিষয় করেন, যাঁহারা রাজসভার আড়ম্বর এবং জাঁকজমক বর্ণনা করেন, ভারতচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্র রাজ-রাণীর মনোভাব বর্ণনে, রাজার খেয়াল প্রদর্শনে, রাজপারিষদ ও সভাসদগনের প্রকৃতি প্রচারে, জাঁকজমক বিশিষ্ট সৈন্য-গণের সমাবেশ ও যুদ্ধযাত্রায়, রাজপ্রাসাদ সকলের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে অদ্বিতীয় ছিলেন। এবিষয় আরও পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পাইব।

কেহ কেহ আপন নায়িকাকে সংসার-জ্ঞান-শূন্য সরলা করিয়াছেন, সংসারের সংস্পর্শে তাহার যে কুটিলতা শিক্ষা হইত, সে তাহার কিছুই জানে না, সে একটী ফুল পাইলেই সন্তুষ্ট। আদর করিয়া যদি কেহ তাহাকে নিকটে উপবেশন করাইয়া দুটী মধুর কথা কহে, তাহা হইলে সে তাহাতেই মোহিত হইয়া যায়। সংসারের জাঁকজমক কিছুই সে অবগত নহে। ভারতচন্দ্র এ সকল কিছুই বর্ণনা করিতে চেষ্টিত হইতেন না। তিনি তাঁহার নায়িকা বিদ্যাকে রাজকুমারীর মতনই গঠন করিয়াছেন। বিদ্যা রাজার মেয়ে, রাজসভায় যাহা যাহা হয়, তৎসমস্তই অবগত আছেন, সুতরাং তাহাতে উৎকর্ষতা লাভ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিতা। বিদ্যা রাজকুমারীর ন্যায় উজ্জল বেশভূষায় ভূষিতা হইতে ভালবাসেন। রাজকুমারী অবস্থা হইতে রাজরাণী হইতে হইলে যে যে গুণের আবশ্যক, সমস্তই বিদ্যা অবগত আছেন। বিদ্যা অনুমাত্রও কষ্ট সহ্য করিতে ইচ্ছুক নহেন। কোন ক্রমে সে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে তৎসংসাধনে সচেষ্টিতা হইতেন। বাস্তবিক ভারতচন্দ্র এ সকল উত্তমরূপে বর্ণনা করিতে পারিতেন।

ভারতচন্দ্র সংসারের দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য প্রভৃতি বর্ণনা করিতে পারিতেন না। কেহ কেহ আপন নায়ককে সন্ন্যাসী করিয়াছেন। সে সন্ন্যাসী—সংসারের সমস্ত কার্য্য ও গতি-বিধির পর্য্যালোচনায় এবং তাহা হইতে সমস্তকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া শুধু ঈশ্বর প্রেমে স্থায়ী নির্ম্মল সুখ অনুভব করিয়া সন্ন্যাসী। ভারতচন্দ্রও সুন্দরকে সন্ন্যাসী করিয়াছেন, কিন্তু সে সন্ন্যাসী শুধু নিজচিত্ত প্রসাদনের জন্য সন্ন্যাসী, সে আপন খেয়াল মিটাইবার জন্য সন্ন্যাসী। এ সন্ন্যাসী প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে,—সন্ন্যাসী বেশে রাজ-কুমার। বিদ্যাকেও তিনি সন্ন্যাসিনী করিয়াছেন, কিন্তু এ সন্ন্যাসিনী সুন্দরের মনো-রঞ্জনার্থ সন্ন্যাসিনীর বেশধারিণী মাত্র।

দুঃখ দারিদ্র্যগ্রস্ত ভিখারিণীর মনোভাব ভারতচন্দ্রের বর্ণনার বিষয় ছিল না। ভিখারিণী মুষ্টি ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য সামগ্রীতে কত কষ্টে দুঃখের ও কষ্টের জীবন অতি-বাহিত করে, ভারতচন্দ্র তাহা বর্ণনা করিতে সচেষ্ট হইতেন না। তিনি যে ভিখারিণীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অন্য প্রকার। ভারতচন্দ্র অন্নদাকে ভিখারিণীর বেশ-ধারিণী করিয়াছেন, রুক্ষকেশা ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা করিয়াছেন, তাহা ব্যাসকে ছলনা করিবার নিমিত্ত। তাহা ক্ষণিক। অন্নদা নিজ উদ্দেশ্য সংসাধন মানসে ভিকারিণীর বেশধারিণী মাত্র. দুঃখে কষ্টে পড়িয়া ভিকারিণী নহেন।

প্রকৃতিতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু রমণীয় সুতরাং মনোমুগ্ধকর, যাহা কিছু মহান, যাহা কিছু ভাবময় এবং যাহা শান্ত

মানব মনের শঙ্কদয়তা আকর্ষণ করা যায়, তাহা ভারতচন্দ্রের বর্ণনার বিষয় ছিল না। এসমস্ত বর্ণনা করিয়া মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতি, সেক্‌স্‌পিয়ার ও বাইরণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্রও অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অন্য প্রকারে। তাঁহার যাহাতে অধিকার, তাঁহার যাহা বর্ণনার বিষয়, তাহা বর্ণনা করিতে কেহই চেষ্টিত হন নাই। ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি হইয়া তদুপযোগী সমস্ত বিষয় চিত্রফলক সদৃশ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আপন ক্ষমতায় বর্ণিত বিষয়ে এমন উজ্জ্বল রঙ্গ ফলাইয়াছেন যে, অধ্যয়ন করিলে রাজসভার প্রতিবিম্ব সকল আপনি মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। তিনি তাঁহার রাজ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। মানব প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা বর্ণন তাঁহার বর্ণনার বিষয় ছিলনা, সুতরাং তিনি তাহা বর্ণনা করিতে চেষ্টিতও হন নাই।

ভারতচন্দ্র যে কি প্রকৃতির কবি ছিলেন, বোধ হয় তাহা এক্ষণে সম্যক প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাঁহার দোষ সকল আলোচনার সময়ে তৎকালিক সমাজের অবস্থা মনে রাখা সকলের উচিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে লিখিতে হইয়াছিল, সুতরাং স্বাধীনভাবে লিখিলে যে যে কল্পনা মনে উদয় হওয়া সম্ভব ছিল, তাহা হইতে পারে নাই, একথাও মনে রাখা উচিত। আমরা এই সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, রাজার মন সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে মাঝে মাঝে অশ্লীল হইতে হইয়াছিল, সুতরাং কেহ কেহ যে ভারতচন্দ্রকে "কুপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া অশ্লীল" কহিয়াছেন, তাহার কোন মূল নাই।

যাঁহারা ভারতচন্দ্রকে বঙ্গদেশে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করেন, এক্ষণে তাঁহাদের সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিব। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন। তিনি বলেন—"কিন্তু বলিতেও দুঃখ হয়—হাসিও পায় যে সম্প্রতি ইংরাজী বিদ্যা-সম্পন্ন একদল নব্য সম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষার এরূপ মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছেন যে, তাঁহারা মিল্‌টনের অনুকারক অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দেখিয়া এ হেন ভারতচন্দ্রকেও সিংহাসন হইতে অবতরণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন! ধন্য অনুকৃতি! তোমার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এক সময়ে মাথায় টীকি রাখিয়া ও গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া তারস্বরে বেদ পাঠ করিয়াছি—এক সময়ে মোগলাই পাগড়ী মাথায় দিয়া ঢিলাইজের চাপ্‌কান পরিয়া এবং নক্কাজুতা পায় দিয়া পারসীর জোবান দোরস্ত করিয়াছি এবং আজি আবার টুপি মাথায় বুট জুতা পায় ও কোট, পেন্টুলন পরিধানে মাতৃভাষায় কথোপকথনের মধ্যেও ইংরাজীর বার আনা দখলীস্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছি—ইংরেজী ভূত পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছি—এবং ইংরাজী মিল্‌টনের অনুকারক অমিত্রাক্ষর ছন্দোবদ্ধ মেঘনাদবধকে বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য বলিতেছি, তদ্রচয়িতা মাইকেলকে ভারতের সিংহাসন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি!! ভারত! তুমি স্থির থাক। তুমি ওসকল লোকের কথায় ক্ষুব্ধ হইও না। তোমার সিংহাসনের নিকট ঘেঁসিতে পারে, এরূপ লোক এ

পর্য্যন্ত জন্মে নাই—পরেও জন্মিবে কি না, সন্দেহ স্থল।”

আমরা এ দলের সঙ্গেও একমত হইতে পারি না। ভারতচন্দ্রের যাহাতে অধিকার এবং যাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। অধুনা বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের নানাপ্রকার ভাব সাহিত্য সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। অনেকে আপনাদের কবিতা সকল ইংরাজি আবরণে আবৃত করিয়া নূতন রকমে জগতে প্রচার করিয়াছেন। যাহা বঙ্গবাসী কখনও জানিত না, সুতরাং যাহার কথা একবারও ভাবিত না, সেই সমস্ত বিষয় জানিবার, ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। সে সকল অনেক ভাল জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ভাল জিনিস সকল সাহিত্যে স্থান দিয়া সাহিত্যের উন্নতি সম্পাদনে যত্নবান হওয়াতে কিছুই দোষ নাই বরং গুণ আছে। আজ কাল যাঁহারা কবিতা লেখেন, তাঁহাদের বিচরণ ক্ষেত্র ও ভারতচন্দ্রের বিচরণ ক্ষেত্র ভিন্ন প্রকার। সুতরাং উভয়ের প্রভেদও গুরুতর। আজকালের কবিগণ নিজ নিজ বিষয়ে উৎকৃষ্ট, ভারতচন্দ্রও নিজ রাজ্যে রাজা। ভারতচন্দ্র ইংরাজীর গন্ধমাত্রও জানিতেন না, সুতরাং তাৎকালিক বাঙ্গালা ভাষার বিবরণ তাঁহার গ্রন্থ দৃষ্টেই জানা যায়। এই কারণেও তাঁহার কাব্য বঙ্গদেশে গৌরব লাভ করিতে সক্ষম হইবে, সন্দেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ যে অমর, ইহা যে কোন সময়ে লুপ্ত হইবে না, তাহার একটী কারণ এই যে, ইহা সমস্ত বঙ্গবাসীর প্রিয়। আজিও অনেকে আগ্রহাতিশয় সহকারে গুণাকরের গ্রন্থ ক্রয় করিয়া থাকেন। সমস্ত লোকেই তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকে। বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বণিতা, যাহাদের অক্ষর বোধ আছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই কিছু কিছু ভারতের কবিতা কণ্ঠস্থ আছে। যদিও মাঝে মাঝে কেহ কেহ ভারতের গ্রন্থ অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার গুণরাশি যখন সম্যকরূপে দেশে প্রচারিত হইবে, তখন আবার তিনি উজ্জ্বলরূপে সর্ব্বসমক্ষে বিরাজিত হইবেন। যাঁহারা কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল বর্ণনা জন্য ভারতচন্দ্রকে উপেক্ষা করেন, তাঁহারা সেই সেই অংশ পরিত্যাগ করিয়া যাহা ভাল, যাহা সুন্দর এবং যাহা মোহকরী ও ভাবময়, সেই অংশ পাঠ করিলে কিছুই ক্ষতি হইবে না। অশ্লীল অংশ সমুদয়ে ভারতের কবিত্বের নিদর্শন বড় নাই, কেবল ভাষার আড়ম্বর আছে মাত্র। সেই অংশ পরিত্যাগে বরং তাঁহার গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইবে।

যিনি আপন গুণে আবালবৃদ্ধ বনিতার হৃদয় এইরূপ অধিকার করিয়াছেন, যিনি নিতান্ত দুঃখ কষ্টের জীবন হইতে আপন নাম স্বীয় ক্ষমতাবলে এত প্রচারিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার আসন টলিবার নহে। চিরকাল সমভাবে বঙ্গবাসী তাঁহাকে আদর করিবে। কখন কখনও তাঁহার যশরাশি মলিন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। আবার তিনি সকলের নিকট সেই আদর লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

সমাপ্ত।

শ্রীরজনীকান্ত রায়।

বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা। (৭ম)

কালিদাস মুখোপাধ্যায় রাম গোবিন্দের ঔরসে সত্যভামা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কামদেব নামে ইহাঁর এক ভ্রাতা ছিলেন। ইনি রামেশ্বরের প্রপৌত্র ও কালীচরণের পৌত্র। ইনি রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের বংশানুক্রমিক উপাধি মুখোপাধ্যায়। ইনি ২৫ শ্লোকে গঙ্গাষ্টক, ২৯ শ্লোকে মঙ্গলাষ্টক, ২০ শ্লোকে রাক্ষস কাব্য, ৪৫ শ্লোকে রত্নকোষ নামক অভিধান, ও ৮২৭ শ্লোকে ত্রিপুর সুন্দরী স্তুতিকাব্য রচনা করেন।

১৬৭৩ শকে তিনি দ্বাদশসর্গে এই শেষোক্ত গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া গ্রন্থশেষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাষ্টক ভিন্ন আরও দুই খানি গঙ্গাষ্টক* পাওয়া গিয়াছে।

শাকোঽগ্নি-মুনি-ষ্ট-চন্দ্রমানিতেঽব্দেকৃতংময়া।
মাতাপিতৃপদধ্যান-কালিদাসেন ধীমতা ॥
উদ্যচ্ছ্রীভুবনেশ্বরীপদপরঃ শ্রীযুক্ত-রামেশ্বর,

* * * *

শ্রীকালি চরণাহ্বয়ো গুরুরতঃ, শ্রীসত্যভামা-
সুতঃ-
তৎপ্রীত্যা পরয়া শিবার্চ্চনমনাঃ শ্রীরাম-
গোবিন্দজঃ।
শ্রীলশ্রীহরিনন্দনঃ সুবিদিতঃ শ্রীকামদেবো
মহান্
রাঢ়ীয়-দ্বিজনায়কো মুখবর স্তস্যান্বয়ে সম্ভবঃ।

রতিমঞ্জরী নামক কামশাস্ত্রবিষয়ক ক্ষুদ্র-ক্ষিত-বর্ণনাপূর্ণ এক খানি গ্রন্থ জয়দেব প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

নত্বা সদাশিবং দেবং নাগরাণাং মনোহরং।
রচিতা জয়দেবেন সুবোধা রতিমঞ্জরী ॥

ইহা অপর এক জয়দেব বিরচিত। গীতগোবিন্দ যে রসময়ী লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছে, সেই সুকবির লেখনী ঈদৃশ অশ্রদ্ধেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছে বলিয়া কথনই বিশ্বাস হয় না।

চন্দ্রালোক নামক সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ অপর এক জয়দেব প্রণীত। ইহাতে দশটী ময়ূখ (অধ্যায়) আছে। এই জয়দেব গীতগোবিন্দ-প্রণেতা হইতে নিঃসংশয় পৃথক্ ব্যক্তি। পণ্ডিতবর ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই উভয়কে এক ব্যক্তি নির্ণয় করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই জয়দেবের পিতার নাম মহাদেব, মাতার নাম সুমিত্রা। স্বরচিত গ্রন্থের শেষে তিনি এই রূপে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

মহাদেবঃ সত্রপ্রমুখমখবিদ্যৈক চতুরঃ
সুমিত্রা তদ্‌ভক্তিপ্রণিহিতমতি র্যস্য পিতরৌ।
প্রণীত স্তেনাসৌ সুকবি-জয়দেবেন দশভি-
শ্চিরং চন্দ্রালোকঃ সুখয়তু ময়ূখৈ র্দশ দিশঃ।

পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রকাশিত কাব্য প্রকাশের ভূমিকায় চন্দ্রালোক পীযূষ-বর্ষ-প্রণীত বলিয়া উল্লেখ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পীযূষবর্ষ সুকবি জয়দেবের উপাধি বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থশেষে জয়দেব লিখিয়াছেন।—

চন্দ্রালোকময়ং স্বয়ং বিতনুতে পীযূষবর্ষঃকৃতী।

* Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. Nos. 455 and 458.—

জয়তি যাজক-শ্রীমন্-মহাদিবাকরনন্দনঃ ॥
সুক্তপীযষবর্ষণ্যা জয়দেবকবের্গিরঃ ।

প্রসন্নরাঘব-নাটকের প্রস্তাবনা দৃষ্টে বোধ হয়, চন্দ্রালোক-প্রণেতাই প্রসন্নরাঘব নাটক রচনা করিয়াছেন। তিনি বিদর্ভ নগরবাসী (কৌণ্ডিন্য) ও মহাদেব-তনয় বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

বিলাসে যদ্ বাচামসমরস-নিষ্যন্দ-মধুরঃ
কুরঙ্গাক্ষী-বিম্বাধর-মধুর-ভাবং গময়তি ।
কবীন্দ্রঃ কৌণ্ডিন্যঃ স তব জয়দেবঃ শ্রবণয়ো-
রয়াসীদাতিথ্যং ন কিমিহ মহাদেব-তনয়ঃ ॥

ঢাকার প্যারীমোহন প্রভুর নিকট যে চন্দ্রালোকের হস্তলিখিত পুঁথি আছে, তাহাতে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত টীকা আছে। কথিত আছে, এই সংক্ষিপ্ত টীকা গ্রন্থকারের নিজের রচিত। প্রদ্যোতন ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিত বন্দোলা (বুন্দেলা) বংশীয় রাজা বীরসিংহের পৌত্র ও রাজা রামচন্দ্রের পুত্র যুবরাজ বীরভদ্রের আদেশানুসারে চন্দ্রালোক-প্রকাশ নামক ইহার এক খানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই প্রদ্যোতন বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের তনয় বলিয়া স্বকীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রদ্যোতন ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রায়শ্চিত্ত প্রকাশ নামে এক খানি স্মৃতি-গ্রন্থও বিদ্যমান আছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে চতুর্থ প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি যে, জয়ধর উপাধ্যায় তর্কালঙ্কার খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিথিলা প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হন। ইনিই তার্কিক চূড়ামণি পক্ষধর মিশ্রনামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইনি যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র। ইহাঁরই অপর নাম জয়দেব মিশ্র। ইনি হরি-মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া স্বরচিত গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি গঙ্গেশ (গঙ্গেশ্বর) উপাধ্যায় প্রণীত নব্যন্যায় বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বচিন্তামণির আলোক (মণ্যালোক বা চিন্তামণি-প্রকাশ)নামক প্রাচীনতম সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন।* এই আলোক নামক ভাষ্যের চারি খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। এই চারি টীকাকারের দুই জন মিথিলা নিবাসী, ও অপর দুই জন বঙ্গদেশীয়। (১) আলোকের "কণ্টকোদ্ধার" নামক টীকা ৪৩১ লক্ষণাব্দে (১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) মধুসূদন ঠক্কুর কর্তৃক বিরচিত হয়। প্রত্যক্ষ-চিন্তামণ্যালোকের যে এক খানি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার শেষে ৪৩১ লক্ষণাব্দ লিখিত রহিয়াছে।

মধুসূদন-সদ্যুক্তি-সমুৎসারিতকণ্টকাঃ
আলোক-বক্রমার্গেণ মণিং গৃহ্নন্তু ধীধনাঃ ॥

(২) আলোকের দ্বিতীয় টীকা "দর্পণ" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রণেতা মিথিলাবাসী মহেশ ঠক্কুর। ইহাঁর পিতার নাম চন্দ্রপতি, মাতার নাম ধীরা দেবী বলিয়া অনুমিত হয়। দর্পণের যে হস্তলিখিত পুস্তক পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তর রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের নয়ন গোচর হইয়াছে, তাহা ১৬৩৩ সংবতের ৩রা শ্রাবণ সমাপ্ত হয়।

গৌর্য্যা গিরিশাদিব কার্ত্তিকেয়ো
যো ধীরয়া চন্দ্রপতেরলম্ভি ।
আলোকমুদ্দীপয়িতুং নবীনং
স দর্পণং ব্যাতনুতে মহেশঃ ॥

(৩) আলোকের তৃতীয় টীকাকার হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য। পুরীর

* নব্যভারত, পঞ্চম খণ্ড ১৪৪—৪৫ পৃষ্ঠা।

শঙ্কর মঠে হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত প্রত্যক্ষালোক, শব্দালোক, ও অনুমানালোকের যে তিন খানি হস্তলিখিত পুস্তক বিদ্যমান আছে, তাহা যথাক্রমে ১৫২৩, ১৫২২ ও ১৫২১ শকে কন্দর্প রায় নামক জনৈক লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হয়। প্রত্যক্ষমণ্যালোকের শেষে এই অস্পষ্ট শ্লোকটী দৃষ্ট হয়।

শাকে ত্রিগুণ-বিশিখ-ক্ষণদাধিনাথে (১৫২৩)
মাসে + + স্বুরধুনী-সবিধে চতুর্থ্যাং।
শ্রীসার্ব্বভৌম-কৃতি (?) প্রণয়েন লব্ধ
কন্দর্পরায়পদবীক ইদং লিলেখ॥

এই হরিদাসের কৃত উদয়নাচার্য্য প্রণীত কুস্থমাঞ্জলি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কুস্থমাঞ্জলিকারিকা-ব্যাখ্যা নাম্নী একখানি টীকা আছে। ডাক্তার কাউয়েল (Cowell) হরিদাসী টীকাসহ সমগ্র কুস্থমাঞ্জলি স্বরচিত ভূমিকা সহ পূজনীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাহায্যে ইংরেজীতে অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৪) আলোকের চতুর্থ টীকাকার নৈয়ায়িকাগ্রণী মথুরানাথ তর্কবাগীশ। ইনি গঙ্গেশের তত্বচিন্তামণির এবং রঘুনাথ শিরোমণির চিন্তামণি দীধিতিরও টীকা প্রণয়ন করেন*।

শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগীশ-ধীমতা।
বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে প্রত্যক্ষালোকফক্কিকা॥

মথুরানাথের প্রণীত বহুতর গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। আমরা প্রস্তাবান্তরে ঐ সকল পুস্তকের নামাবলী উল্লেখ করিব। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীরাম তর্কালঙ্কার। পিতা ও পুত্র উভয়েই নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথের ছাত্র ছিলেন। পিতৃদেবের নিদেশানুসারে তিনি তত্বচিন্তামণি, মণ্যালোক ও মণিদীধিতির টিপ্পনী রচনা করিয়া জগতে স্বকীয় বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর প্রণীত টীকার সাধারণ নাম রহস্য।

এই চারি জন ভিন্ন আরও অনেক পণ্ডিত আলোকের টীকা রচনা করেন। আমরা এস্থলে তাঁহাদের নাম ও রচিত গ্রন্থের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নির্দ্দেশ করিতেছি।

(৫) আলোকের পঞ্চম টীকা সারমঞ্জরী। ইহা ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত। ইনি রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির ও মণিদীধিতিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা নাম্নী এক খানি টীকা রচনা করেন। এই টীকা ভবানন্দী নামে প্রসিদ্ধ।

নমস্কৃত্য গুরূন্ সর্ব্বান্ নিগূঢ়-মণি-দীধিতৌ।
শ্রীভবানন্দ-সিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশিতা॥

এই ভাবানন্দী টীকার ভাবানন্দী-প্রকাশ নামক টিপ্পনী মহাদেব পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত। মহাদেব পুণতামকর (?) রচিত এতদভিন্ন আরও একখানি সর্ব্বোপকারিণী নাম্নী টীকা আছে বলিয়া ডাক্তর হল (Hall) নির্দ্দেশ করিয়াছেন*। এই উভয় মহাদেব এক ব্যক্তি কি না বলিতে পারি না। ভবানন্দ প্রণীত কারকাদির অর্থনির্ণয়, লটার্থবাদ, শব্দার্থসারমঞ্জরী, কারণতাবাদবিচার নামে কয়েকখানি বাদার্থ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ভবানন্দশর্ম্মা নামক জনৈক গ্রন্থকার গদ্যপদ্যে প্রায়-

* নব্যভারত, পঞ্চম খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

* Dr. A. F. Hall's Contribution towards an Index to the Bibliography of the Indian Philosophical Systems. Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss.

শিচত্ত-বারিধি নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন।

(৬।৭) রঘুপতি ভট্টাচার্য্য এবং গোপীনাথ প্রণীত শব্দালোকের টীকার নাম শব্দালোক-রহস্য।

(৮।৯) গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ ও জয়রাম ন্যায়-পঞ্চানন শব্দালোক-বিবেক নামে জয়দেব মিশ্রের প্রণীত আলোকের শব্দখণ্ডের টীকা রচনা করেন। জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন প্রণীত রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির টিপ্পনী (ব্যাখ্যা) বর্ত্তমান আছে। তৎপ্রণীত আখ্যাতবাদ টিপ্পনী (বা ব্যাখ্যাসুধা); হেত্বাভাস-দীধিতি-টিপ্পনী, সামান্য লক্ষণাদীধিতিটিপ্পনী, সমাস-বাদ নামে বাদার্থ, এবং ন্যায়সিদ্ধান্তমালা নামে গৌতম প্রণীত ন্যায়সূত্রের ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে। ন্যায়সিদ্ধান্তমালা ১৭৫০ সংবতে বিরচিত হয়। আখ্যাতবাদ টিপ্পনীর প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন :—

ন্যায়পঞ্চাননঃ শ্রীমান্ জয়রামঃ সমাসতঃ ॥
আখ্যাতবাদব্যাখ্যানমাতনোতি মনোরমং।

তৎপ্রণীত উপদেশ-বিধেয় বোধস্থলীয় বিচার, অন্যথা-খ্যাতিতত্ত্ব, কারক-ব্যাখ্যা. নানার্থবাদ বিবৃতি বোধ হয় তাঁহার রচিত দীধিতি-ব্যাখ্যারই অন্তর্ভুক্ত। জয়রামের জনৈক কৃতবিদ্য ছাত্র গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্ত-বাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রণীত শক্তিবাদ নামক সুবিখ্যাত বাদার্থগ্রন্থের টীকা রচনা করেন। গদাধর বহুতর ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। বাদার্থ বিষয়েই তিনি ৬৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(১০) আলোকের দশম টীকা গাদাধরী। ইহা গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রণীত বলিয়া পণ্ডিত-বর হল (Dr. Hall) সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন*।

প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত স্বপ্রণীত জয়দেবচরিতে প্রসন্নরাঘব-নাটক-প্রণেতা জয়দেবকে পক্ষধর মিশ্র হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করায় নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, নবদ্বীপের শেষ হিন্দুরাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন দেবের মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামক স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বের শেষভাগে বঙ্গেশ্বরের প্রধান বিচার-পতি ও সভাসদ (আবসথিক মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ) বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয়। পুতিতুণ্ড-বংশীয় আর্য্যাসপ্তশতী প্রণেতা প্রাগুক্ত গোবর্দ্ধনাচার্য্যের ন্যায় হলায়ুধ মুখ্য কুলীন ছিলেন*। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বগ্রন্থে কাত্যায়ন, বৌধায়ন, আশ্বলায়ন, পারস্কর ও গোভিল প্রণীত কল্পসূত্র ও গৃহ্যসূত্র, মনু-সংহিতা এবং প্রধান প্রধান পুরাণ হইতে স্বকীয় মত সংস্থাপনার্থ নানাস্থল উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বেদাধ্যয়ন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের যাহা যাহা কর্ত্তব্য, এই বিস্তীর্ণ গদ্যপদ্যময় গ্রন্থে তাহাই সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বস্ব নামে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে

* Dr. F. Hall's *contribution* towards an Index to the Bibliography of the Indian *Philosophical Systems*. Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss.

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সম্বন্ধ নির্ণয়" দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের "সেনরাজগণ" নামক পুস্তিকার লিখনানুসারে হলায়ুধকে আদিশূরানীত পঞ্চবিপ্রের অন্যতম বাৎস্যগোত্রজ ছান্দড়ের বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোহথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
(ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং।)

কিন্তু পণ্ডিতবর ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতির পরিচয় প্রদান কালে, হলায়ুধকে শাণ্ডিল্য-গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই মত ভ্রমাত্মক কিনা, বলিতে পারি না। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ কবিরহস্য নামক ধাতুবিবেক প্রণেতা হলায়ুধ শাণ্ডিল্য-গোত্রজ ছিলেন। হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি যজুর্ব্বেদাবলম্বী হিন্দুদিগের উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার বিষয়ে দশকর্ম্মদীপিকা নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপ্রণীত কুশণ্ডিকা ও বিবাহ-পদ্ধতি নামক স্মার্ত্ত গ্রন্থদ্বয়ও পূর্ব্বোক্ত দশকর্ম্মদীপিকার অন্তর্ভুক্ত। প্রবরাধ্যায় নামে স্বল্পায়তন একখান গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাহা ও রত্নমালা নামক পদ্মরাগাদি রত্ন পরীক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ পশুপতি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। স্বরচিত দশকর্ম্মদীপিকায় প্রারম্ভে পশুপতি রাজপণ্ডিত বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বিপ্রাণাং দশকর্ম্মপদ্ধতিমিমামুক্ত্যা বেদাদসৌ।
চক্রে ভূপতি-পণ্ডিতঃ পশুপতি স্বর্গাপবর্গপ্রদাং॥

পশুপতি রাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। হলায়ুধ প্রণীত অনেক গুলি গ্রন্থের পশ্চাতেই "সর্ব্বস্ব" নামে সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। হলায়ুধ কর্ত্তৃক বিরোচিত স্মৃতিসর্ব্বস্ব বা হলায়ুধী*, মীমাংসা-সর্ব্বস্ব, বৈষ্ণব-সর্ব্বস্ব, শিব-সর্ব্বস্ব, মুনি-সর্ব্বস্ব, ন্যায়-সর্ব্বস্ব, পণ্ডিত-সর্ব্বস্ব, মৎসসূক্ত তন্ত্র, অভিধান-রত্নমালা, কবিরহস্য নামক ধাতুবিবেক, এবং মৃতসঞ্জীবনী নামে পিঙ্গলাচার্য্য প্রণীত ছন্দঃসূত্রের টীকা,—পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের শেষে তিনি লিখিয়াছেন,—

পিঙ্গলাচার্য্যরচিতে ছন্দঃশাস্ত্রে হলায়ুধঃ।
মৃত সঞ্জীবনীং নাম, বৃত্তিং নির্ম্মিতবান্ ইমাং॥

* বিল্বপঞ্চ গ্রাম বাসী, কবি ভবেশের পুত্র, মিথিলার জনৈক অজ্ঞাতনামা রাজার ধর্ম্মাধিকরণিক মহামহোপাধ্যায় বর্দ্ধমান সপ্ত পরিচ্ছেদে দণ্ডবিবেক নামক যে স্মৃতি গ্রন্থ ৩৫৫ লক্ষ্মণাব্দে (১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে) প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি অন্যান্য স্মার্থ রচিত স্মৃতি গ্রন্থের সঙ্গে হলায়ুধের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দণ্ডবিবেকের যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৩৫৫ লক্ষ্মণাব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবিল্বপঞ্চান্বয়সম্ভবেন,
শ্রীমদ্ ভবেশস্যতনূদ্ভবেন।
শ্রীবর্দ্ধমানেন বিদেহভর্ত্তুঃ,
কৃতে কৃতো দণ্ডবিধৌ বিবেকঃ॥

কল্পতরু কামধেনূ হলায়ুধশ্চ ধর্ম্মকোষশ্চ।
স্মৃতিসার কৃত্যসাগর-রত্নাকর-পারিজাতাংশ্চ।
টীকাসহিতে দ্বে সংহিতে চ মনুযাজ্ঞবল্ক্যোক্তে।
ব্যবহারে তিলকশ্চ প্রদীপিকাশ্চ প্রদীপশ্চ॥
দৃষ্টা কৃতো নিবন্ধো নিবন্ধানির্ব্বন্ধাদেষ বর্দ্ধেন
দণ্ডস্যাদৌ পরিকরস্ততঃ ষট তস্য হেতবঃ।
উক্তা দণ্ডবিবেকে যস্মিন্ পরিচ্ছেদেষু সপ্তসু।

হলায়ুধ মিশ্র নামক জ্যোতির্ব্বিৎ গ্রন্থকার জ্যোতিঃসার নামে গ্রহনক্ষত্রাদি নিরূপক জ্যোতিষ গ্রন্থ এবং দ্বিজনয়ন নামে সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্যবস্থা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বোধ হয় তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন।

আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রীধরদাস ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে) ৪৪৬ জন কবির কাব্য গ্রন্থ হইতে সদুক্তিকর্ণামৃত নামক সংগ্রহ গ্রন্থ সংকলন করেন। ইহাতে ৮১৮৫ টী শ্লোক আছে। ইহাতে পাঁচটী প্রবাহ আছে। প্রতি প্রবাহ নানা বীচিতে বিভক্ত। এই গ্রন্থোল্লিখিত কবিদিগের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে সদুক্তিকর্ণামৃত একতম সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে*। মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাসের পিতা বটুদাস বঙ্গেশ্বর দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন দেবের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সেনাপতি ছিলেন।

শৌর্য্যানীব তপাংসি বিভ্রতি ভবং যস্মিন্ন
যসাবধি।
জ্ঞানে দান ইব, দ্বিষামিব জয়ো যেনেন্দ্রি-
য়াণাংকৃতঃ ॥
সম্রাজামিব যোগিনামপি গুরু র্যশ্চ ক্ষমামণ্ডলে।
সশ্রীলক্ষ্মণসেন এব নৃপতি র্মুক্তশ্চ জীবন্নভূৎ ॥
তস্যাসীৎ প্রতিরাজ্জডম্বুত-মহাসামন্তচূড়ামণি
নাম্না শ্রীবটুদাস ইত্যনুপমপ্রেমৈকপাত্রং সখা ॥
শ্রীমান্ শ্রীধরদাস এতাধিগুণাধারঃ স তস্মা-
দভূদ।
আকৌমারমপারপৌরুষপরাধীনস্য তস্যা-
নিশং ॥
অমরাঃ শৃঙ্গারচাটু অপদেশেশ্চাবচে জন্মশঃ।
ইতি পঞ্চভিঃ প্রবাহৈঃ সদুক্তিকর্ণামৃতং
ক্রিয়তে ॥
শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেতদশশতে
শরদাং।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষিতিপস্য রসৈকবংশে ॥
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুণবিংশেষু পরার্থহেতোর-
কুতুকাৎ।
শ্রীধরদাসেনেদং সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে ॥

সদুক্তিকর্ণামৃতে গোবর্দ্ধন, হলায়ুধ, জয়দেব, ভট্টনারায়ণ, কবিরাজ, কেশবসেন দেব, কৃষ্ণমিশ্র, লক্ষ্মণসেন, মাধব সেন, প্রবরসেন, পুর সেন, পুরুষোত্তমদেব, প্রভাকর দত্ত, ভগীরথ দত্ত, উমাপতি ধর, বল্লভ সেন, বসু সেন, বিদ্যাপতি, বিভাকর শর্ম্মা, যুবরাজ দিবাকর, যুব সেন প্রভৃতি বঙ্গদেশবাসী অনেকানেক গ্রন্থকারের নাম ও বিরচিত শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থোক্ত কবিগণের নাম এস্থলে বাহুল্য ভয়ে উল্লিখিত হইল না।

সৎপদ্যরত্নাকর নামক পদ্যসংগ্রহে ৩১৪৬ টী শ্লোক আছে। এই সংগ্রহ গ্রন্থ গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক সংকলিত হয়। শান্তিপুরের রামযাদব চূড়ামণির নিকট যে হস্তলিখিত পুঁথি আছে, তাহাতে ১৩৯৭ শকাব্দ গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রণম্য গোবিন্দপদারবিন্দং
গোবিন্দদাসো বিদুষাং নিয়োগাৎ।
নানা-কবীনামনবদ্যপদ্যৈঃ
সৎপদ্যরত্নাকরমাতনোতি।

চন্দ্রশেখর কবি প্রৌঢ় বয়সে কাশীধামে অবস্থান কালে রাজা সুর্জ্জনের অনুরোধ-

* "Although the poetry collected is not of much value, it is of great use in identifying the poets whose names are of the highest importance as affording a limit on one side regarding their ages."
(Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. Vol. III, P. 134)

ক্রমে সুর্জ্জন-চরিত নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। রাজা সুর্জ্জনের জীবনী ইহাতে পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। রাজা সুর্জ্জন কাশী বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানের বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। গ্রন্থকার বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জিতামিত্র। চন্দ্রশেখর অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব বৈদ্য ছিলেন বলিয়া গ্রন্থ-সমাপ্তিবাক্যে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

গৌড়ীয়ঃ কিল চন্দ্রশেখর কবির্যঃ প্রেম-
পাত্রং সতাং।
অম্বষ্ঠান্বয়মণ্ডলাৎ কৃতধিয়ো জাতো জিতা-
মিত্রতঃ॥
নিত্যং স্বামিপসুর্জ্জনস্য নিতরাং ধর্ম্মৈকতা-
নাত্মনো।
গ্রন্থোহয়ং নিরমায়ি তেন বসতা বিশেশিতুঃ
পত্তনে॥

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি নবদ্বীপে বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ষড়্‌দর্শনবিৎ প্রসিদ্ধ দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার পিতার বিদ্যাভূষণ উপাধি ছিল। তিনি পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে সবিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। চন্দ্রশেখর সংক্ষেপ-দুর্গভঞ্জন, ধর্ম্মবিবেক, স্মৃতিপ্রদীপ, স্মৃতিসারসংগ্রহ নামক চারি খান স্মৃতি-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থ-দ্বয়ে তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বন্দ্যানন্দময়ীঃ স্মৃতা চন্দ্রশেখরশর্ম্মণা।
বরেন্দ্রান্বয়সম্ভূত—নবদ্বীপনিবাসিনা॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে গূঢ়শাস্ত্রার্থন্যাভিসন্ধিতঃ।
স্মৃতীনাং ক্রিয়তে দুর্গভঞ্জনঃ বুধরঞ্জনঃ॥
বিদ্যাভূষণ-বিখ্যাতঃ ষড়্‌দর্শনমতে সুধীঃ।
তৎসুতস্তাদৃশো ধীমাংস্ততোহধীতি চ তৎ
সুতঃ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরো নাম্না খ্যাতো বাচস্পতিঃ
ক্ষিতৌ।
স্মৃতীনাঞ্চ প্রকাশার্থং তনোতীমাং
প্রদীপিকাং॥

গোপাল ন্যায়পঞ্চানন এক জন বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ও স্মৃতিসংগ্রহকার। তিনি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের পরে প্রাদুর্ভূত হন। হলায়ুধের "সর্ব্বস্ব" ও রঘুনন্দনের "তত্ত্বের" ন্যায় তিনি "নির্ণয়" নামে অনেক গুলি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দনের "তত্ত্বের" ন্যায় গোপাল ন্যায়পঞ্চাননের "নির্ণয়ের" দুই চারি খানি গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় অনেক পণ্ডিতের গৃহই অলঙ্কৃত করিতেছে। গ্রন্থকার তৎ-প্রণীত কোন গ্রন্থেই নাম বা উপাধি ভিন্ন স্বকীয় অন্য কোন পরিচয়ই প্রদান করেন নাই। গোপাল ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত সম্বন্ধ-নির্ণয়, কাল-নির্ণয়, তিথি-নির্ণয়, প্রায়শ্চিত্ত-নির্ণয়, দায়-নির্ণয়, বিবাদ-নির্ণয়, আচার-নির্ণয়, সংক্রান্তি-নির্ণয়, উদ্বাহ-নির্ণয়, অধিকারি-নির্ণয়, শুদ্ধি নির্ণয়, বিচার-নির্ণয়, ও দুর্গোৎসব-নির্ণয়, এই ত্রয়োদশ খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

গোপাল শর্ম্মা নামে জনৈক বঙ্গীয় গ্রন্থকার "ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা" নামক কুলজী গ্রন্থে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতানুযায়ী বঙ্গদেশীয় কুলীন ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীবিভাগাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাস-স্থান ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারস্থিত হরিনদী গ্রামে ছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালা দেশ আক্রমণে প্রাচীন

গ্রন্থাদির সহিত কুলজীগ্রন্থের বিলোপের উপক্রম দর্শনে ব্যথিত হইয়া 'নন্দচতুর্ভুর্পে" শাকে এই গ্রন্থ বিরচনে প্রবৃত্ত হন।

নত্বা রামপদদ্বন্দ্বং গুরুঞ্চ কুলদেবতাং ॥
ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা কৃতা গোপালশর্ম্মণা।
বর্ণিকেন হতং সর্ব্বং পুস্তকং বিমলং মহৎ ॥

* * * *

গ্রামে হরিনদীরম্যে গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগতঃ।
শাকে নন্দচতুর্ভুর্পে শুভারম্ভঃ কৃতো মুদা ॥

আমরা চতুর্থ প্রস্তাবে শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রচলিত সংগ্রহ গ্রন্থ গোপাল ভট্ট প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি ভগবদ্‌ভক্তিবিলাস গ্রন্থে একাদশী তিথিতে ব্রতোপবাস ও বিষ্ণুপূজাদির মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার স্বয়ংই তাহার টীকা যোজনা করিয়া দিয়াছেন। গণেশ সহস্রনামের হ্লাদদায়িনী নামে ব্যাখ্যা পুস্তকও বোধ হয় এই গোপাল ভট্ট প্রণীত।

গোপালকৃষ্ণ কবিরাজ রসেন্দ্রসারসংগ্রহ নামক ভৈষজ্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বঙ্গদেশীয় ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

তন্ত্রদীপিকা নামক সুবিস্তীর্ণ তন্ত্রশাস্ত্রবিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থে প্রায় ১১৭১৫টী শ্লোক আছে। ইহা কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্যের তন্ত্রসারের ন্যায় তন্ত্রবিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ গোপাল ভট্ট প্রণীত। ইনি হরিনাথের পুত্র ও আগমবাগীশের পৌত্র বলিয়া সংকলিত গ্রন্থ মধ্যে স্বকীয় পরিচয় দিয়াছেন।

আগমবাগীশপৌত্রেণ হরিনামস্য সূনুনা।
শ্রীগোপালেন বিজ্ঞেন কৃতেয়ং তন্ত্রদীপিকা ।*

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

সাগরের উক্তি।

১

যারে যা কুটিলা নদি,
কেন আর নিরবধি
মিছে কুল্ কুল্ স্বরে জ্বালাস্ আমায়?
ও কপট প্রেম গানে
পরাণে সাঁড়াশী টানে
কলিজা ধমনী শিরা ছিঁড়ে যায় যায়!
পারি না সহিতে আর
এ কপট ব্যবহার
বাড়ব অনলে বুক জ্বলিছে সদায়,

---

*অপর এক গোপাল ভট্ট ভানুদত্ত প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রসমঞ্জরীর রসিকরঞ্জনী নাম্নী টীকা রচনা করেন। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এই রসমঞ্জরী বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। গোপাল ভট্ট দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম হরি ভট্ট। কালকৌমুদী নামে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানোচিত সময় বিষয়ে যে স্মৃতি গ্রন্থ আছে, তাহাও এই গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক বিরচিত।

শ্রীমদ্‌গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্ব্বণা।
ক্রিয়তে রসমঞ্জর্য্যাঃ টীকা রসিকরঞ্জনী ॥

শঙ্করাচার্য্য প্রণীত কঠোপনিষদ্‌ভাষ্যের কঠবল্লীভাষ্য বিবরণ নামে টীকা গোপাল যোগী নামা গ্রন্থকার প্রণীত। ভগীরথ মিশ্রের তনয় গোপালানন্দ বাণীবিলাস সারাবলী নাম্নী কালিদাসের কুমারসম্ভবের সুপ্রচলিত পূর্ব্বভাগের একখানি টীকা রচনা করেন।

মিছে তোর ও সোহাগে
নিদারুণ মহারাগে
ঝটিকা তুফানে বুক ভেঙ্গে চুরে যায়
অবিরাম অবিশ্রাম আছাড়ি বেলায়!

২

জন্ম তোর উচ্চ কুলে
বৃথাই গিয়াছি ভুলে
তোর মত নীচগামী দেখি নাই আর,
শুধু তোর সঙ্গ দোষে
জগতে এ নিন্দা ঘোষে,
নীচতর—নীচতম নীচ পারাবার
ভাঙ্গিয়া পাষাণ-কারা
হয়েছিস্ গৃহ-ছাড়া,
কত দেশে বেড়াইলি সংখ্যা নাহি তার,
কোথাও পা'লিনা কূল,
খেয়েছিস্ দুই কুল,
তোরে কুল দিয়ে শেষে অকূল আমার!

৩

বড় আশা ছিল মনে
তোর সনে সম্মিলনে
নির্ম্মল জীবনে প্রাণ হইবে নির্ম্মল,
এনে দিবি স্বর্ণকণা,
কিন্তু একি বিড়ম্বনা,
ঢেলে দিলি হা পাষাণি কাদা মাখা জল!
বিধাতা হয়েছে বাম,
গেল রত্নাকর নাম,
কর্দ্দমে মর্দ্দিলি মণি মাণিক্য সকল,
আরো দেখ বুক ভরা
কত যে জন্মেছে চরা
অপার বালুকা রাশি ব্যাপি নীল জল!

৪

কত দুঃখ—কত ক্লেশ
ভীম ভয়ঙ্কর বেশ
মকর হাঙ্গর নক্র কত জলচর,
অতল জীবন মম
মথিতেছে অবিরাম
মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই—তিল অবসর!
যদি কেহ সেঁচে জল
দেখিত এ বক্ষস্থল
দেখিত সে কিযে কাণ্ড—কিযে ভয়ঙ্কর—
হৃদয়ে লুকান মোর
কি যে সে বিপ্লব ঘোর,
প্রলয়ের ধ্বংস মূর্ত্তি—ভীত চরাচর!

৫

এ হৃদয়ে এক দিন ছিল শশধর,
দেবেরে দিয়াছি যাহা
এ হৃদয়ে ছিল তাহা,
আমারি অমৃত দিয়া দেবতা অমর!
দিছি পারিজাত ফুল,
কৌস্তভ মণি অতুল,
দিছি সর্ব্ব ফলপ্রদ কল্প তরুবর,
দিছি সর্ব্ব অবশেষে
ঐশ্বর্য্য—ঈশ্বরী বেশে
রাজশক্তি রাজলক্ষ্মীচাহিলে অমর!
কিন্তু আজি হায় হায়
কে বিশ্বাস করে তায়
সহস্র মন্দরে যদি মথে নিরন্তর,
সে সকল রত্ন আর
না উঠিবে পুনর্ব্বার
অতল কর্দ্দম রাশি—বালুকার স্তর
গ্রাসিয়াছে পারিজাত শশী সুধাকর!

৬

এখনো চাহিলে আহা শশধর পানে,
হৃদয় উছলে উঠে
বিশাল তরঙ্গ ছুটে,
কি যেন ভাবের উৎস খুলে যায় প্রাণে!

পারি না থাকিতে স্থির
ভাসাইয়া যায় তীর
সজোরে জোয়ারে তোরে ঠেলিয়া উজানে,
কিন্তু রে বেহায়া এত
তোর মত দেখিনে ত
আবার আসিস্ ফিরে কুল্ কুল্ গানে!
দিনে রেতে ঠেলে দেই যাস্ না উজানে!

৭

আহা!
এ বিষাক্ত চিন্তা প্রাণে সহেনা যে আর,
নিত্য অশ্রু জলে সিক্ত
জীবন হইল তিক্ত,
রটিল ক্ষীরোদ নামে কলঙ্ক আমার!
শরীর হইল কালা
প্রাণ করে ঝালা পালা,
আগুন লাগায় জলে নারী এ প্রকার!
কোথাহে অগস্ত্য আজ
কর বান্ধবের কাজ
বিশাল গণ্ডূষে আসি শোষ পারাবার!
নিবে যাক্ জীবনের যন্ত্রণা অপার!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

মিথিলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মিথিলা প্রদেশ বঙ্গীয় পাঠকগণের নিতান্ত অপরিচিত নয়। জীবন্মুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী, রাজর্ষি জনকের রাজধানী, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার ভগবান রামচন্দ্রের শ্বশুরালয়; মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা, প্রাতঃস্মরণীয়া, সতী সাধ্বী সীতা দেবীর আবির্ভাব স্থল বলিয়া রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে এই পুণ্যভূমি মিথিলার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। বিশেষ, যে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য আজ নবদ্বীপ ভারতের অগ্রণী বলিয়া খ্যাত, সেই ন্যায়শাস্ত্র মিথিলা হইতেই বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়, ইহা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পবিত্র স্থলের গৌরব দিন দিনই খর্ব্ব হইতেছে। রাজপুরুষদিগের অনুসরণ করিয়া আধুনিক ইতিহাস ভূগোল লেখকগণও এই প্রাচীন দেশের প্রকৃত নাম গোপন করিয়া ত্রিহুত নাম প্রচার করিতেছেন। সুতরাং কালক্রমে এই নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। নাম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার আভ্যন্তরিক ভাবেরও যথেষ্ট বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। এই প্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় কিয়ৎ পরিমাণে অবগত করাইবার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

মিথিলার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। শীতোষ্ণ উভয়েরই আধিক্য। বর্ষাও যথেষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক ভিন্ন অপর কোন দিক হইতে বায়ু বহে না। শীতকালে পশ্চিমদিক হইতে এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে পূর্ব্ব দিক হইতে বায়ু বহে। মলয় পবনের সঙ্গে এদেশের কোন সম্পর্কই নাই। মিথিলার প্রতি মা লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা। এখানে ধান্য যথেষ্ট উৎপন্ন হয়; এতদ্ভিন্ন সকল প্রকার রবি শস্যই প্রচুর

পরিমাণে জন্মে। কৃষকগণের বিশেষ সুবিধা এই যে, এক ক্ষেত্রেই ক্রমে দুই অথবা এককালীন অনেক প্রকার শস্যের বীজ বপন করিতে পারে। ইক্ষুর চাষও বিলক্ষণ হয়। তামাক উৎপন্নের জন্য মিথিলা বিখ্যাত। কিন্তু নীলকর সাহেবেরা জমীদারের নিকট হইতে গ্রামকে গ্রাম দীর্ঘকালের জন্য ঠিকা লইয়া প্রজার নিকট হইতে ভাল ভাল জমী কাড়িয়া লন এবং তাহাতে নীল বপন করেন। ইহাতে প্রজাসকলের যে কতদূর অনিষ্ট সাধন হয়, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, ঈদৃশী উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী বসুন্ধরার বক্ষে বাস করিয়াও মিথিলার প্রজাগণ পেটের জ্বালায় অস্থির! অনেকের দিনান্তেও উদরানল নির্ব্বাপণের উপায় হয় না। যাহা হউক, এবিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং রাজপুতদিগেরই প্রাধান্য। ব্রাহ্মণ সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রোত্রীয় (শোতী ভাষা) এবং সাধারণ ব্রাহ্মণ (বাহমন ভাষা)। শ্রোত্রীয়গণ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। ইহাঁদের সংখ্যা পঞ্চশত অতিক্রম করিবে না। শ্রোত্রীয়দিগের মধ্যে কাহারও সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে; বরং অনেকের অবস্থাই উন্নত। অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ কাহারও নাই। স্বনামখ্যাত দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এই শ্রেণীভুক্ত। মহারাজাই শ্রোত্রীয়গণের নেতা এবং তিনিই ইহাদিগের স্বচ্ছলতার কারণ। ইহাঁরাই মিথিলার আদিম ব্রাহ্মণ। অপর ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট অন্ন ইহাঁরা ভোজন করেন না। এই জন্যই শ্রোত্রীয়গণ ধনশালী হইলেও পাচক রাখিতে পান না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোন শ্রোত্রীয়েরই অবস্থা নিকৃষ্ট নহে, সুতরাং পাচকত্ব স্বীকার করিতে সহসা ইহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। সংখ্যায় অল্প বলিয়া সকলেই পরস্পর সম্পর্কে আবদ্ধ; সম্পর্কীয়লোকের বেতনভোগী হইয়া কর্ম্ম করায় মানের লাঘব। তবে মহারাজা এবং তাঁহার জ্ঞাতীদিগের কথা স্বতন্ত্র। ইহাঁরা প্রচুর বেতন জায়গিরাদি দিয়া শ্রোত্রীয় পাচক সংগ্রহ করেন। মধ্যবিৎ শ্রোত্রীয়গণ মহারাজা কিম্বা তাঁহার জ্ঞাতীদিগের বেতনভোগী হইতে বিশেষ অপমান বোধ করেন না, ইহাঁরা অপর ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন না বটে, কিন্তু ঘৃতপক্ক হইলে শূদ্রাদিতে (যাহাদের জল পানীয়) পাক করিয়া দিলেও লুচি তরকারী ইত্যাদি ভোজন করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন দিবা কিম্বা রাত্রে যতবার ইচ্ছা অন্ন ভোজন করিতে পারেন। আহারীয় বস্তুর মধ্যে অড়রেরডাল, আমলি এবং দধিই ইহাঁদের পরমোপাদেয় ভোজ্য। কোনপ্রকার ডাল তরকারীই ইহাঁরা আমলি না দিয়া রাঁধেন না। প্রবাদ আছে, কোন এক শোতীর ঘরে চোর আসিয়া অনেক দ্রব্য অপহরন করিয়া লয় এবং সেই সঙ্গে এক কলসী অড়রেরডালও লইয়া যায় কিন্তু ভুল ক্রমে তৎপার্শ্ববর্ত্তী আমলির হাড়ি ফেলিয়া যায়। প্রভাতে গৃহস্বামী চুরির সংবাদে বড়ই বিমর্ষ হইলেন। পরে যখন শুনিলেন, আমলির হাড়ি অপহৃত হয় নাই, তখন আশ্চর্য্য হইয়া সংবাদ দাতাকে বলিলেন "চোর ধরিবার বিলক্ষণ উপায়

হইয়াছে; যেহেতু সে কেবল ডালই নিয়াছে, আম্‌লি নেয় নাই, বিনা আম্‌লিতে যখন ডাল খাওয়া যায় না, তখন অবশ্যই আম্‌লি নিতে কিম্বা ডাল ফিরাইয়া দিতে আসিবে। অতএব এই চোর ধরিবার বিশেষ সুযোগ।" সম্ভবত গৃহস্বামী ন্যায়-শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন!!!

শোত্রীরা মৎস্য মাংস ভোজনে বাঙ্গালী অপেক্ষা পটু। এলাচি এবং গুবাক ইহাঁদের অতি প্রিয়। ধূমপানের রীতি ইহাঁদের মধ্যে নাই, কিন্তু শাদা তামাক চূণ মিশ্রিত করিয়া গুড়া করিয়া খাইয়া থাকেন; ইহার নাম "খইনি"। প্রায় প্রত্যেক শোত্রীর সঙ্গেই একটী থলিয়ায় গুবাক, লবঙ্গ, এলাচি, শাদা তামাক, চূণ এবং একখানা সরতা থাকে।

ইহাঁদের বিবাহ প্রণালীতেও কিছু বিশেষত্ব আছে। অপর ব্রাহ্মণের সঙ্গে শোত্রীর আদান প্রদান নিষিদ্ধ। কিন্তু শোত্রীর মধ্যে কন্যার অভাব হইলে মহারাজ বাহাদুরের অনুমতি লইয়া শোত্রী, ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন; কিন্তু বিবাহের পর কন্যা আর পিতৃ গৃহে যাইতে পারিবেন না। এই নিয়মের লঙ্ঘন করিলে শোত্রীর শোত্রীত্ব নষ্ট হয়। প্রত্যেক শোত্রীকে কন্যাদান কালে মহারাজার অনুমতি লইতে হয়। শোত্রী কোন ক্রমেই অপর ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে পারেন না। ইহাঁদের মধ্যে কন্যা বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত আছে। ঋতুমতী হওয়া পর্য্যন্ত কন্যা পিতৃ গৃহেই বাস করেন; পরে স্বামী গৃহে যান।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিম্বা দূরসম্পর্কীয় শ্বশুরের সঙ্গে জামাতার বাক্যালাপ কিম্বা দর্শনলাভ নিষিদ্ধ। রাস্তাপথে হঠাৎ দৈব-ঘটনায় জামাতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে উভয়েই দূর হইতে পলায়ন করেন। জামাতাকে শ্বশুর বাড়ী গিয়া আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবরণে থাকিতে হয়। পরদার আড়ালে কিম্বা অপর গৃহে থাকিয়া জামাতা শ্বশুরমহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করেন, কোন তৃতীয় ব্যক্তি এই সংবাদ শ্বশুরের কর্ণগোচর করিলে তিনিও জামাতাকে উদ্দেশ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। শ্বশুরের সঙ্গেই যখন এইরূপ ব্যবহার, তখন শাশুড়ীর সঙ্গের ব্যবহার আর বুদ্ধিমান পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না। জামাতা অতি বৃদ্ধ কালে শ্বশুরালয় গেলেও এই নিয়ম পালন করিতে হয়। সর্ব্বদাই অধোদৃষ্টিতে থাকিতে হয়, পাছে কোন শ্বশুর শাশুড়ী নয়নগোচর হয়। আমাদের পক্ষে "শ্বশুর বাড়ী মথুরাপুরী", ইহাদের পক্ষে যমের বাড়ী! ধন্য দেশাচার!

স্ত্রীলোকেরা অতি নোংড়া। সধবা স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই স্নান করেন না, মাসের মধ্যে যদি ২।১ দিন স্নান করেন ত সেই অধিক। বিধবারা প্রত্যহই স্নান করেন। বালকগণের যে পর্য্যন্ত উপনয়ন না হয়, সে পর্য্যন্ত কদাচিত স্নান করে; সুতরাং শরীরে অতি দুর্গন্ধ হয়। উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত বালকেরা শূদ্রাদির অন্ন ভোজন করে।

ইহাঁরা পিতাকে "দাদাজি", মাতাকে "দাই", পিতামহ ও মাতামহকে "বাবা" পিতামহী ও মাতামহীকে "মাঁইয়া", এবং প্রপিতামহী ও প্রমাতামহীকে "দা" বলিয়া সম্বোধন করেন। মাতুলানীর সঙ্গে এঁদের ঠাট্টা তামাসা চলে, বিশেষ ২ পর্ব্বোপলক্ষে

মাতুলানীর প্রতি অশ্লীল ভাষাপূর্ণ গালি বর্ষণও করিয়া থাকেন।

শোত্রীদিগের মধ্যে সকলেরই চাষ আছে, তদ্দারাই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, বরং কাহারও কাহারও উপস্বত্ব থাকে। শোত্রীরা যত দিন দ্বারভাঙ্গা সহরে থাকেন, তত দিন পান ভোজনের ব্যয় মহারাজাই বহন করেন। মর্য্যাদানুসারে এই ব্যয়ের তারতম্য আছে। ন্যূনকল্পে দৈনিক চারি আনার কম্ কাহাকেও দেওয়া হয় না। ছোট ছোট বালকগণও এই নিয়মে পাইয়া থাকেন। বৎসরাবধি যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের জন্যও এই নিয়ম লক্ষিত হয়। শোত্রীদিগের এই একটী বিশেষ সুবিধা; বিশেষ বালকগণের পক্ষে; কারণ, সর্ব্ব সাধারণের জন্য মহারাজার অবৈতনিক ইংরাজি স্কুল এবং সংস্কৃত পাঠশালা আছে; তাহাতে আবার শোত্রীদিগের ভোজনের এই প্রকার সুব্যবস্থা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শ্রোত্রীয় বালকগণ বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী নয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক অতি কম। তবে আজকাল কেহ কেহ এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। শোত্রীদিগের মধ্যে কেহই নিরক্ষর নাই। সংস্কৃতের আলোচনাও কিছু আছে। যাঁহারা অধিক পড়াশুনা না করেন তাঁহারাও অন্ততঃ লঘুকৌমুদির কয়েক পাতা এবং অমর কোষের কয়েক পংক্তি কণ্ঠস্থ করিয়া এবং মুখে মুখে শাস্ত্রীয় ২।৪ কথা শিখিয়া, ললাটে চন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়া, মস্তকে বড় বড় উষ্ণীষ চাপাইয়া রাজদরবার এবং অন্যান্য স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এদের পাগড়ী দেখিতে কুতূহল জন্মে। পাগড়ীর কাপড়ের দৈর্ঘ্য ৩০।৭০ বা ৮০ হাত পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। ভাল পাগড়ীর বারাণ্ডা এবং খিড়কিও থাকে। শোত্রীগণ বেশ বাকপটু, অর্থাৎ অনর্থক গল্প এবং পরনিন্দায় বিশেষ পটু! সম্মুখে হুজুর বলিয়া পশ্চাতে গালি বর্ষণ করেন। স্বভাবতঃই ইহারা কুটিল। লোকের নামে মিথ্যা অপযশ ঘোষণা করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হন না।

সাধারণ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর এবং আচার ভ্রষ্ট। যাহারা নিরক্ষর, তাহাদের কৃষিকর্ম্ম, গরু ও মহিষ চরাণই কাজ। এরূপ অনেক মহাত্মা আছেন, যাহাদের উপবীত গুপ্ত থাকিলে চণ্ডাল কিম্বা তদপেক্ষা কোন নিকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া ভ্রম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ইহাদের বিবাহ প্রণালীতেও একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। বাড়ীতে ঘটক গিয়া সম্বন্ধ নিরূপণ ইহাদের কদাচিৎ হয়। বৎসরের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট দিন একটী নির্দ্দিষ্ট আম বাগানে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ আসিয়া মিলিত হয়। সেখানে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার পরস্পর আলাপ পরিচয় হইলে কথা স্থির হয়। এই সমস্ত লোক ২।৩ দিন ঐ বাগানে অবস্থিতি করে। এই অসংখ্য লোকের আহারীয় সামগ্রী, দ্বারভাঙ্গার সুযোগ্য, পুণ্যশীল, বদান্য, উদারচেতা মহারাজার সরকার হইতে প্রদত্ত হয় এবং লোকের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, এজন্য রাজধানী হইতে একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী এই বাগানে প্রেরিত হন। তিনি সুনিপুণ

ব্যবস্থা করিয়া সকলের শান্তি বিধান করেন।

এইরূপে বাগানে বসিয়া কথার স্থিরতা হইলে বর কন্যা দেখিয়া বিবাহের দিন ধার্য্য করা হয় এবং যথারীতি বিবাহ সম্পন্ন হয়।

ব্রাহ্মণেরা দধি চিড়ার অতি প্রিয়। দধি চিড়া পাইলে আর অন্য কিছু চায় না। এমন কি ক্রমাগত মাসাবধিও ইহারা ভাত না খাইয়া দধিচিড়া খাইয়া থাকিতে পারে। কোথা হইতে নিমন্ত্রণ আসিলে প্রথমেই ইহারা অনুসন্ধান লয় যে নিমন্ত্রণে "দহি চুড়া" হইবে কি "চুড়া দহি" হইবে। এর তাৎপর্য্য এই যে "দহি চুড়ায়" দহির এবং "চুড়া দহিতে" চুড়ার আধিক্য।

কায়স্থদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। ইহারা লেখনী সঞ্চালন এবং কৃষি কার্য্যই করিয়া থাকে। ভোজনে ইহারাও বিলক্ষণ পটু, কিন্তু ব্রাহ্মণের ন্যায় আকণ্ঠপূরণ করে না। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয় জাতিতেই কন্যার বাল্যকালে বিবাহ হয়। তবে ব্রাহ্মণ কন্যার যত অল্প বয়সে বিবাহ হয়, কায়স্থ কন্যার বিবাহ তদপেক্ষা কিছু অধিক বয়সে হয়। এই উভয় জাতিতেই পুরুষদিগের যুবাবস্থায় বিবাহ হইতেই সচরাচর দৃষ্ট হয়। এই উভয় জাতীয়া কন্যারাই ঋতুমতী না হইয়া স্বামী গৃহে যাইতে পান না। ঋতুমতী হইলেই স্বামী গৃহে যান; স্বামী গৃহে প্রথম যাত্রাকে ইহারা "দ্বিরাগমন" বলে।

এইবার নীচশ্রেণীর লোকের বিষয় লিখিতে হইতেছে। ইহাদের অবস্থা স্মরণ হইলে মনে বড় ব্যথা লাগে। শরীরের রক্ত দিয়া শস্য জন্মায়, কিন্তু শস্য তাহাদের উদর পূর্ত্তির সাহায্যে আসে না। জমীদার এবং মহাজনের পীড়নেই ইহারা ব্যতিব্যস্ত। তার উপর আবার ঠিকাদার নীলকর সাহেবেরা আছেন। গরিব প্রজা যায় কোথায়? পেট ভরিয়া ভাত খাওয়া দূরে থাকুক, মাড়ুয়ার রুটী দিয়া উদর পূরণ করিতে পারিলেও অনেকে কৃতার্থমন্য হয়। কি দুর্ভাগ্য! শ্রাবণ ভাদ্র মাসে অনেকের দিনান্তেও একবার হয় না। অনেক সময় যে সমস্ত লোমহর্ষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। যাঁহারা মিথিলার পল্লীগ্রামে আসিয়া কৃষীজীবিদিগের অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন অপরের বুঝিয়া উঠা কঠিন। শস্য কাটিয়া আনিয়া ঘরে রাখা দূরে থাকুক, বিক্রয় করিয়া জমীদারের খাজানা, নজর, মহাজনের স্থদ, গোমস্তা পাটোয়ারীর সেলামী এবং সিপাহীর আগমনী প্রভৃতি অবশ্য দেয়ও পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই পুনরায় ঋণ করিতে হয়।

মজুরি করিবারও সুবিধা নাই। ঘরের খাইয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করিলে দুই সের কি আড়াই সের ধান অথবা এক আনা দেড় আনা পয়সা বই মেলে না। আবার খোলাভাটী থাকিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছে। ২।৪ পয়সা যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনে, তদ্দ্বারা আহারীয় সামগ্রী কিনিতে পারিলেও কথঞ্চিত উপকার হয়; কিন্তু সে পয়সা প্রায় ঘরে আসে না। পথে যথেষ্ট তাড়ীর দোকান আছে, সেই খানেই রাখিয়া আসিতে হয়। বাড়ীতে স্ত্রী হাঁড়ি ধুইয়া বসিয়া আছে, স্বামী সমস্ত দিনের উপার্জ্জিত পয়সা দ্বারা তাড়ী পান করিয়া

আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য গীত করিতে করিতে আসিয়া হয়ত অনাহার-পীড়িতা মাকে প্রহার করিয়া বসিলেন, সুতরাং এদিনের হরিবাসর পরিণাম। স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য ভিন্ন অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাও বিলক্ষণ করে। এবিষয়ে তাহারা পুরুষাপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে বরং বাজিল; কারণ পুরুষের উপার্জ্জিত পয়সা প্রায় তাড়ীতে ব্যয় হয়, স্ত্রীলোকের উপার্জ্জিত পয়সাই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যয় হয়। এমনি দুরদৃষ্ট! স্ত্রীপুরুষে সমভাবে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও পেটের জ্বালা ঘুচাইতে পারে না। রাজা, জমীদার, এবং মহাজনের স্বার্থপরতা যদিও এই জীবন-কষ্টের কারণ, তথাপি প্রজাদিগের অনবধানতাও এর অন্যতম কারণ। সাধারণতঃ এ দেশের লোকের বুদ্ধি কিছু স্থূল, কোন বিষয়েরই রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারে না।

এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রথা আছে। শিশু বিবাহই এদের মধ্যে প্রচলিত। বালকগণের ৫।৭ বৎসরের মধ্যে এবং বালিকাগণের ৩।৪ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। যে সকল বালকের ৫।৭ বৎসরের মধ্যে বিবাহ না ঘটে, তাহারা আর কুমারী বিবাহ করিতে সমর্থ হয় না। বয়স অপেক্ষাকৃত বেশী হইলে, এমন কি দশ বৎসর অতিক্রম করিলে বিধবা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। বিধবার সহিত বিবাহকে ইহারা বিবাহ বলে না, “সম্বন্ধ” বলে। ইহাদের মধ্যেও কন্যা বয়স্থা না হইলে স্বামী গৃহে যায় না। ইহারা অতি অপরিষ্কার। বিশেষ, স্ত্রীলোকেরা। তাহারা প্রায়ই স্নান করে না, কদাচিৎ স্নান করিলেও কাপড় ধোয় না। কেহ কেহ বা নূতন কাপড় পরিয়া, সেই কাপড় পুরাতন হইয়া পরিধানের নিতান্ত অনুপযুক্ত না হইলে আদৌ ত্যাগ করে না। সুতরাং ঐ সকল লোকের কাছে থাকা দায়। উহারা কাছে আসিলে নাকে কাপড় না দিয়া থাকা যায় না। দারিদ্র্যই যে ইহার মুখ্য কারণ, এমনও নয়। আলস্য এবং অভ্যাসই ইহার মূল।

এখন পাঠকগণকে এ দেশের একটু সাধারণ ভাব জ্ঞাত করিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব। মৈথিলদিগের ভাষা স্বতন্ত্র কিন্তু বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের সঙ্গে বেশ ঐক্য আছে। অক্ষরে প্রায়ই বাঙ্গালা অক্ষরের ন্যায়, প্রভেদ অতি অল্প।

বঙ্গদেশে যেরূপ দেবার্চ্চনা, উৎসব পার্ব্বনাদি আছে, এদেশে সেরূপ দেখা যায় না। “চৌঠচাঁদ” এবং “ছট”ই এ দেশের প্রধান পর্ব্ব। এ পর্ব্ব, সর্ব্ব সাধারণের গৃহেই লক্ষিত হয়। এই উভয় দিনই স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীআচার নির্ব্বাহ করিয়া আহারের যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করে। ‘চৌঠ চাঁদের’ অর্থ নষ্ট চন্দ্র। আমাদের দেশে এ দিন চন্দ্র দর্শন নিষিদ্ধ, এদেশে চন্দ্র দর্শন অবশ্য-কর্ত্তব্য। “ছটের” অর্থ ষষ্ঠী পূজা, এটী কার্ত্তিক মাসে হইয়া থাকে। শ্রীপঞ্চমীর দিন এ দেশে কোন উৎসব নাই, কিন্তু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন দোয়াত পূজা হয়। ভাইফোঁটার প্রথাও আছে। দীপান্বিতার দিন রাত্রে দীপ যাত্রা হইয়া থাকে। দোলের সময় আবির এবং কাদার বিলক্ষণ ছড়াছড়ি হয়। সকলের আবির জোটে না বলিয়াই বোধ হয় কাদার

ব্যবস্থা। দোল যাত্রাকে ইহারা "ফাগুয়া" বলে। এদিন পূজার্চ্চনার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই, কেবল লোকের প্রতি অশ্লীল গালি বর্ষণ করা হয়। রামনবমীর দিন কোন কোন বাড়ীতে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান্ প্রভৃতির মূর্ত্তি পূজা হয়। হনুমানকে ইহারা দেবতা বলিয়া মানে। লোকে যত্ন করিয়া ছেলে পিলের নাম হনুমান রাখে। সচরাচর লোকে যে নাম রাখে, তাহার কোন অর্থই নাই এবং শুনিতেও কদর্য্য।

প্রকৃতপক্ষে এদেশে শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব। এই অভাব অপনয়নের আশু চেষ্টা না হইলে স্থানীয় লোকের দুঃখ দূর এবং সুখবর্দ্ধনের অন্য উপায় নাই।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বসু।

সীতারাম রায়।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের মধ্যে সাড়ে সাত-ঘর* কায়স্থ আছে। তন্মধ্যে কাশ্যপদাস নিকৃষ্ট। এই কাশ্যপদাসের বিশ্বাস খাস ধারায় সীতারামের জন্ম। হরেকৃষ্ণ রায় নামক কৃষ্ণবিগ্রহের মন্দিরোপরি ইষ্টকে লিখিত যে কবিতা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সীতারামকে "বিশ্বাসখাসোদ্ভবকুলকমলে ভাসকোভানুতুল্যঃ" বলিয়া ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কুলজীতে বিশ্বাস খাস বংশের এইরূপ বর্ণনা আছে ;—

"হালচসে তাল খায় গিধিনেতো বাস।
তাহাতে হইলেক নাম বিশ্বাসখাস"॥

এইরূপ হীনবংশে সীতারামের উৎপত্তি। সীতারামের পিতার নাম উদয় নারায়ণ দাস। পরিশিষ্টে যে নক্সা প্রদত্ত হইবে, তাহাতে উদয়গঞ্জের খাল ও উদয়গঞ্জের হাট নামে দুটী স্থান দৃষ্ট হইবে। তাহাই তাঁহার পিতার নামের প্রমাণ।

সীতারামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম লক্ষ্মী-নারায়ণ রায়। সীতারাম হইতে এই দাস বংশ "রায়" উপাধি দ্বারা খ্যাত। পর পৃষ্ঠের শিরোভাগে সীতারামের বংশাবলী দেওয়া যাইতেছে।

সীতারামের প্রপৌত্র রাধাকান্ত রায়ের দৌহিত্রবংশে উমাচরণ দাস বিদ্যমান আছেন। তিনি অতি দীনভাবে কাল যাপন করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতেই আমি বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি। সীতা-রামের সহোদর লক্ষ্মী নারায়ণের উত্তর পুরুষ দেবনাথ রায় হরিহর নগরে বাস করিতেছেন।

সীতারামের প্রাদুর্ভাব কাল নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। তৎকৃত দশভুজালয়, হরেকৃষ্ণ রায় এবং লক্ষ্মীনারায়ণ নামক মন্দিরত্রয়ের শীর্ষ দেশে এক একটী কবিতা ইষ্টকে খোদিত ছিল। তন্মধ্যে হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর কবিতা আমি পাঠ করিয়াছি।

* ঘোষ—১
সিংহ—১
মিত্র—১
দত্ত—১
মধুকুল্যদাস—১
কাশ্যপ দাস—১
শাণ্ডিল্য ঘোষ—১
কর—$\frac{১}{২}$
ভরদ্বাজ—$\frac{১}{২}$
———
৭ $\frac{১}{২}$

+ রাঢ়

উদয়নারায়ণ দাস।

জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (ভগিনী অজ্ঞাত) সীতারাম রায়
তাহার পতি রঘুনাথ দাস

জয়নারায়ণ বিজয়নারায়ণ নরনারায়ণ স্বরনারায়ণ রায় শ্যামসুন্দর রায়

মুলুকচন্দ্র নেহালচন্দ্র প্রেমনারায়ণ রায়

কৃষ্ণকান্ত রাধাকান্তরায়

রমানাথ রঘুনাথ প্রাণনাথ সুন্দরমণি অলকমণি নবকুমার রায় (বংশ লোপ)

চৈতন্য গুরুদয়াল

কমলাকান্ত (লোপ)

দেবেন্দ্রনাথ রায় (বর্ত্তমান)

গিরীশচন্দ্র দাস

উমাচরণ দাস (বর্ত্তমান বয়স ৪০)

আর দুটী কবিতা, ইতিপূর্ব্বে ইষ্টক স্খলিত হওয়াতে অদৃষ্ট হইয়াছিল ; কিন্তু সে দুটী কবিতা যাঁহার মুখস্থ আছে, এমন লোকের নিকট হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। কবিতা তিনটী নিম্নে লিখিত হইল ;—

(১) দশভুজালয় মন্দিরে।*

মহীভুজরস ক্ষৌণীশকে দশভুজালয়ং
অকারি শ্রীমতাসীতা রাম রায়েন মন্দিরং

অর্থ। ১৬২১ শকে (১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) সীতারাম রায় কর্ত্তৃক দশভুজালয় নামক মন্দির কৃত (নির্ম্মিত) হয়।

(২) হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দিরে।†

বাণদ্বজাঙ্গ চন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ
শ্রীমদ্বিশ্বাস খাসোদ্ভবকুলকমলে ভাসকোভানুতুল্যঃ।
ভ্রজস্নেহোপযুক্তং রুচির রুচিরহরেকৃষ্ণগেহং বিচিত্রং।
শ্রীসীতারাম রায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমত্তঃ সসর্জ্জ।

অর্থ। ১৬২৫ শকে (১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে) কৃষ্ণের সন্তোষের জন্য রুচির রুচিহর শ্রীমদ্বিশ্বাস খাসোদ্ভবকুলকমলে রবি সদৃশ শ্রীসীতারাম রায় ভক্তিমত্ত হইয়া যদুপতিনগরে বিচিত্র কৃষ্ণ গেহ নির্ম্মাণ করিলেন।

(৩) লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে।

লক্ষ্মীনারায়ণ স্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশ
নির্ম্মিতং পিতৃ পুণ্যার্থে-সীতারামেণ মন্দিরং।

অর্থ। ১৬২৬ শকে (১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে) লক্ষ্মীনারায়ণ নামক শিলাচক্র সংস্থাপনের জন্য পিতৃ পুণ্যার্থে সীতারাম রায়ের কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়।

এই তিন কবিতা দ্বারা স্থির করা যায়,

* ইহার ভিতর সীতারামের সময়ের অষ্টধাতু নির্ম্মিত দশভুজা মূর্ত্তি অদ্যাপি পূজিত হয়। তজ্জন্য সেই সময় হইতে যে ব্রহ্মোত্তর ছিল, অদ্যাপি তাহা আংশিকরূপে আছে।

† এইমন্দির যদুপতিনগর (বর্ত্তমান কানাই নগর) গ্রামে স্থিত। ইহাতে কৃষ্ণ বিগ্রহের ঐ প্রকার পূজা হয়।

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সীতারাম রায় বিদ্যমান ছিলেন।

মহাম্মদপুরের দুই ক্রোশ উত্তরে ধুলজুড়ী গ্রামে একটী ভগ্ন মন্দিরের ভিতরের দিকে নিম্ন লিখিত কবিতা ইষ্টকে খোদিত ছিল। কবিতাটী এই ;—

স্বর্ণচন্দ্র রসইন্দৌ কৃষ্ণচন্দ্রস্য মন্দিরং
ইদং কৃতি মুনীরামো রামভদ্রস্য নন্দনঃ। *

অর্থ। ১৬১০ শকে (১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) রাম ভদ্রের পুত্র মুনীরাম কৃষ্ণচন্দ্র নামক বিগ্রহের মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

মুনিরাম (রায়) ঢাকাতে, পরে মুর্শিদাবাদে সীতারামের উকীল ছিলেন। ইনি বঙ্গজ কায়স্থ। সম্ভবত সীতারামের কার্য্যোপলক্ষে তিনি এ অঞ্চলে আসেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য কবিতাকারে প্রচলিত আছে। কবিতাটী এই ;—

কোন্ সীতারাম রায় ?
যেস্কা উকীল মুনীরাম রায় ? †

স্থানান্তরে এই কবিতার অর্থ ও তদ্ঘটিত ঘটনা বিবৃত করিব। এস্থলে, বোধ হয়, ইহা বলা যাইতে পারে যে, মুনীরাম রায় কৃত উপরোক্ত কৃষ্ণ মন্দির নির্ম্মাণ কালে সীতারাম এমন বয়স্ক হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং উকীলাদি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। এই মন্দির নির্ম্মাণ কালে যদি তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর ধরা যায়, তবে তাঁহার জন্ম সন ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে।

ক্রমশঃ।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

ভুল।

১

একি হ'লো ভুল!
আমার একি হ'লো ভুল!
সকলি ঘুচিয়া গেল, দুখেতে আকুল।
আমার একি হ'লো ভুল!

২

কি জানি, কি ক্ষণে ভুলে,
চেয়েছিনু আঁখি তুলে,
নয়নে নয়নে মিল, প্রাণে প্রাণে ভুল!
হৃদয় নির্ম্মূল।

৩

না দেখে, না শুনে কিছু,
না ভাবিয়া আগু-পিছু,
বাসনা-নদীর মোর ভেসে যায় কূল।
আমার একি হ'লো ভুল!

৪

হায় হায়, যার আঁখি,
প্রেমে স্বপ্নে মাখামাখি,
তার আঁখি হ'লো একি যাতনার মূল!
আমার একি হ'লো ভুল!

শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল।

* মুনিরাম রায়ের প্রপৌত্র শতবর্ষবয়স্ক প্রাণনাথ রায় মহাশয়ের প্রমুখাৎ এই কবিতা গৃহীত।

† এই প্রবাদ বাক্য প্রাণনাথ রায় ও তাঁহার স্ত্রী সমর্থন করেন। উভয়েই অত্যন্ত বৃদ্ধ।

মহিমা ধর্ম্ম।†

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে ধর্ম্মের নামাঙ্কিত হইল, তাহা বিগত প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে উৎকল ও মধ্য ভারতবর্ষের বহুতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদিও পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মের প্রচারের ন্যায় এই ধর্ম্মের প্রচার বিশেষ আড়ম্বর ও আন্দোলনের সহিত সাধিত হয় নাই, যদিও এই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের নাম অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের নামের ন্যায় বহুবিস্তৃত লোক-প্রসিদ্ধি ও গৌরব-ভূষণে বিভূষিত হয় নাই, তথাচ দুই এক জন নয়, দুই এক শত নয় কিন্তু সহস্র সহস্র লোককে এই ধর্ম্মে নিবিষ্ট দেখা যায়। সুতরাং লোকসমাজে তাদৃশ খ্যাতি-প্রতিপত্তি না থাকিলেও মহিমা-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক যে এক জন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের প্রকৃত নাম কি, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কেহ বলেন, ধুলিয়াবাবাজী, কেহ বলেন অলখ্‌বাবাজী, আবার কেহবা বলেন মহিমাবাবাজী! তিনি ধুলি অর্থাৎ মৃত্তিকাতে শয়ন করিতেন বলিয়া বোধ হয় ধুলিয়াবাবাজী নামে আখ্যাত হইয়া থাকিবেন, এবং শেষোক্ত নামদ্বয় বোধ হয় তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের নামানুসারে হইয়াছে। কেননা তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে কেহ অলখ্ ধর্ম্ম কেহ বা মহিমাধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, কেহ তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃত নামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে "আমি নিজের কোন নাম রাখিব না, কিন্তু প্রভুর নামই রাখিব।" তাঁহার নাম সম্বন্ধে যেমন কেহই প্রকৃত সংবাদ অবগত নহে, সেইরূপ তাঁহার প্রকৃত জন্মস্থান কোথায় ছিল, তাহাও কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। সুতরাং এই ধর্ম্মসংস্থাপকের প্রকৃত নাম ও জন্মভূমির সংবাদ আমরা পাঠকগণের জ্ঞানগোচর করিতে পারিলাম না। তবে অলখ্‌ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে অনেকে অনুমান করিয়া বলেন যে, তাঁহার জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে গয়ার সন্নিকটে কোন স্থানে ছিল। যে স্থানে হউক আর যে সময়েই হউক, এরূপ বর্ণিত আছে যে, মহিমাবাবাজী বৈশাখী পূর্ণিমার দিন রবিবার প্রাতঃকালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। মহিমাধর্ম্মাবলম্বীদিগের নির্গুণ মাহাত্ম্য নামক পরমপূজ্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তিনি কপিলঋষির পুত্র।

কপিলঋষিঙ্কর সুত, নাম তাহাঙ্ক অবধূত।
দীক্ষহিঁ অবধূত বেশ, ত্যাগিলা সংসার
বিশেষ॥
বাল্যকালেরু হইল যোগী, সন্ন্যাসভাবে
সর্ব্বত্যাগী।

যদিও এই সকল পদ উৎকল-দেশীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তথাচ বাঙ্গালার

† এই ধর্ম্মাক্রান্ত এক জন অবধূতের নিকট হইতে আমরা এবিষয়ে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই এই প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ করিব। সুতরাং বর্ণনীয় বিষয় সকলের সত্যাসত্যের জন্য আমরা দায়ী নহি। তবে কেহ কোন স্থান ভ্রমসঙ্কুল দেখিয়া তাহা সংশোধনের জন্য প্রকৃত বিষয় আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব। লেখক।

সহিত এ সকলের এমন কিছু গুরুতর পার্থক্য নাই, যদ্দ্বারা এ দেশীয় পাঠকবর্গের অর্থবোধে কষ্ট হইতে পারে, পাঠকগণ একটু চিন্তা করিলেই সহজে ঐ সকলের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যাহা হউক, মহিমাবাবাজী বাস্তবিক কপিলঋষির পুত্র ছিলেন কি না, সে বিষয় পাঠক বিচার করিয়া দেখিবেন। আমাদের সে বিষয়ে বাদপ্রতিবাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। তবে আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা যে নিজ নিজ প্রবর্ত্তক পুরুষের জন্ম, মৃত্যু, আহার, বিহার ইত্যাদি নৈস-র্গিকও শারীরিক ব্যাপার সকলকে অলীক ও অতিবর্ণনায় বর্ণিত করেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং যে রীতি সর্ব্বগত এবং সর্ব্বকালপ্রচলিত, তখন মহিমাসম্প্রদায়ে কেন তাহা উপেক্ষিত হইবে ?

পূর্ব্বোক্ত পদাবলীর মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে, বাল্যকালেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। এমন কি শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সাত বৎসর বয়সের সময়েই সংসার পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসা-বলম্বনের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে ;— তিনি একদিন কোন বৃক্ষমূলে বসিয়া দেখিতে পাইলেন, একজন নৃশংসস্বভাব ব্যাধ আসিয়া একটী কপোত-শাবককে ধরি-বার জন্য জাল বিস্তার করিল। অবিলম্বে সেই কপোতশিশু জালে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে করিতে ব্যাধের হস্তে আক্রান্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে সেই কপোতমাতা আসিয়া সন্তানের দুর্দ্দশা দর্শন করিল এবং সেও পুত্রদুঃখে দুঃখিনী হইয়া সেই জালে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার মন চিন্তিত ও আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি বিনাব্যতিরেকে সংসারপাশ ভেদ করিয়া প্রব্রজ্যার অনুগামী হইলেন। কারণ তিনি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আমিও যদি আসক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সংসার মধ্যে অবস্থান করি, তবে আমাকেও এইরূপ মায়াজালে জড়িত হইতে হইবে।

বিশ্বচরাচর যে একখানি পরমসুন্দর অতি জ্ঞানগর্ভ অভ্রান্ত শাস্ত্র এবং ইহা নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতে পারিলে মনুষ্য যে বহু পরিমাণে জ্ঞানরত্ন আহরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা প্রায় সকল সাধু মহাত্মার জীবনেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদিগের চিন্তা-শক্তি ও প্রতিভাবলে সময়ে সময়ে জন-সমাজের আমূল পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে, অথবা যাঁহাদিগের চরিত্রগত পরম পবিত্র পুণ্যদীপ্তিতে ধরণীর মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই পুস্তকগত জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া প্রকৃতিরূপ এই পরমশাস্ত্রের অধ্যয়নে গাঢ়ভাবে মনো-নিবেশ করিয়াছিলেন। সুনীল নভোমণ্ডলের একটি উজ্জ্বল তারকা, সমীরণের মন্দ মন্দ প্রবাহ, বিহঙ্গকণ্ঠের কলকলধ্বনি, পর্ব্ব-তের স্থির গম্ভীর শৃঙ্গমালা, অনন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের বিপুল গাম্ভীর্য্য, মস্তকোপরি অসীম কল্প আকাশমণ্ডলের উদাস ও প্রমুক্ত ভাব ইত্যাদি গ্রন্থসকল বিশুদ্ধচিত্তে ও নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করিলে কাহার না চিত্তে অজস্রধারে জ্ঞানবারি বর্ষিত হইতে থাকে ? এ সকল ত দূরের কথা, আমাদিগের ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত অগ্নি জল মৃত্তিকা প্রভৃতি সামান্য [illegible]

বস্তুর তত্ত্ব আলোচনা করিলেও আমরা প্রচুর পরিমাণে শিক্ষা পাইতে পারি। হয়ত কেহ জন্মাবচ্ছিন্নে পুস্তকের মুখ অবলোকন না করিয়াও এই সকল পদার্থ হইতে প্রভূত পরিমাণে পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারেন। আমাদিগের প্রস্তাবিত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকও সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া এইরূপে নানাপ্রকার নৈসর্গিক পদার্থ হইতে অনেক পরমসুন্দর হিতকর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। মহিমাবাবাজী সংসার পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য গুরুর নিকট গমন করেন নাই, কিন্তু তিনি আকাশ পৃথিবী বায়ু প্রভৃতি পদার্থকে গুরুপদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষারম্ভ করিলেন। তিনি দেখিলেন, পৃথিবী নীরবে শীত বাত সকলই সহ্য করিতেছে, লোকে তাহার উপর কত কি করিতেছে, অথচ পৃথিবী অম্লানবদনে লোকদিগকে কেমন ফল শস্য দান করিতেছে; ইহা দেখিয়া তিনি শিক্ষা করিলেন যে আমিও এইরূপে লোকের নিন্দা তিরস্কার অত্যাচার প্রহার সকল সহ্য করিয়া মনুষ্যদিগকে অনাদির জ্ঞানো-পদেশ প্রদান করিব। তাহার পর দেখি-লেন, জলমধ্যে কি ধনী কি দরিদ্র কি পাপী কি পুণ্যবান্ সকলেই আসে, জল সকলকেই শীতল করে। তদ্দর্শনে তিনি স্থির করি-লেন যে, আমার নিকটেও সকলে আসিলে আমি তাহাদিগকে সেই অনাদি দেবতার নামে শীতল করিব। সূর্য্যকিরণ নির্ব্বিকার-ভাবে পৃথিবীর ভাল মন্দ সকল স্থানে পতিত হইয়া সকলের উপকার করে, ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, আমিও ঐরূপ নির্ব্বিকারভাবে সকলের কল্যাণসাধন করিব। তিনি মেঘের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, মেঘসকল শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিয়া পৃথিবীকে আচ্ছাদন করে এবং পৃথিবীর উপরে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়া তাহাকে ফল শস্যে সুশোভিত করে। ইহা দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, আমিও সেইরূপ অনন্তের আকাশ হইতে জ্ঞানমেঘ লাভ করিয়া পৃথি-বীতে বিতরণ করিব, এবং তাহা বৃষ্টিধারার ন্যায় পতিত হইয়া লোকের হৃদয়ে ভক্তি শস্য উৎপাদন করিবে। নদীর নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করিলেন যে, নদী যেমন প্রবাহিত থাকিলেই তাহার জল নির্ম্মল থাকে এবং বদ্ধ হইলেই জল অপরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়; সেইরূপে আমিও এক স্থানে বদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইব। একস্থানে বদ্ধ থাকিলে পাছে কলঙ্কিত হইতে হয়, এই কারণে তিনি ছয় মাসের অধিক কোন স্থানে বাস করিতেন না। সুমেরু পর্ব্বতের নিকট গিয়া দেখি-লেন যে, সে সকল বৃক্ষগুলিকেই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, আমিও এইরূপ অনাদি ধর্ম্মতে জগতের সকল লোককে ধারণ করিব,—আমার হৃদয়ে সকলকেই রাখিব। এইরূপে তিনি সমুদ্রের নিকট হইতে গম্ভী-রতা, সর্পের নিকট সঞ্চরণশীলতা, বায়ুর নিকট স্বাধীন ও প্রযুক্তভাব এবং আকাশের নিকট হইতে উদাস ভাব ইত্যাদি প্রাকৃতিক নানা পদার্থ হইতে নানাপ্রকার মনোরম ভাব শিক্ষা করিলেন। এইরূপে সেই অলখ্ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক সন্ন্যাসীপুরুষ বিশ্ব-শাস্ত্রের নিকট হইতে বিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর

তিনি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া জগতের সর্ব্বত্রেই অসত্যের প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়া হিমালয়ে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সংসার করি পর্য্যটন, অসত্য দেখি ত্রিভুবন।
এবে উত্তর পথে যাও, হিমালয় গিরিরেতু রহ॥

এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি হিমালয়ে গমন করিয়া স্তম্ভের ন্যায় স্থির ও প্রশান্ত ভাবে বহুকাল তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তৎপরে ভগবান তাঁহার প্রগাঢ় তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিতে আসেন। তখন তিনি অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিয়া বলিলেন যে "আমাকে এই বর দেন—আমি যেন অন্তিমকালে অভয়পুরে সেই অনাদিদেবের নিকট গমন করিতে পারি।" ভগবান তাঁহাকে প্রার্থিত বরপ্রদান করিয়া প্রস্থান করিলে পর তিনি জগতের নিকট অনাদিধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত হিমালয় হইতে অবতরণ করিলেন। তথা হইতে তিনি পুরুষোত্তমে আগমন করেন এবং এখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। পুরুষোত্তমে অবস্থিতিকালে বৈষ্ণবদিগের সহিত তাঁহার অনেক তর্কবিতর্ক হয়। তৎপরে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি খণ্ডগিরি নামক সুরম্য পর্ব্বতে গমন করেন এবং সেই স্থানে দীর্ঘকাল যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময় গোবিন্দ দাস নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে এই ব্যক্তিকেই মহিমাবাবাজীর প্রথম শিষ্য বলিয়া বোধ হয়। গোবিন্দদাসের পর কানাইদাস, দীনবন্ধুদাস, নারায়ণদাস প্রভৃতি ব্যক্তিরা উত্তরোত্তর তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সকল ব্যক্তিরা বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট মহিমাধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। এইরূপে খণ্ডগিরি পর্ব্বতে অবস্থানকালে, সাতজন লোক তাঁহার প্রচারিত এই নবধর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তৈলঙ্গদেশে যাত্রা করেন। তথায় যদুনাথ সিংহ নামক জনৈক রাজা তাঁহার নিকট অলখ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এইরূপে দিন দিন লোকদিগকে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া তিনি গোবিন্দদাসকে বলিলেন যে, হয় তুমি সমাধিতে প্রবৃত্ত হও, আমি প্রচারে যাই; নয় আমি সমাধিতে নিমগ্ন হই, তুমি প্রচারার্থ বহির্গত হও। এই কথা শ্রবণ করিয়া গোবিন্দদাস সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। মহিমাবাবাজী তখন অনাদি অলখ-ধর্ম্মের জ্যোতি বিস্তার করিতে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (১৮শ)

শচীমাতার স্বপ্ন।

শ্রীবাসের বাড়ীতে নিত্যানন্দের বাসা, নিতাই বাল্যভাবে বিভোর; এখন আর নিজ হাতে ভাত খান না; মালিনীদেবী শিশুর মত ভাত খাওয়াইয়া দেন।

'আপনি তুলিয়া হস্তে ভাত নাহি খায়;
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়।'

প্রতিবাসী বালকদিগের সঙ্গে মিশিয়া নিতাইয়ের খেলা; নগরে নগরে ধূলা খেলা, গঙ্গাস্রোতে ডুব সাঁতার, চিৎসাঁতার প্রভৃতি নানাবিধ জলক্রীড়া এবং ভাত খাওয়ার সময় অর্দ্ধেক অন্ন সমস্ত অঙ্গে মাখিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া ফেলান প্রভৃতি ক্রীড়ায় তিনি খুব মজবুত হইয়া উঠিলেন। থাকিয়া থাকিয়া নিতাই এক দৌড়ে বিশ্বম্ভরের বাড়ী যান, শচীমাতাকে মা বলিয়া ডাকেন, বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে কত হাস্য পরিহাস করেন। আর শচীমাতাকে দেখিলেই তাঁহার চরণ-ধূলি লইতে যান। উদাসীন সন্ন্যাসীচরণ স্পর্শ করিলে অপরাধ জন্মিবে ভয়ে শচীদেবী নিতাইকে দেখিলেই পলাইয়া যান;—

"বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ
ধরি বারে যান্; আই করে পলায়ন।"

তথাপি নিতাইয়ের বাল্যসরলতায় শচীর মন স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া গেল; এবং নিতাইকে আপন প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানে ভালবাসিতে লাগিলেন। এক দিন শচী দেবী বিশ্বম্ভরকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ নিমাই! আমি গত রজনীতে বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি; তুমি আর নিত্যানন্দ যেন আমার দেবালয়ে প্রবেশ করিলে ও পাঁচবছরের ছেলে হইয়া যেন সিংহাসনস্থিত কৃষ্ণ বলরাম শ্রীবিগ্রহ লইয়া বাহির হইয়া এলে; তোমার হাতে বলরাম ও নিতাইয়ের হাতে কৃষ্ণ। তাহার পর চারি জনে যেন মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হইলে। রামকৃষ্ণ ঠাকুর ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাদের দুই জনকে তিরস্কার করিয়া যেন বলিতে লাগিলেন;—

"কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই? বাহির্ হও গিয়া।
এবাড়ী এঘর সব আমা দোঁহাকার;
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার।"

তাহাতে নিতাই যেন বলিয়া উঠিলেন;—
নিত্যানন্দ বলয়ে সে কাল গেল বয়ে;
যে কালে খাইলে দধি নবনী লুঠিয়ে।
ঘুচিল গোয়াল, হৈল বিপ্র অধিকার;
আপনা চিনিয়া সব ছাড় উপহার।
প্রীতে যদি না ছাড়িবা খাইবা মারণ;
লুঠিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন?"

তাহাতে রামকৃষ্ণ যেন আরও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন যেন, "কৃষ্ণের দোহাই! তোদের দুজনকে আজ্ মারিয়া তাড়াইয়া দিব।" নিতাই পুনর্ব্বার উত্তর করিলেন "তোর কৃষ্ণকে কে ভয় করে? বিশ্বম্ভর গৌরচন্দ্র আমার প্রভু।" ইহার পর যেন তোমাদের চারি জনের মধ্যে মারামারি ও নৈবেদ্য কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল।

"কাহারও হাতের কেহ কাড়ি লই যায়;
কাহারও মুখের কেহ মুখ দিয়া খায়।"

আর নিত্যানন্দ যেন আমাকে বলিলেন 'মা! বড় ক্ষুধা হয়েছে, আমাকে

অন্ন দাও।" এই বলিয়া সরলহৃদয়া শচী পুত্রকে বলিলেন,—"বৎস! এ স্বপ্নের অভিপ্রায় কি! আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই; তুমি আমাকে উহা বুঝাইয়া দাও।"

বিশ্বম্ভর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "মা! আমার বোধ হইতেছে আপনি খুব সুস্বপ্ন দেখিয়াছেন; ইহা আর কাহাকেও বলিবেন না। আমাদের বাড়ীর মূর্ত্তি বড় প্রত্যক্ষ দেবতা; আমিও নৈবেদ্যাদি করিয়া রাখি ও পরক্ষণে আসিয়া দেখি তাহা আধাআধি হইয়া আছে; এত দিন মনে মনে ভাবিতাম, এ সব কি হয়। এই বলিয়া রসিক চূড়ামণি বিশ্বম্ভর মধুর হাসি হাসিয়া ও বধূর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'মা! সত্য সত্য এত দিন আমার তোমার বধূর উপর সন্দেহ ছিল; আজ তাহা দূর হইল।'—

"মুই দেখি বারবার নৈবেদ্যসব যে;
আধাআধি না থাকে,না কহোঁ কারে লাজে
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল;
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল।"

বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু অন্তরে ছিলেন; স্বামীর ভালবাসা মাখান পরিহাস শুনিয়া সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কোন্ স্ত্রীই বা না হয়?

"হাঁসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে;
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্নকথা শুনে।"

নিমাই! আমরা জানিতাম, তুমি গার্হস্থ্য প্রেম জান না, কেবল বিভুপ্রেমে ভোর। আজ্ আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। অথবা যাঁহার প্রাণে হরি প্রেম পরিপূর্ণ; তিনি দাম্পত্য প্রেম জানেন না? এতো হইতেই পারে না। হরি প্রেম তো আর একাঙ্গ নয়, উহা যে পূর্ণাঙ্গ। গার্হস্থ্য প্রেম বল, দাম্পত্য প্রেম বল সকলই সেই বিশ্বপ্রেমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা। যাহা হউক, বিশ্বম্ভর জননীকে বলিলেন,—মা! নিতাই স্বপ্নে আপনার নিকট অন্ন ভিক্ষা করিয়াছেন; আমার বিবেচনায় তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্বপ্ন সফল করা উচিত। শচীমাতা পুত্রের কথায় সম্মত হইয়া নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য পুত্রকে বলিয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর মহা হৃষ্ট চিত্তে শ্রীবাসের বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনে বসিয়া ভাত ছড়ান নিতাইয়ের রোগ, বিশ্বম্ভর তাহা জানিতেন। সুতরাং নিতাইকে সাবধান হইতে সতর্ক করিয়া দিলেন। নিত্যানন্দ মহা বিজ্ঞের ন্যায় কর্ণে হস্ত দিয়া বিষ্ণু বিষ্ণু বলিয়া উত্তর করিলেন "আমি কি পাগল যে ভাত ছড়াইব, তুমি বুঝি আমাকে আপনার ন্যায় মনে কর।"

"আমার বাটীতে আজ্ গোঁসাইর ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবে, করাইল শিক্ষা॥
কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ বিষ্ণু বিষ্ণু বলে,
চঞ্চলতা করে যত পাগল সকলে।
এ বুঝি যে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল;
আপনার মত তুমি দেখহ সকল।"

গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও গদাধর প্রভৃতি আত্মীয়গণ লইয়া নিজগৃহে ভোজন করিতে বসিয়াছেন; শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছেন। গৌরের নিষেধ স্বত্বেও নিতাই থাকিয়া থাকিয়া নিজপাতের উচ্ছিষ্ট লইয়া বালকের ন্যায় চারি দিকে ছুঁড়িতেছেন। বন্ধুগণ মানা করিলে কত মত রঙ্গ ভঙ্গি করিতেছেন। শচী দেবী রন্ধনশালা হইতে একবার অন্ন দিতে আসিয়া হঠাৎ পর্য্যঙ্কের

দিকে তাকাইয়া দেখিয়া অন্নের থালি সহিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। হস্তস্থিত অন্ন চারিদিকে ছিটাইয়া গেল; ভোক্তাগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। বিশ্বম্ভর আস্তে ব্যস্তে উচ্ছিষ্ট হাত ধুইয়া জননীকে তুলিয়া ক্রোড়ে লইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ও শচী দেবী কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন;—

"উঠ উঠ মাতা স্থির কর চিত;
কেন বা পড়িলে পৃথিবীতে আচম্বিত।"

শচীদেবী চেতনা লাভ করিয়া অনেক ক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না; গৃহ মধ্যে গিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে ও দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন,—"বাছা! আমি ভাত দিব মনে করিয়া ভোজন স্থানে আসিয়া দেখি যেন তুমি কৃষ্ণবর্ণ ও নিতাই শুক্লবর্ণ দুইটী পঞ্চম বর্ষীয় বালক চতুর্ভুজ হইয়া ভোজন করিতেছ; উভয়েই দিগম্বর এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল, মুষলধারী। আর আমার বউ যেন বাপ তোর হৃদয়ে শোভা পাইতেছেন। নিমাই! বল দেখি কেন আমি এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম?"

বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন 'মা! রাত্রের সেই স্বপ্নের ভাব মনে ছিল। তাই ঐরূপ বোধ হইয়াছে। ও কিছু নয়।'

নিশা-কীর্ত্তন।

এক দিন সম্মিলিত বৈষ্ণব সভায় গৌরচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন;—

"প্রভু বলে ভাই সব! শুন মন্ত্রসার;
রাত্রি কেন মিথ্যা যায় আমরা সবার।
আজি হৈতে নির্ব্বন্ধিত করহ সকল;
নিশায়ে করিব সবে কীর্ত্তন মঙ্গল।
সংকীর্ত্তন করিয়া সকলগণ সনে;
ভক্তি স্বরূপিনী গঙ্গা করিব মজ্জনে।
জগৎ উদ্ধার হয় শুনি কৃষ্ণ নাম;
পরমার্থে তোমরা সবার ধন প্রাণ।"

এই কথা শুনিয়া ভক্ত দল মহা আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে নিশাকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এতদিন কেবল শ্রীবাসের গৃহেই কীর্ত্তন হইত, এখন হইতে অন্য অন্য স্থানেও হইতে লাগিল। কোন কোন দিন চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে, কোন দিন বা বিশ্বম্ভরের বহির্বাটীতে হইত; কিন্তু শ্রীবাসমন্দিরই সর্ব্ব প্রধান স্থান রহিয়া গেল।—

"শ্রীবাসমন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন;
কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন।"

এখন হইতে কীর্ত্তনের প্রকৃতিও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইল। এতদিন সকলে মিলিয়া একত্রে কীর্ত্তন হইত। এক্ষণে পৃথক পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে অথবা একসময়ে এক বাড়ীতেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল; শ্রীবাস পণ্ডিতের এক দল, মুকুন্দ দত্তের দ্বিতীয়, গোবিন্দ দত্তের তৃতীয়, এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ দল গঠিত হইতে লাগিল। একাদশী রজনীর হরিবাসরে কিছু অধিক ধুম হইত;—

"শ্রীহরিবাসরে হরি কীর্ত্তন বিধান;
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ।
পুন্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ;
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ।
উষাকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর,
যুথ যুথ হৈল সব গায়ন সুন্দর।

শ্রীবাস পণ্ডিত হয় এক সম্প্রদায়,
মুকুন্দ লইয়া আর জনকত গায়।
লইয়া গোবিন্দ দত্ত আরো কত জন;
গৌরচন্দ্র নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন।"

কীর্ত্তনের পদগুলিও এখন হইতে কিছু লম্বা লম্বা হইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ চল্লিশপদী কীর্ত্তনের উৎপত্তি এই সময়ে। আর নৃত্যের ভাষাটাও কিছু অধিক মাত্রায় চড়িয়া গেল। এই সময়ের সংকীর্ত্তনের প্রগাঢ়তা, গাম্ভীর্য্য, মত্ততা ও মাধুর্য্য এতই জমাট বাঁধিয়া যাইত যে, বাহিরের লোকেরও তাহাতে গভীর ভাবাবেশ না হইয়া পারিত না। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এই বর্ণনা লিখিতে লিখিতে এতই আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি আক্ষেপ করিয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, "পাপ জন্ম হইলত কেন সেই সময়ে হইল না। তাহা হইলে তো সংকীর্ত্তনানন্দে পাপ ধুইয়া যাইত।"

"হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম তখন না হৈল;
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল।"

এইরূপ নিশাকীর্ত্তন এক সম্বৎসর কাল হইতে লাগিল;—

"বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল;
চৈতন্য-আনন্দে সব কিছু না জানিল।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এখন হইতে নৃত্যের ছাগটা কিছু অধিক মাত্রায় হইতে লাগিল। গৌরকে নাচাইবার উদ্দেশে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ নিজেও এক জন কম নয়; কতকগুলি তৃণ দিয়া আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করত বিকট বেশে যখন কটী দোলাইয়া নাচিতেন, তাহা দেখিয়া ভক্তগণে হাসি সম্বরণ করিতে পারিতেন না;—

"তৃণ করে তখনে অদ্বৈত উপনীত,
আপাদ মস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া;
নিজ শিরে থুই নাচে ভ্রুকুটী করিয়া।
অদ্বৈতের রঙ্গ দেখি সবার তরাস;
নিত্যানন্দ গদাধর দুই জনে হাস।"

গৌরের নৃত্য, কীর্ত্তন, ভাব, আনন্দ সকলই অদ্ভুত। পাঠক মহাশয় জানেন যে, তাঁহার হৃদয় ভাবময়। যখন যে ভাব-জাগরূক হইত; তাহার অবধি না হইয়া যাইত না। নর্ত্তনাবেশে বিবিধ ভাব লহরী প্রকটিত হইতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে কখন কখন বন্ধুগণের স্কন্ধে উঠিয়া অঙ্গন মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন, কখন বা বালকের ন্যায় চঞ্চলতা প্রকাশ করেন; পা নাচাইতে নাচাইতে কখন খল খল করিয়া হাসিতে থাকেন, কখন বা ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া কতমত রঙ্গভঙ্গ করেন; আবার কখন বন্ধুদিগের চরণ ধরিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন। এমন আশ্চর্য্য ভাবাবেশ কেহ কখন দেখে নাই। আধ্যাত্মিক রাজ্যে কত নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহা কে জানে? স্থূল জগতে বাস করিয়া স্থূলের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে আমরা সূক্ষ্ম জগতের ভাব কেমন করিয়া বুঝিব? সে রাজ্যে না গেলে কে তাহার সম্বাদ আনিতে পারে? এখানে মানবের দর্শনশাস্ত্র পরাস্ত; পদার্থবিদ্যা গণিতবিদ্যারও ক্ষমতায় কুলায় না। প্রেমবিজ্ঞান সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, প্রেমিক না হইলে প্রেমতত্ত্বের তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কে জানে কি কারণে ক্ষণে ক্ষণে গৌরের দেহ ভুলায়;

ন্যায় লঘু হইত, আবার কখন লৌহাপেক্ষাও গুরু। এমন শীত ও কম্পন হয় যে, যেন বিকারের কম্প। আবার কখন সমস্ত শরীর অগ্নির ন্যায় উত্তাপযুক্ত, চন্দন পঙ্ক লেপিলে তখনই শুকাইয়া যায়। কখন আবার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে থাকে, যেন মহাশ্বাস রোগ জন্মিয়াছে। কখন কখন এমন হিক্কা হইত, যে তাহাতে সর্ব্ব অঙ্গ যেন ভাঙ্গিয়া যাইত। কখন সুন্দর গৌরবর্ণ নানারূপ রঙ্গ ধারণ করিত এবং কখন কখন দুই চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া চারি দিকে ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন এবং বন্ধুদিগের প্রতি অযোগ্য ভাষা প্রয়োগ করিতেন ;—

"অলৌকিক হঞাপ্রভু বৈষ্ণব আবেশে ;
যে বলিতে যোগ্য নয় তাহা প্রভু ভাষে।
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি প্রভু করি বলে ;
এ বেটা আমার দাস ধরে তার চুলে।
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণে ;
তার বক্ষে উঠি করে চরণ অর্পণে।"

ভাবুক না হইলে এসব ভাবতত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝা যায় না।

"ক্ষণে নিত্যানন্দ অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসে।
চরণ তুলিয়া সবাকারে চাহি হাসে॥
ভাবাবেশে একবার ধরে যার পায় ;
আর বার পুনঃ তার উঠয়ে মাথায়।
ক্ষণে যার গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন ;
ক্ষণেক তাহার কান্ধে করে আরোহণ।
চক্রাকৃতি হই কভু প্রহরেক ফিরে ;
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ শিরে।
যখন যে ভাব হয় সেই অদ্ভুত ;
নিজ প্রেমানন্দে নাচে জগন্নাথ সুত।"

বহির্মুখ লোকে ইহাকে পাগলামি ভিন্ন আর কি বলিবে ; কিন্তু এমন পাগল হওয়া তো সহজ নয়।

এই সময়ে এক দিন এক শৈব ভিক্ষুক বিশ্বম্ভরের বাটীতে ভিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিল। ভিক্ষুকের সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি ভস্মমাখা, শিরে জটা জুট ও হাতে শিঙ্গা ডমরু ; উহা বাজাইয়া সে শিব সঙ্গীত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। শঙ্কর গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বিশ্বম্ভরের ভাবময় হৃদয় ভাবে উথলিয়া উঠিল ; শঙ্কর ভাবাবেশে হুঙ্কার করিয়া 'আমি শিব' বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গ এক লম্ফে আগন্তুকের স্কন্ধে উঠিলেন। সে ব্যক্তিও তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া অঙ্গনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভক্তগণ নাকি সেই সময়ে গৌরকে সত্য সত্য জটাজুটধারী শম্ভু মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন ;—

"একদিন আসি এক শিবের গায়ন ;
ডম্বুর বাজায় গায় শিবের কথন।
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে ;
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে।
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর ;
হুঙ্কার করিয়া বলে মুঞি সে শঙ্কর।
কেহ দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায় ;
বোল, বোল মহাপ্রভু বলয়ে সদায়।'

কিছু কাল পরে শচীনন্দন বাহ্য জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার স্কন্ধ হইতে নামিলেন এবং নিজ হাতে ভিক্ষুককে যথেষ্ট ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিলেন ;—

"বাহ্যপাই নামিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর ;
আপনি দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর।"

পাষণ্ডীদিগের ব্যবহার।

নিশাকীর্ত্তনের প্রগাঢ়তা, প্রমত্ততা ও ভাবুকতায় নবদ্বীপ টলমল করিতে লাগিল, গভীর রজনী যোগে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া

শ্রীবাস পণ্ডিতের বহিঃপ্রকোষ্ঠে খুব মত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইতেছে; বিশ্বাসী ভক্তগণের ব্যাকুলতা, প্রেমানুরাগ, ও উল্লাসময় কীর্ত্তনের ধ্বনিতে লোক সকল আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে পণ্ডিতের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইতেছে; কীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে; কিন্তু কীর্ত্তনের একটু জমাট বাঁধিয়া গেলেই গৌরের আদেশে কপাট রুদ্ধ হইয়াছিল, আর কেহ প্রবেশ করিতে পাইল না। লোকগুলি অগত্যা বাহিরে থাকিয়া কপাট ঠেলিতেছে; কলরব করিতেছে; কত নিন্দা কুৎসা করিতেছে ও কেহ কেহ নানা প্রকারে উৎপাত করিতেছে।

"পূর্ব্বে যেই সান্ধাইল বাড়ীর ভিতরে;
সেই মাত্র দেখে অন্যে প্রবেশিতে নারে।
প্রভুর আজ্ঞাতে দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার,
প্রবেশিতে নারে অন্য জন নদীয়ার।
ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া;
প্রবেশিতে নারে রহে দ্বারে দাঁড়াইয়া।
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে;
কীর্ত্তন দেখিব ঝাঁট ঘুচাহ দুয়ারে।"

এই সকল লোকের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক আছে; কতক লোক বাস্তবিক সরল প্রাণে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার জন্য আসিয়াছে; কতকগুলি আপনাদের কৌতুহল-স্পৃহা চরিতার্থের জন্য, আর কতকগুলি সংকীর্ত্তনবিদ্বেষী লোক কেবল ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও উৎপাত করিবার উদ্দেশে আসিয়াছে, নমুনা স্বরূপ দুই চারিটী পয়ার উদ্ধার করা যাইতেছে;—

"কেহ বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া,
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া।
কেহ বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল;
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল।
রাত্রিকরি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে;
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে।
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য নৈবেদ্য চন্দন;
খাই তা সবার সঙ্গে বিবিধ রমণ।
অন্য লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ;
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ।
চালি কলা মুদ্গ দধি একত্র করিয়া;
জাতি নাশ করিয়া খায় একত্র হইয়া।"

পাষণ্ডীদিগের উক্তিতে নিমায়ের উপর তত কোপ দেখা যায় না, যত তাঁহার সঙ্গীদিগের উপর দেখা যায়। তাহারা মনে করিত, নিমাই পণ্ডিত খুব ভাল লোক ছিল, কেবল কুসঙ্গে পড়িয়া মন্দ হইয়া গেল। একে একটু বায়ুরোগগ্রস্ত, তাহাতে আবার অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছে; সুতরাং পাঁচজন ঢঙ্গের দলে পড়িয়া মন্দ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? হায়! পাষণ্ডিগণ! তোমরা লোক চিনিতে পার নাই। যত নষ্টের ওস্তাদ ঐ নিমাই! সাবধান ও বড় সহজ পাগল নয়। ওইতো দলশুদ্ধ লোককে পাগল করিয়া তুলিল।

"কেহ বলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত;
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত?
কেহ বলে হেন বুঝি পূর্ব্ব অসংস্কার;
কেহ বলে সঙ্গদোষ হইল তাহার।
নিমাইর বাপ নাই, তাতে আছে বাই;
এত দিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাই।
কেহ বলে পাশরিল সব অধ্যয়ন;
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়া করণ।"

ক্রমে ক্রমে সিদ্ধান্ত হইল যে, নিমাই

পণ্ডিত বিদ্যেসাগ্নি ভুলে গিয়ে গণ্ড মূর্খের দলে পড়ে এখন একজন মহা গণ্ডমূর্খ হইয়াছে। আগন্তুকদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা সাব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, সংকীর্ত্তন করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ; দেশমধ্যে যত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হইতেছে, সে সব উহারই জন্য।

"যেনা ছিল রাজ্যদেশে আনিয়া কীর্ত্তন
দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন।
দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিহ নিশ্চয়;
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়।
কেহ বলে কালি হউ যাইব দিয়ানে;
কাঁকালি বাঁধিয়া সব নিব জনে জনে।'

কোন কোন পাষণ্ডী সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এগুলা নাচিতেছে গাইতেছে, ইহাদের মুখদর্শনে পাপ হয়। শরীর মধ্যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, আত্ম সাক্ষাৎকার লাভই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; তাহা না করিয়া বল দেখি চীৎকার করিলে কি হইবে? দ্বিতীয় পাষণ্ডী উত্তর করিল, তাইতো! নাচিলে গাইলে যদি ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে এই নবদ্বীপে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল রহিয়াছেন, তাঁহারা কি আর তাহা করিতেন না।

আর একজন বলিল, আরে ভাই! দেখিতেছো না, নিমাইকে লইয়া এগুলা পাগল হইয়াছে; পাগলের কথায় আমাদের কাজ কি?

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, আরে! আমরা কি আর সংকীর্ত্তন শুনিতে আসি; পাগল গুলা কি করে; তাই দেখিতে ও ঠাট্টা করিতে আসি।

উহাদের মধ্যে দুই একজন সুবুদ্ধি ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "কেন ভাই! পরনিন্দা করিতেছ, যাঁহারা সংকীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহারা ভগবানের নাম করিতেছেন, তাঁহারা পরম সুকৃতী, তাঁহাদের নিন্দা করিলে পাপ হইবে। আমাদের কপালে নাই, তাই এমন মধুর কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারিলাম না।

পাষণ্ডীদিগের মধ্যে যাহারা বড়ই উদ্ধত প্রকৃতির লোক ও কীর্ত্তন বিদ্বেষী ছিল, তাহারা শেষোক্তদিগের কথা শুনিয়া "ইহারাও তবে ঐ দলের লোক" এই বলিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

বিদ্বেষীদিগের বিদ্বেষের ও ক্রোধের প্রধান পাত্র শ্রীবাস পণ্ডিত। তাঁহাকে তাঁহারা ধানিয়াতি অর্থাৎ আন্ধাধারী শ্রীবাসা, বামনা, ঢাঙ্গাইত প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিত। তাহাদিগের মতে উহা হইতেই নবদ্বীপের কুশল নষ্ট হইল ও সকল লোক খারাপ হইয়া গেল; সুতরাং স্বতঃ পরতঃ তাঁহার নিন্দা কুৎসা ও অনিষ্ট করিতে ছাড়িত না।

"ধানিয়াতি শ্রীবাসা করে কালি কার্য্য,
কালিবা কি করে তায় অদ্বৈত আচার্য্য।
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত;
শ্রীবাসার ঘরে থাকি করে এতরূপ।
ছন্দার হইয়া আছে শ্রীবাসার বাড়ী;
দুর্গোৎসবে যেন সবে করে হুড়াহুড়ী।
হই, হই, হায়, হায়, এই মাত্র শুনি;
ইহা সবা হৈতে হৈল অপযশঃ বাণী।
শ্রীবাস বামনা এই নদীয়ার হৈতে;
ঘর ভাঙ্গি কালিনিয়া কেলাই মু স্রোতে।
এ বামুন ঘুচাইলে গ্রামের কুশল;
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবেক থল।"

পাষণ্ডীদিগের উৎপাতের একটী আখ্যায়িকা আছে। গোপাল চক্রবর্ত্তী ওরফে চাপাল গোপাল নামে তখন একজন যণ্ডা গোছের বামুন নবদ্বীপে বাস করিত। গভীর নিশায় ভক্তদল শ্রীবাসমন্দিরে আবিষ্টচিত্তে সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত আছেন; এমন সময়ে সে ব্যক্তি অন্য অন্য পাষণ্ডীদিগের পরামর্শানুসারে লুক্কায়িত ভাবে অঙ্গনে যাইয়া অঙ্গনের মধ্যস্থান লেপিয়া ভবানী পূজার দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়া দিল। কদলী পত্রের উপর জবাফুল, সিন্দুর রক্তচন্দন ও মদ্যভাণ্ড সাজাইয়া রাখিল। উদ্দেশ্য এই, লোকে জানুক যে, সংকীর্ত্তনের ভাণ করিয়া ইহারা রাত্রি যোগে পঞ্চকন্যা আনিয়া মদ্যপান করিয়া কি কুৎসিত কাণ্ড করিয়া থাকে। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, ভক্তগণের উপর পাষণ্ডীগণ যে যে দোষারোপ করিতেছিল, তাহার মধ্যে রাত্রিতে বেশ্যা লইয়া মদ্য পান করা একটী প্রধান কার্য্য। তাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই কুৎসিত কাণ্ডের অভিনয় করা হইল।

"একদিন বিপ্রনাথ গোপাল চাঁপাল
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল।
ভবানী পূজার সব সামগ্রী আনিল
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান নেপাইল।
কলারপাত উপরে থুইল ওড়ফুল;
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন তণ্ডুল।
মদ্য ভাণ্ড পাশে রাখি নিজ ঘরে গেল।"

প্রাতঃকালে শ্রীবাস পণ্ডিত বহিঃপ্রাঙ্গনে ঐ সব বস্তু দেখিয়া গ্রামের বিজ্ঞ ও সুবোধ লোকদিগকে ডাকিয়া দেখাইলেন ও পরিহাস করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন যে, মহাশয়গণ! দেখুন্ রজনী যোগে আমি কি সাধনা করিয়া থাকি। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী শ্রীবাসকে উত্তমরূপে জানিতেন; সুতরাং পাষণ্ডীদিগের কার্য্য বুঝিতে তাঁহাদের বাকী থাকিল না। দুই চারি দিন মধ্যেই চাপাল গোপালকে ঐ কার্য্যের নায়ক বলিয়া সকলে জানিতে পারিলেন। কথিত আছে যে, অল্প দিন মধ্যে চাপাল গোপাল নিজ কার্য্যের সমুচিত দণ্ড স্বরূপ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইল।

এক সরল জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ আর এক রজনীতে কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়া বহির্দ্বার বদ্ধ থাকায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া নিরাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। পর দিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানে যাইয়া সে বিশ্বম্ভরের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিতে লাগিল, "দেখ নিমাই! আমি কাল রাত্রিতে তোমাদের কীর্ত্তন শুনিতে গিয়া দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি; ইহাতে আমার বড়ই মনঃকষ্ট হইয়াছে।" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল যে, "আমাকে যেমন তুমি মনঃপীড়া দিয়াছ, আমি শাপ দিতেছি, তুমিও তেমনি সংসারে সুখী হইতে পারিবে না।"

"শাপিব তোমারে আমি পেয়েছি মনোদুখ।
পৈতা ছিঁড়িয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ।
সংসার সুখ তোমার হউক বিনাশ।"

শাপ শুনিয়া বিশ্বম্ভরের উল্লাসের সীমা নাই। মনে মনে করিতে লাগিলেন 'আমি ঐরূপ শাপই চাই।' ও বাহিরে একটু হাসিয়া ব্রাহ্মণকে শান্তনা করত ভক্তদলের নিকট আসিয়া অভিশাপ বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

প্রতিজ্ঞার বল।

মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন হয়। দুই ঘন্টা পূর্ব্বের মানুষ—আর দুই ঘন্টা পরের মানুষ প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ নূতন। শরীরগত বা অবয়বগত পরিবর্ত্তন কিছু ধীরে ধীরে হয় সত্য, কিন্তু চিকিৎসা-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর মানুষের শোণিতমাংস-ঘটিত অবয়ব—সম্পূর্ণ নূতন হয়। চক্রের পর চক্র—ক্রমাগত পরিবর্ত্তনচক্র ঘুরিতেছে। ঘটনার পর ঘটনা, অবস্থার পর অবস্থা, সময়ের পর সময়। প্রতি নূতন ঘটনা, নূতন অবস্থা বা নূতন সময়—মানুষকে চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতনতর জগতের নূতন জীব করিয়া তুলিতেছে। মানুষের প্রকৃতি, আকৃতি—স্বভাব চরিত্র, ধর্ম্ম বা জ্ঞান—সব পরিবর্ত্তনের অধীন—সব পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু এ নিয়ম সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে। দুবৎসর বা দুমাস পূর্ব্বের সাধারণ মানুষকে যে আজও পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে চায়, তাহার ন্যায় ভ্রান্তজীব আর নাই! ঘটনার দাস মানুষ প্রতি ঘটনায় নূতনত্ব লাভ করিয়া নূতন ঘটনার সংঘর্ষণে আসিতেছে। পরিবর্ত্তন-চক্র অবিরাম ঘুরিতেছে। সাধারণ মানুষ ক্রমাগত অবস্থার পর নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী—ইতালী মহানগরে দুটী বালক সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে বাহির হইয়াছেন। দুটী বালক, দুই সহোদর। দুটীর প্রাণে প্রাণে মিল। বালকের খেলা, বালকের ভ্রমণ, বালকের হাসি, বালকের তামাসা চির-উপেক্ষিত! তাহাদের হাসিরও কেহ তত্ত্ব লয় না, ক্রন্দনেরও কেহ খোঁজ খবর লয় না। তাহাদের কথা-বার্ত্তা, আমোদ উল্লাস—তারই বা তত্ত্ব কে লয়? দুটী বালক গল্প করিতে করিতে কত সুখে, কত ভাবে পথ হাঁটিতেছে। জ্যেষ্ঠের মনের আশার কথা, জীবনের উন্নতি-স্বপ্নের কথা কনিষ্ঠ কত আগ্রহ সহকারে শুনিতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। উভয়ে একটু চমকিত হইলেন। জ্যেষ্ঠ এই সময়ে কি কারণে যেন হঠাৎ স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন। এখনি ফিরিয়া আসিব, বলিয়া কনিষ্ঠকে রাখিয়া গেলেন। ইটালীতে তখন বড়ই দস্যুর ভয়। সকল অধিবাসীই কোন না কোন দস্যুদলভুক্ত। মারামারী রক্তা-রক্তি—সর্ব্বদাই চলিত।* কি কুক্ষণে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে রাখিয়া গেলেন! কি কুক্ষণে দারুণ সন্ধ্যা চতুর্দ্দিক গ্রাস করিল! জ্যেষ্ঠ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, কনিষ্ঠের সর্ব্বশরীর রক্তময়—দস্যুর অস্ত্রাঘাতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। কি ভীষণ দৃশ্য! এক ঘন্টা পূর্ব্বে যে জীবিত ছিল, এখন সে আর এই পৃথিবীতে নাই! তার শরীরের মমতা পরিত্যাগ করিয়া শোণিত-প্রবাহ মৃত্তিকাকে সিক্ত করিয়া কি ভীষণ শোকবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে! জ্যেষ্ঠের প্রাণে দারুণ শোক-শেল বিঁধিল। আহা,! সেই সান্ধ্য সমীরে হত ভ্রাতার মৃত শরীরের সহিত জ্যেষ্ঠের আলিঙ্গন, সেই মলিন মুখ-চুম্বন, সেই নিরাশরোদন, সেই "বিচার প্রার্থনা"—ভবিষ্যতের কি যেন এক উজ্জ্বল ইতি-হাস অঙ্কিত করিল। মৃত ভ্রাতার নিস্তেজ শরীর আলিঙ্গন করিয়া জ্যেষ্ঠ কি যেন এক

* Decline and Fall of the Roman Empire by E. Gibbon; Edited by F. A. Guizot. Vol. II. Chap. LXX.

স্বর্গীয় শক্তি লাভ করিল।* জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সহিত মৃত! সেই পূর্ব্বের জ্যেষ্ঠ আর নাই! তাহার কোমল শরীর, কোমল হৃদয়, সেই মধুর স্নেহ, সেই দুর্ব্বল মন সব যেন কনিষ্ঠের সহিত কোন অতীত জগতের কাহিনীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে! মৃত ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া যিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন, তিনি ইটালীর ভাবী উদ্ধারকর্ত্তা রিয়েঞ্জি! অসামান্যই হউক বা সামান্যই হউক, এই একটী ঘটনা হইতে ইটালীর উদ্ধার কর্ত্তার জন্ম হইল।† কি এক প্রতিজ্ঞা, কি এক স্বর্গীয় অগ্নিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া, আর এক নূতন জ্যেষ্ঠ যেন মাথা তুলিলেন। ইটালী কম্পিত হইল,—ন্যায়ের রাজত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে, নিমিষের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় এই বার্ত্তা আকাশময় ছাইল! কি এক গভীর অগ্নিময় প্রতিজ্ঞায় বালকের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল!

এই ঘটনার বহুশতাব্দী পূর্ব্বের ভারতের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। মায়ার ছলনে ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্যধন সর্ব্বস্ব হারিয়াছেন। অবশেষে পঞ্চ পাণ্ডবের একমাত্র স্ত্রী সতীশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীরূপিনী দ্রৌপদীকেও হারিয়াছেন!

যুধিষ্ঠির মতিচ্ছন্ন, কৌরবগণের সর্ব্বনাশের দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কি কুক্ষণে কে জানে, দ্রৌপদীর বস্ত্রাহরণ করিতে দুর্য্যোধন আদেশ করিলেন। সভা মধ্যে কুললক্ষ্মীর সেই অবমাননা, সেই নির্যাতন, সেই লজ্জাহীন ঘৃনিত ব্যাপার—যাহা লিখিতেও কষ্ট হয়, কি এক ভাবী মঙ্গলের বীজ রোপণ করিল। মহাপরাক্রান্ত মহাবীর ভীম সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "রণমধ্যে দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণ করিয়া রক্ত পান করিয়া ইহার প্রতিশোধ তুলিব।"* সভা কম্পিত হইল, কুরুকুলের শোণিত নিস্তেজ হইল, এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার বলে ভারত যেন শিহরিয়া উঠিল। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের দিকে সমস্ত রাজন্যবর্গ যেন আহুত হইলেন; কি যেন এক ভীষণবার্ত্তা নিমেষের মধ্যে ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠায় শোণিতাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইল।

আর একটী চিত্র দেখ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ যায় যায়। অষ্ট্রিয়ার দাসত্বে ইটালীর অতি শোচনীয় অবস্থা। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের স্বেচ্ছা-শাসন-লীলার কেন্দ্রস্থল হইয়া ইটালীর মুখ মলিন,—পরিধেয় জীর্ণশীর্ণ। এই দুঃখ দুর্দ্দিনে এক আলো প্রজ্জ্বলিত হইল। ম্যাটসিনী যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, মুখ মলিন, পরিধেয় বস্ত্র মলিন, কি যে এক সর্ব্বসংহারক দুঃখ-কালিমা সর্ব্ব শরীর ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এই সময়ে তিনি কার্ব্বোনারি সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন, প্রতারণা, ছলনা, প্রাণিহত্যা—তাহাদের লক্ষ্য, তখন তাহার শরীরে যেন কি এক বৈদ্যুলিক আলো জ্বলিল। প্রতারকদিগের ছলনায় তিনি যখন নির্ব্বাসিত

* Gibbon's Fall of the Roman Empire, Edited by F. A. Guizot, Vol. II. P. 600.

† "Will they not give us justice: Time shall show." So saying he bent his head over the corpse, his lips muttered, as with some prayer or invocation, and then rising, his face was as pale as the dead beside him,—but it was no longer pale with grief.

From that bloody clay, and that inward prayer, cola di Rienzi rose a new being. With his young brother died his own youth. But for that event, the future liberator of Rome might have been but a dreamer, a scholar, a poet,—a man of thoughts, not deeds."

Lytton Bulwer.

*মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

হইলেন, তখন এই আগুন এক ভয়ানক প্রতিজ্ঞার আকার ধারণ করিল। প্রাণ মন সব অগ্নিময় হইয়া উঠিল! তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন :—

—"To dedicate myself wholly and for ever to the endeavour to constitute Italy one, free, independent &c.—&c.—

"Now and for ever

"This do I swear, invoking upon my head the wrath of God, the abhorrence of man, and the infamy of the perjurer if I ever betray the whole or a part of this my oath."

ইটালীর উদ্ধারের জন্য ম্যাটসিনী এই গভীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জীবন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার নিজের আর কিছু রহিল না, সর্ব্বস্ব দেশের হইল।* এই প্রতিজ্ঞার বলে ও তাঁহার স্বর্গীয় স্বার্থত্যাগের আদর্শে—ইটালীতে আবার একপ্রাণতার বিজয় ভেরী বাজিয়া উঠিল। ইটালী আবার স্বাধীনতার মুখ দেখিল।

ঘটনা মানুষের দাস, না মানুষ ঘটনার দাস? ইতিহাসে এ প্রশ্নের দুটী উত্তর পাওয়া যায়। ঘটনা হইতে কখনও মানুষের জন্ম, এবং মানুষ হইতে কখনও ঘটনার জন্ম। কখনও ঘটনা মানুষকে পরিবর্ত্তন করে, কখনও মানুষ ঘটনাকে রূপান্তরিত করিয়া পৃথিবীকে দারুণ ঝটিকাপূর্ণ দুর্দ্দিন হইতে উদ্ধার করে। উপরে যে কয়েকটী ঘটনার কথা উল্লিখিত হইল, ইহাতে দেখা গিয়াছে যে, ঘটনাই যেন মানুষকে জন্ম দিতেছে। কিন্তু জন্মের পর—দেখ ঐ রিয়েঞ্জি আর ঐ ভীম, আর ঐ ম্যাটসিনি কিরূপে হাতে ধরিয়া পৃথিবীর ঘটনাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতেছেন। সিংহের তনয় গভীর গর্জ্জনে যেন সমস্ত পৃথিবীকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন তাহাদের প্রতিজ্ঞার বলে এক তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিতেছে।*

আমরা দুটী সিদ্ধান্তে তবে উপনীত হইতেছি,—ঘটনা মানুষকে জন্ম দেয়; আর জন্মের পর মানুষ ঘটনাকে বা কার্য্যকে সৃজন করে। রিয়েঞ্জি বা ম্যাটসিনি ঘটনার দাসত্ব স্বীকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইটালীর আমূল সংস্কার বা আমূল পরিবর্ত্তন ইহাদের অগ্নিময় প্রতিজ্ঞার বলে সংঘটিত হইয়াছে। ঘটনাও মানুষকে চালায়, সময়ে মানুষও ঘটনাকে চালায়। অনন্ত পরিবর্ত্তন চক্র ঘুরিতেছে, মানুষ কখনও ঘটনাকে ঠেলিতেছে, কখনও বা ঘটনা মানুষকে ঠেলিতেছে। মূলে কি যেন এক অব্যক্ত অবিনাশী শক্তি তড়িত বেগে ক্রীড়া করিতেছে!

এই অবিনাশী শক্তি—প্রতিজ্ঞার বল। মানুষ কি কখনও মানুষ হইতে পারিত, এই প্রতিজ্ঞার বল ভিন্ন?—না, কখনই নয়। ধৈর্য্য বল, আর অধ্যবসায় বল, ধর্ম্ম বল বা চরিত্র বল, সুখ বল বা শান্তি বল—সব এই প্রতিজ্ঞার আয়ত্তাধীন। রিপুর

* Joseph Mazzini, A memoir by E. A. V. Chap. II.

* "Although Mazzini's love of his native land was like a fire in his bones, and her pressing needs largely absorbed his thoughts and energies, yet her political enfranchisement, based upon intelligence and virtue, was with him but the prelude to the deliverance of all Europe. In him there was not discoverable one spark of self-inflation, one atom of worldly ambition, one symptom of narrowness towards any people".
William Lloyd Garrison.

উত্তেজনায় বিলাসিতার দুর্জ্জয় সংগ্রামে পরাজিত হইব ?—ছি, না তা হইবে না, এই বলিয়া যখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন বিলাস সুখ এবং পাপ প্রলোভন ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিল। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে মারপিশূনকে পরাজয় করিবার জন্য নিরঞ্জনা তটে যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তুমি আমি কি তাহা পারি ? গভীর প্রতিজ্ঞা—হয় জীবকে জরা মরণের অতীত করিব, নয় মরিব। এই প্রতিজ্ঞার বলে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কত কত মহাত্মা যে এইরূপ জীবনকে স্বীয় প্রতিজ্ঞার বলে তৃণের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার অন্ত নাই। প্রতিজ্ঞাই সঞ্জীবনী শক্তি। এই শক্তি বিহনে মানুষ মৃত, অসার, জড়ের ন্যায় নিস্পন্দ। প্রতিজ্ঞার অটলত্ব ভিন্ন মানুষ মানুষ হয় না ; মানুষ অমরত্ব লাভে অধিকারী হয় না। প্রতিজ্ঞাই সঞ্জীবনীশক্তি।

একজন মহাত্মা বলিয়াছিলেন ;—"পৃথিবীকে নিমেষের মধ্যে আপন অধীনে আনিতে পারি, যদি মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারি।" মনকে বাঁধিতে না পারিলে, ইচ্ছার অধীন করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু হয় না। যাহার মন আপন বশে নয়, সে একবার হাসে, একবার কাঁদে, একবার জাগে, একবার ঘুমায় ;—সে একবার মাতে একবার মরে। আর যাহার মন বশে আছে—সে জিতেন্দ্রিয়, সে না পারে এমন কার্য্য নাই। ঘটনার আঘাতে সে মরিবে, ঘটনা তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবে? ঘটনা তার নিকট তৃণের ন্যায়; তার ফুৎকারে ঘটনা তড়িত্‌বেগে উড়িয়া যায়। মন যার বশে,ঘটনা তার নিকট কিছুই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না। যদি তাহা পারিত, পৃথিবীর কোন মহাত্মা পৃথিবীকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতেন না ! প্রকৃত মহাপুরুষ তাঁহারা, যাঁহারা ঘটনায় আত্মসমর্পণ করেন না, স্রোতের শৈবালের ন্যায় একবার পূর্ব্বে আবার পশ্চিমে নীয়মান হন না ;—যাঁহারা অটল ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। সুখ ঐশ্বর্য্য,—তুচ্ছ কথা। বিপদ আন্দোলন—মৃত্যু কারাবাস—তাহাও তুচ্ছ কথা। ম্যাট্‌সিনির পিতা মনে করিয়াছিলেন, অনাহার ও কারাবাসের কষ্টে ম্যাট্‌সিনির মন পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং সময়ে ম্যাট্‌সিনি রাজার নিকট ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু কি অসার আশার কুহক ! মরণের ভয় দেখাইলে খ্রীষ্টের মতি ফিরিবে, ইহা মনে করিয়া ইহুদী জাতি কি মহাভুল করিয়াছিল ! নির্ব্বাসনের কষ্টে ভীমের প্রতিজ্ঞার মূল ছিন্ন হইবে, মনে করিয়া কুরুবংশ কি মায়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিল ! মৃত্যু, কারাবাস ; নির্য্যাতন—দুঃখ, সুখ, বিলাস,—যশমান, প্রকৃত মনস্বী ব্যক্তির নিকট এ সকল কোন গণনার কথা নয়। শত বৎসরের শত ঘটনা আন—শত শত অত্যাচর রাশীকৃত কর,—মনোরাজ্যের রাজা কিছুতেই টলিবার নন। তাঁহাদের লক্ষ্য আর কিছুই নয়, কেবল প্রতিজ্ঞা, কেবল লক্ষ্য-সিদ্ধি। ভ্রাতার মৃত্যুর কথা আর সকলেই সময়ে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রিয়েঞ্জি ভুলেন নাই। শত কষ্ট দুঃখে, শত নিরাশয়, শত বন্ধুর উপদেশেও ম্যাটসিনী আপন ব্রত পরি-

ত্যাগ করেন নাই। ঘটনা বালককে পরিবর্ত্তন করে, করিতে পারে। ঘটনা—অস্থিরমতির আসন টলাইতে পারে বটে। অত্যাচার আন্দোলন ছিন্নমতির পা কাঁপাইতে পারে বটে। কিন্তু যে প্রতিজ্ঞাবলে আপন মনোরাজ্যে বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে—তার নিকট পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা—সমস্ত আন্দোলন—অতি তুচ্ছ কথা। সে ব্যক্তি যে অপরিবর্ত্তিত, সেই অপরিবর্ত্তিত চিরকাল—আবহমান কাল। প্রতিজ্ঞার বলে চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন আগুন বর্ষণ হইতে থাকে। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কথাই বল, বা ইটালীর চতুর্দ্দশ শতাব্দী বা উনবিংশ শতাব্দীর ন্যায়ের রাজ্য বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথাই বল, ও সকলই প্রতিজ্ঞারূপ মহাযজ্ঞের ফল!

মনোরাজ্যে যে রাজা নয়, সে মানুষই নয়। সে একরূপ পশুকুলের মধ্যে গণ্য। সে রিপুর অধীন, সে বিলাসের দাস, সে প্রলোভনের ক্রীড়াপুত্তলি, সে যশপ্রশংসার ক্ষণ-নর্ত্তক! প্রশংসার দুই তুড়ি দেও, সে অমনি হাসিয়া উঠিবে, একটু সম্মান প্রতিপত্তির আশা-বাঁশি বাজাও, সে তোমার যত বিরোধীই হউক না কেন, সে অমনি মাথা নোয়াইয়া তোমার পায়ে পড়িবে। দুটী সুন্দরী রমণী লইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াও, সে অমনি আড় নয়নে চাহিয়া, আপনার চরিত্রের বিনিময়ে ক্ষণসুখ কিনিতে ব্যস্ত হইবে। আমাদেরও অবস্থা তাহাই। আমরা ঘটনার দাস। এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য—এত অর্থাভাব—তবুও আমরা হাসিতে ছাড়ি না। এত ইংরাজের অত্যাচার—এত পীড়ন—নিমিষে একটু সম্মান দিলে অমনি ভুলিয়া ইংরাজের পায়ে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। দুই বাহু তুলিয়া নাচি। আমাদের না আছে চরিত্র, না আছে প্রতিজ্ঞার বল; না আছে ধর্ম্ম, না আছে জীবন। কি আছে? ঘটনার উপর ঘনার আঘাতে উঠিতে এবং বসিতে একদল হুজুগপ্রিয় লোক এই ভারতক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে! অধ্যবসায়হীন, বলবুদ্ধিহীন, বিদ্যাসম্পদবিহীন, চরিত্র ধর্ম্মবিহীন একদল হুজুগপ্রিয় ন-পশু-ন-মানুষ এখন সঘন মুহু মুহু বিচরণ করিতেছে! কেন ভারতের এই অবস্থা? এত হিতৈষী থাকিতেও কেন এত দুর্দ্দশা? এত লোক থাকিতেও কেন এত অস্থিরতা? এ কথার একমাত্র উত্তর, মানুষ আছে বটে, কিন্তু মনোরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, এমন রাজা নাই। এমন লোক নাই, যে আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কঠোর সাধনার পর মহা প্রতিজ্ঞারূপ অটল ভিত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত—যে লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য অনলে ঝাঁপ দিয়াও মরিতে পারে। প্রতিজ্ঞায় অটল যে নয়—সে ঘটনার দাস। ভারত প্রতিজ্ঞামন্ত্রহীন জড়-ভরত, তাই এত দুর্দ্দশা! কেবল আমোদ, কেবল হুজুগ—কেবল বিলাস, কেবল পোষাক পরিচ্ছদের বাহ্য চটক! একটু আগুনেরও পরিচয় পাওয়া যায় না! কি দুর্দ্দিন!

এত হাসি, এত আন্দোলন, এত আস্ফালন কিসের?—এত নৃত্য, এত বাদ্য, এত কোলাহল, এত বেশভূষা কিসের?—ভারতের আজ বড় মলিন বেশ, অথচ তোমরা এত হাসিতেছ কেন বলত?—যদি ম্যাটসিনি বা রিয়েঞ্জি, পার্কার বা গ্যারিবল্‌ডি প্রদেশে জন্মিত, তবে আজ তাহারা গভীর দুঃখের কালিমা পরিধান

করিয়া নির্জ্জনে কাঁদিতে বসিতেন! সেই ক্রন্দনের ভিতর হইতে তাঁহারা নবজন্ম লাভ করিয়া তবে জগতে সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেন! আর আমরা? কেবল নাচি, কেবল হাসি! কেবল বক্তৃতা করি, কেবল বিলাস-পোষাক পরিয়া যশমান ও স্বার্থ অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ভিখারীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াই! হা ধর্ম্ম, হা দেশ-হিতৈষিতা, হা কর্ত্তব্য-বোধ!!

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে এত ঘটনা ঘটিল, কিন্তু একটাও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মহাবীর এই ভারতে জন্মিল না। ঘটনায় দাসত্ব করিতেই ভারতবাসীর জীবন গেল, ঘটনা আর ভারতবাসীর দাসত্ব স্বীকার করিল না। তৃণের জীব তৃণ লইয়াই রহিল, স্বাধীনতর মুখ আর দেখিল না! যে আপন মনোরাজ্যে স্বাধীন নয়—সে কিরূপে স্বাধীনতা পাইবে? তাই কোটী ২ ঘটনা, কোটী ২ অবস্থা ভারতবাসীকে উলটি পালটি কত রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল, একবার দেখ। শিশু বালক হয়, বালক যুবক হয়, যুবক বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধ মরে। যেটী জন্মে, সেটীই মরে! কি দুঃখ, এদেশে একটীও অমর জীব জন্মিল না! একটীও অগ্নিময় নব উদ্যমপূর্ণ যুবক মস্তক তুলিল না। যেটী উঠিল, সেইটীই মরিল। যেটী মাতিল, সেইটীই ডুবিল। একটীও এমন অক্ষয় অমর জীব জন্মিল না, যাঁর প্রতিজ্ঞাবলে শত শত ঘটনা নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়;—যাঁর প্রতিজ্ঞাবলে দেশের বায়ু আমূল পরিশুদ্ধ হয়। ভারতবাসি, একথাটী এই হুজুগ-প্রিয়তার দিনে একবার ভাব।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। (৮ম)

আমরা কার্ত্তিক মাসের সংখ্যায় সামাজিক নিয়মাদি থাকা যে একান্ত উচিত, তাহা একরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছি। পরস্পরের সহিত যে সকল কার্য্যে যোগাযোগ, অর্থাৎ যাহাতে পরস্পরের ইষ্টানিষ্ট ঘটে, সে সকল কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা একান্ত উচিত। ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য সামাজিক সময়োচিত নিয়মাবলী গঠন করা একান্ত প্রয়োজন।* নিয়মাবলী গঠনের সময় প্রাচীন এবং নূতন প্রথার দোষগুণ উভয়ই ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।+ বর্ত্তমান সময়ে বিবাহ বিষয়ক সমস্ত নিয়মাদি ধার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করা উচিত। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ প্রধানত এখন তিন ভাগে বিভক্ত। এক সমাজকে অন্য সমাজের দোষগুণের ফলভোগী হইতে হইতেছে যখন, এবং আদান প্রদান কার্য্য এই তিন সমাজের লোকের মধ্যেই চলিতেছে যখন, তখন এই তিন সমাজকেই বিবাহ বিষয়ক নিয়মাদি গঠনের জন্য একত্রিত হইতে হইবে। তিন সমা-

* Guizot's History of Civilization. Vol 1. Page 13 & 14.

\+ The study of Sociology by Herbert Spencer. Page 399.

জের মধ্য হইতে প্রবীণ, চিন্তাশীল, ধর্ম্মপিপাসু ও চরিত্রবান ব্যক্তি সকলকে লইয়া একটী সামাজিক-নিয়ম-গঠন-কমিটী নিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে যে সকল প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইবে, তাহা অবনত মস্তকে সকলকে পালন করিতে হইবে। আপন আপন দল বজায় রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিলে ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক অনিষ্ট হইবে। এই গুরুতর এবং অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহের সময় তিন সমাজ যদি একত্রিত হইতে না পারেন, তবে ব্রাহ্মসমাজকে, আজ হউক, কাল হউক পাপের ভয়ানক ভ্রূকুটীর নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে,—পাষণ্ডীদিগের আধিপত্যে সমাজ ছারখার যাইবে।

এই সকল কথা না বুঝিয়া অনেকে বলিতেছেন যে, "যাহারা দোষী, তাহাদিগের নাম প্রকাশ কর, তাহাদিগকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়!" এইরূপ কথা যাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধানত দুই শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী সরলপ্রাণ, তাঁহারা তত গোলমাল বুঝেন না, মনে করেন, নাম বলিয়া দিলেই সব গোল চুকে। আর এক শ্রেণী কিন্তু বিষম চক্রী। তাহারা দোষী ব্যক্তিদিগের নাম বাহির করিতে পারিলে লাইবেল আনিবার সুযোগ পায়। এই উভয় শ্রেণীর লোকদিগের প্রতি আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে, এই ব্যক্তিগত দোষের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা করা আইন-বিরুদ্ধ এবং আমাদের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ। সকল সমাজেই অপরাধী ব্যক্তি আছে এবং থাকিবে। সমাজ হইতে পাপ একেবারে নির্ম্মূল হইবে, কখনও আশা করা যায় না। এ পর্য্যন্ত কোন সমাজ পাপ-শূন্য বা পাপী-শূন্য হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজেও পাপ আছে, পাপী আছে। এটা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। এ স্বতঃসিদ্ধ কথা শুনিয়া খুব বিরক্ত হইলেই বা চলিবে কেন? প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই—কোথায় ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ, আর কোথায় আমরা অধঃপতিত! ব্রাহ্মসমাজের কলঙ্ক বা কালিমার কথা আমরা কীর্ত্তন করিতেছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহা কে না জানেন? তোমরা জান না, না যাঁহারা বাহিরের লোক, তাঁহারা জানেন না? মেকি টাকা পৃথিবীতে অধিক দিন চলে না। দু দশ দিন পরে তাহা ধরা পড়িবেই পড়িবে। ব্রাহ্মসমাজ এবং হিন্দুসমাজ, সকল সমাজেই পাপ আছে, এবং পাপী আছে। তাহা বাহির এবং ঘরের অনেক লোকেই জানে। না জানিলেও সময়ে জানিবে। ইহাতে ক্ষোভ বা দুঃখ কি? দুঃখ এই, এসম্বন্ধে সমাজ কথা বলেন না! সমাজ পাপকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দেন। হিন্দুসমাজ বেশী প্রশ্রয় দেন, কি ব্রাহ্মসমাজ বেশী প্রশ্রয় দেন, সে বিচার করিতে চাহি না। আমরা এই মাত্র জানি, হিন্দুসমাজও প্রশ্রয় দেন, ব্রাহ্মসমাজও দেন। হিন্দুসমাজ এখন বিশাল-বিস্তৃত, ইহা হইতে দোষ বা পাপ উন্মূলিত করা এখন সোজা কথা নয়। যখন প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের কথা, বেদ বেদান্তের আপ্তবাক্য পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইতেছে, তখন কে এমন আছেন, যাঁহার কথায় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের আমূল সংশোধন বা

সংস্কার হইবে? কোটী কোটী দলে বিভক্ত হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, আচার প্রণালী ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা এই প্রাচীন সমাজের সংস্কার বা সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টার ফল যে কি হইবে, কিছুই নির্দ্দেশ করিবার শক্তি নাই। হিন্দুসমাজের এই শোচনীয় অবস্থার দিনে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আশা ভরসা ছিল। হিন্দুসমাজ, ব্রাহ্মসমাজে সংযুক্ত হইয়া যাইবে, আমরা তাহা মনে করি না। তাহা কখনই সম্ভব নয়। সম্ভব— ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের জীবন্ত ভাব, জীবন্ত সত্য হিন্দুসমাজে যাইয়া সংযুক্ত হইবে। হিন্দুসমাজ যেখানে আছে, সেইখানে থাকিয়া অল্পে অল্পে পুনর্জীবন লাভ করিবে। আমরা ইহাই সম্ভব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু যে আদর্শে প্রাচীন সমাজের সংস্কার হইতে পারে, সে আদর্শ পাইতেছি না, বরং স্থানে স্থানে দেখিতেছি, সাপ মারিতে গিয়া লাঠীই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। একটা পাপ নির্ম্মূল করিতে যাইয়া আর একটা পাপের অনুষ্ঠান হইতেছে। এমনই অবস্থা হইয়া উঠিতেছে যে, জীবন্ত-চিন্তা, জীবন্তভক্তি, জীবন্ত সাধনাবিহীন অসারত্বে যেন সমাজ পূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অন্য সমাজকে আদর্শ দেখাইয়া আকৃষ্ট করিবেন কি, নিজেরাই পরস্পরের পূতিগন্ধে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতেছেন।* মূর্খের বক্তৃতায় বা জীবনহীনের অসার কথায় লোক ভুলে না। ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই বক্তা, অনেকেই না পড়িয়া পণ্ডিত বা প্রচারক। সমাজে বক্তৃতা খুব জীবন্ত আছে, কিন্তু প্রকৃত নীতিবান ও চরিত্রবান লোক কই? যাঁর মুখের জ্যোতিতে লোক পবিত্র হয়, যাঁর চরিত্রের সুবাসে লোক ধার্ম্মিক হয়, সেরূপ লোক কই? মুখভার করিয়া গম্ভীর হইলে বা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নৈতিক ঘৃণা (moral indignation?) দেখাইলেই ধর্ম্ম বা চরিত্র লাভ হয় না। আজ কাল পরস্পর দ্বেষাদ্বেষী হিংসাহিংসী করিয়া পরস্পরের বুকের রক্ত পান করিয়া সকলে মরিতেছে। সমাজে আদর্শ মত এখন আর জীবিত নাই। একজন, দুজন, দশজন লোক দোষী হইলে কথা ছিল, কিন্তু দেখা যাইতেছে—অনেকেই কোন না কোন দোষে লিপ্ত। আমি, তুমি, সে, কাহার নাম করিব? নাম করিলেই বা বিচার করিবে কে? বিচার হইবেই বা কিসের? একটা আদর্শ মত থাকিত, তবে বুঝিতাম, তাহার অন্যথা যে করিয়াছে, তাহাকে শাসন করা যাইবে, সুতরাং তার নাম করি। আদর্শ মত নাই যখন, দোষীর দোষ কেমনে সাব্যস্ত হইবে? একজন বলিতেছেন, সম্বন্ধ-পাতনে ভাই ভগ্নীর সহিত বিবাহ হইতে পারে;—অন্য জন বলিতেছেন, বিবাহের পূর্ব্বে এক বাড়ীতে পাত্র পাত্রী অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকিলেই বা দোষ কি! বলত একার্য্য অন্যায় কি না? তোমার মতে অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু তার মতে ত নয়! সুতরাং তাহার দোষ বিচার করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিবে কিরূপে? আমরা দেখিতেছি, বিচার-কমিটী কথা সত্ত্বেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পাপীর বিচার হইতেছে না। একজন

* Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, Page 12.

ফরিয়াদী হইয়া উপস্থিত না হইলে বিচার আরম্ভ হয় না। ফরিয়াদী হওয়া কি কষ্টকর, ইহাতে কিরূপ হিংসার তলে পড়িতে হয়, সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং ফরিয়াদী হইতে বড় কেহ রাজি নয়। এইজন্য, সুবিচার হওয়াও সম্ভব নয়। বিশেষতঃ, স্বেচ্ছাচারমূলক বিচারকে লোকে ভয় করে না। এই সকল কারণে আমরা বারবার অনুরোধ করি, অগ্রে আদর্শমত গঠন করা উচিত। এসম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি, আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলি, এই আদর্শ মত গঠনের জন্য তিন সমাজকে একত্রিত হইয়া কার্য্য করা উচিত। আদর্শমত যখন প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন অনায়াসে পাষণ্ডদিগকে দমন করা যাইবে এবং ব্যক্তিগত জীবনকে আদর্শমতে দীক্ষিত করিয়া উন্নত করা যাইবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন ব্রাহ্মসমাজ নীতি ও ধর্ম্মে সজীব হইবে, তখন অলক্ষিত ভাবে এই জীবন্ত ভাব দেশময় সংক্রামিত বা অনুপ্রাণিত হইবে। তার পূর্ব্বে নয়।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি, প্রাচীন প্রথা-সংস্থানকারী এবং নূতন প্রথা প্রতিষ্ঠিতকারী উভয় সম্প্রদায়ের ভাল মত উভয় সম্প্রদায়ের গ্রহণ করা উচিত। ব্রাহ্মসমাজের সমবেত সামাজিক কমিটী গঠিত হইলে তাহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে, প্রাচীন প্রথার দোষ গুণ আলোচনা করা। এই কার্য্যের সহায়তার জন্য প্রাচীন ও নূতন প্রথার আমরা কিছু সমালোচনা করিতে চাই।

প্রথমে প্রশ্ন এই, বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কি না? এসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন। মনু যে আট প্রকার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, সমাজে তখনও যৌবন বিবাহ প্রচলিত ছিল। কারণ আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের তিনি যে লক্ষণ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, স্ত্রীলোকের ও পুরুষের যৌবন কালে বিবাহ হইত। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহে কন্যাদানের কথা আছে।* কিন্তু প্রথমোক্ত চারিপ্রকারে বিবাহে কন্যাদানের কোন কথা নাই।† একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, ও গান্ধর্ব্ব, এই ছয় প্রকার বিবাহকেই মনু প্রশংসা করিয়াছেন, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকে খুব নিন্দা করিয়াছেন। তৎপর দেখা যায়, মনু বলিতেছেন, কন্যা অপ্রাপ্ত বয়সই হইলেও, উৎকৃষ্ট অভিরূপ ও সদৃশ বর পাইলে, তাহাকে সেই বরে যথাবিধি দান করিবে।* "অপ্রাপ্ত বয়স হইলেও" এই কথায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বয়স হইলেই বিবাহ হইত, তবে ভাল পাত্র পাইলে তার অন্যথা করিতে বলিতেছেন। তারপর আরো স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।

মনুসংহিতা, ৯ম অ, ৮৯ শ্লোক।

অর্থাৎ ঋতুমতি কন্যাও আমরণ পিতৃগৃহে অবস্থান করিবে, তথাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক গুণহীন বরকে কথন কন্যা দান করিবে না।

তার পর বলিতেছেন;—

"ত্রিণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।

---

* মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায়—২৭,২৮,২৯ ও ৩০ শ্লোক দেখ।

† মনুসংহিতা ঐ ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ শ্লোক।

* মনুসংহিতা—নবম অধ্যায়, ৮৮ শ্লোক।

উৰ্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম।

মনুসংহিতা, ৯অ, ৯০ শ্লোক।

অর্থাৎ কুমারী ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, এই কালের পরে উৰ্দ্ধ বা সদৃশ পতি গ্রহণ করিবে।

তারপর বলিতেছেন,—'যদি অদীয়মানা কন্যা স্বয়ং ভর্ত্তাকে যথাকালে বরণ করে, তবে সেই কন্যার ও বরের কোনও দোষ গ্রহণ করিতে হয় না।' ৯ম অ, ৯১ শ্লোক। তারপর বলিতেছেন—স্বয়ংবরা কন্যা পিতৃ মাতৃদত্ত অলঙ্কার গ্রহণ করিবে না। ৯ম অ, ৯২ শ্লোক। ইত্যাদি।

এই সকল শ্লোকে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মনু যৌবন বিবাহের পোষকতা করিয়াছেন; তবে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে,অপরিহার্য্য না হইলে এরূপ করা অবৈধ। পুরুষের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে মনু খুব স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন। গুরু-কুলে জীবনের অধিকাংশ কাল থাকিয়া বেদাধ্যয়ন ও ব্রতাচরণ সমাপ্ত না করিয়া বিবাহ করিবে না।* ২৪।২৫ বৎসরের পূর্ব্বে তাহা হইত না।+ পুরুষদিগকে গুরুকুলে থাকিতে তিনি আদেশ করিয়াছেন কন্যাদিগকে বাল্যকালে পিতারবশে,যৌবনে পতির বশে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।+ ইহাতে বুঝা যায়, মনু স্ত্রী স্বাধীনতার খুব বিরোধী ছিলেন। সে যাহা হউক, একটী শ্লোকে তিনি বিবাহের বয়সে একটু গোল করিয়াছেন। ৯ম অধ্যায়ের ৯৪ শ্লোকে দেখা যায়, ;—

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যা হৃদ্যাংদ্বাদশবার্ষিকীম"

অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি, দ্বাদশবর্ষীয় কন্যাকে বিবাহ করিবে, ইত্যাদি।

উপরোক্ত শ্লোক সকলের পর এই শ্লোকটী থাকায় আমাদের মনে হয় যে, তিনি এতদ্বারা অনুপাত (Ratio) ঠিক করিতেছেন; কিন্তু ইহাতে ইহাও বুঝা যায় যে,সে সময়ে এইরূপ বিবাহ হইত। যাহা হউক, বিকৃত অর্থ করিলেও,এ শ্লোকে বালিকাদের পক্ষে বাল্য বিবাহের বিধি থাকিলেও,পুরুষদিগের পক্ষে নাই। হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান সময়ে পুরুষদিগের যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা দেশাচার মাত্র; তাহা শাস্ত্রের অনুমোদিত মোটেই নয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে বালিকাদের যে অধিক বয়সে বিবাহ হইত, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, সুভদ্রা, রুক্মিণী, গান্ধারী, দেবযাণী, প্রভৃতির বিবাহেই তাহা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।+ বৈদিক, স্মার্ত্তিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কালে বালিকার পক্ষেও বাল্যবিবাহ যে প্রচলিত ছিল না, সুরভি ও পতাকায় শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র তাহা সুন্দররূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।* তবে তিনি বলিতেছেন যে, "কেবল দানসাধ্য বিবাহে (যাহা পরবর্ত্তী স্মার্ত্তিককালে কেবল ব্রাহ্মণগণেই আবদ্ধ ছিল) অনেক স্থলে বালিকার পরিণয় হইত, কিন্তু তাহা বালকের সহিত কদাচ সংঘটিত হইত না।" সুরভি ও পতাকা—৮ই পৌষ—১২৯৪।

* মনুসংহিতা—৪র্থ অ—১৭৩য় অ ২, ২য় অ ৩৬ ও ৩য় অ ৪ শ্লোক।

+ হিন্দু বিবাহ সমালোচন—প্রথম খণ্ড ১৩।১৪ পৃষ্ঠা।

+ মনু—৫ম অ, ১৪৭ ও ১৪৮ শ্লোক।

+ হিন্দুবিবাহ সমালোচন প্রথম খণ্ড ৯ম পৃষ্ঠা; and Hygene and Public Health by D. Basu, vol II. P 130.

* সুরভি ও পতাকা—বাল্যবিবাহ ১ম হইতে ৮ম অধ্যায়, কার্ত্তিক হইতে ১৫ই পৌষ, ১২৯৪।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয়, ইতি-পূর্ব্বে হিন্দুবিবাহ সমালোচনায়ও প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বাল্যবিবাহ বিস্তৃতরূপে প্রচলিত ছিল না, তবে কোনং স্থানে একটু আধটু ব্যবস্থা দেখা যায় মাত্র। কথায় বলে, নানা মুনির নানা মত, সকলে যে একমত হইবেন, ইহা কখনও আশা করা যায় না।

এখন প্রশ্ন এই, হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক যোগ বা মুক্তি কি না! শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "হিন্দুপত্নী" ও "বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য" নামক প্রবন্ধদ্বয়ে মীমাংসা করিয়াছিলেন যে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক।* শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় এই কথাটী খণ্ডন করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক নয়।+ রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ অন্যান্য বিষয়ে খুব সারগর্ভ হইলেও এবিষয়ে ভ্রমাত্মক বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল। মনু বলিয়াছেন, গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।* তার পর তিনি বলিতেছেন, "যিনি অক্ষয় স্বর্গ ও ঐহিক সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি প্রযত্ন সহকারে গৃহস্থাশ্রম সতত অবলম্বন করিবেন। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তি এ আশ্রম অবলম্বন করিতে সমর্থ নহে।"+ বিবাহ ভিন্ন গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় না, সুতরাং স্বর্গ লাভের জন্য বা মুক্তির জন্য বিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ, ইহাতে সন্দেহ কি? হর পার্ব্বতীর বিবাহ, রামসীতার বিবাহ প্রভৃতি যে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-ভাবের দৃষ্টান্ত ঘোষণা করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। চন্দ্রনাথ বাবু রবীন্দ্র বাবুর উত্তরে অনেক যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক ভিন্ন আর কিছুই নয়।+ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যই প্রধান, গৌণ উদ্দেশ্য পুত্র লাভ ইত্যাদি। চন্দ্র নাথ বাবু খুব যোগ্যতা সহকারে রবীন্দ্র বাবুর কথা সকল কাটিয়া দেখাইয়াছেন। সোজা কথাতে, আমরা ইহাই বুঝি, প্রাচীন আর্য্য সমাজের সকল বিধি, সকল অনুষ্ঠানের লক্ষ্যই ধর্ম্ম বা মুক্তি। ধর্ম্ম ভিন্ন কোন কথা নাই। আর্য্য সমাজের বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক নয়, একথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আরো কোন কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি চেষ্টা করিবেন শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাতে যে কি লাভ হইবে, বুঝি না। সে সকল না দেখিলে কিছুই বলা যায় না। হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য যে আধ্যাত্মিক ছিল, যৌবন বিবাহ প্রতিষ্ঠিত থাকাই তাহার প্রমাণ। পুরুষ ধর্ম্ম শিক্ষা শেষ না করিয়া বিবাহ করিবে না, ইহাই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ।

হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য অধ্যাত্ম যোগ বা মুক্তি হইলে বালিকার চরিত্র বা ধর্ম্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে যে বিবাহের ব্যবস্থা, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই প্রাচীনকালে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল না।* আমাদের বিবেচনায় এ বিষয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যও চাই। সুশ্রুত সংহিতার আদেশ এই জন্যই শিরোধার্য্য। দময়ন্তী ও সাবিত্রী যে দেশে এত পূজা পাইতেছেন, সে দেশে যৌবন বিবাহের প্রতি লোকের যে ঘৃণা ছিল না, তাহা বেশ বুঝা যায়।

* সাবিত্রী, ৫৯ পৃষ্ঠা হইতে ৯১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

+ ভারতী, ১১শ ভাগ পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ দেখ।

* মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায় ৭৭ ও ৭৮ শ্লোক।

+ মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায় ৭৯ শ্লোক।

+ নবজীবন ৪০ সংখ্যা, কার্ত্তিক, হিন্দুবিবাহ।

* সুরভি ও পতাকা, পৌষ ১২৩ পৃষ্ঠা।

সুতরাং নানাকারণেই সর্ব্বতোভাবে যৌবন-বিবাহের অনুমোদন করা যাইতে পারে। এখন যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা দেশাচর মাত্র। এই দেশাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? যেরূপ দেখা যাইতেছে, কন্যাভারগ্রস্ত হওয়া প্রযুক্তই হউক, বা পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণেই হউক, অনেক স্থলে খুব বয়স্থা বালিকা দেখা যায়। এই জন্যই রক্ষণশীল দলের অগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু বালিকার বয়স ১৩ বৎসর করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন।* বাল্য বিবাহ উঠিয়া যাইতেছে এবং যাইবে; কাহারও সাধ্য নাই তাহার গতি থামায়। তবে হিন্দু সমাজে বয়সের একটা বাঁধাবাধি নিয়ম থাকিবে কি না, সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের মতে বালিকার ১৪ বৎসর বিবাহের ন্যূন বয়স, হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল দলের মতে ১৩ বৎসর ঊর্দ্ধ বয়স। আর এক বৎসর উঠিলে নিম্নে ও ঊর্দ্ধে অন্ততঃ মিলন হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায়, আদর্শ আরো উপরে তুলিয়া দেওয়া উচিত। এত অল্প বয়সে বালিকাদের ধর্ম্মজ্ঞান, চরিত্র, এসকল কিছুরই অঙ্কুর জন্মে না। যে হিসাবে ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকা রাখা যাইতে পারে, সেই হিসাবে আরো কিছু কাল রাখিলে ক্ষতি নাই। তবে যেখানে সমাজের বা অভিভাবকের অবস্থায় কন্যা রাখা কষ্টকর, সেস্থলে স্বতন্ত্র কথা। যাহা হউক, বয়স সম্বন্ধে প্রাচীন প্রথা ও নব্য প্রথার মধ্যে অতি অল্পই পার্থক্য দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজ এ সম্বন্ধে দেশের প্রাচীন মতানুসারে যে কতক কার্য্য করিতে পারিয়াছেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উজ্জল আলোকে এই বিবাহ প্রথাকে সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন,* এক সময়ে সে জন্য ব্রাহ্মসমাজ এদেশে পূজা পাইবেন। কিন্তু কথা এই, বয়স সম্বন্ধে যেরূপ অগ্রসর হইয়াছেন, ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ সেরূপ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে—ব্রাহ্মিকাদের মন দিন দিন বিলাসের দিকে ঝুকিতেছে। এই স্রোত হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করা খুব উচিত। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। বিলাসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, সুশিক্ষা ও সুনীতিতে ভূষিত করিয়া, উপযুক্ত কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে এখনও কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।

অভিভাবকের উপর বা গুরুর উপর কন্যা এবং পাত্রের সম্পূর্ণশিক্ষার ভার দেওয়া হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ। তাঁহারাই পাত্র পাত্রী মনোনীত করেন। প্রাচীন কালে দুই একস্থলে অন্যরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকিলেও—অধিকাংশ স্থলে পাত্র পাত্রী মনোনয়নের ভার অভিভাবকদিগের উপর থাকিত। যে চারিপ্রকার বিবাহে কন্যাদানের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ত সম্পূর্ণ অভিভাবকদিগের কর্তৃত্ব। স্ত্রীস্বাধীনতার তত বিস্তার বা আদর ছিল না। ব্রাহ্মসমাজেও যে খুব বিস্তার হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। তবে কোন কোন স্থানে হিন্দুসমাজেও স্ত্রীস্বাধীনতা আছে,

* নবজীবন, কার্ত্তিক ১২৯৪, ২২৩ পৃষ্ঠা।

* Leonard's History of the Brahma Samaj, Page 164.

কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মসমাজেও আছে। ব্রাহ্মসমাজে মনোনয়ন প্রথার একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে, ইহাতে আমাদের খুব আপত্তি। কেশব বাবুরও খুব আপত্তি ছিল।* সে সকল কথা পূর্ব্বে যথাযথ আলোচনা করিয়াছি। অভিভাবকের মতামতের উপর নির্ভর না করিলে বিবাহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। চরিত্র, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, বংশপরম্পরা চরিত্র ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি, নানা বিষয়ের অনুসন্ধান প্রয়োজন। কেবল পাত্র পাত্রীর উপর ভার দিলে তাহা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই জন্য আমরা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু রিত্যনুসারে বর কন্যার উপর মনোনয়নের ভার না রাখিয়া অভিভাবকের উপর অধিক দিতে বলি; ইহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। পিতা মাতা, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদিগকে চটাইয়া নিজের সুখের জন্য বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। নিজের সুখই মানুষের এক মাত্র লক্ষ্য নয়। আত্মসংযম ব্রত গ্রহণ করিয়া অন্যের সুখ, অন্যের সুবিধা দেখা খুব উচিত। ব্রাহ্মসমাজে অনেকে আত্মীয়ের মত বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়াছেন; আর কেহ কেহ এমনও আছেন যে, পিতা মাতার মত বিরুদ্ধ হয় বলিয়া যাঁহারা বিবাহই করিতেছেন না। তাঁহাদিগের কি মহত্ব! বাস্তবিকও এইরূপই হওয়া উচিত। নিজের সুখ-সচ্ছন্দতা বা স্বার্থ—অন্যের জন্য পরিত্যাগ করাতেই মহত্ব। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি, আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে প্রাচীন মত গ্রহণ করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একান্ত উচিত। ক্রমশঃ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। অঞ্জলী।—শ্রীইন্দু ভূষণ রায় প্রণীত—মূল্য ।৶০। পদ্যময় গ্রন্থ। গ্রন্থকার এই নূতন সাহিত্য জগতে দেখা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার লেখায় তেজ আছে, কমনীয়তা আছে, পবিত্রতা আছে, মাধুর্য্য আছে। সকলগুলি নয়, দুই চারিটী কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে। 'সে ভুলিবার নয়,' 'তুমি মধু,' 'পিয়াস না মিটিল,' প্রভৃতি কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে। সকলের উপরে, গ্রন্থকারের রুচি অতি সুন্দর—প্রতি কবিতায় তাঁহার পবিত্রতার অস্ফুট ছায়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক এ গ্রন্থ পড়িয়া আমরা ইন্দু বাবুর পবিত্র জীবনের পবিত্র একটী আভাস পাইয়াছি। ভগবান্ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

৫। বিভা।—মাসিক পত্রিকা, বার্ষিক মূল্য ২৸০।—রয়াল ৬ ফর্ম্মা। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণ ইহাতে লিখিতেছেন। পূর্ণ বাবুর প্রবন্ধ বেশ হইতেছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের জাতিভেদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটী খুব পাণ্ডিত্য পূর্ণ হইতেছে। মোটের উপর পত্রিকা খানি বেশ হইতেছে।

* Life and Teachings of Keshub Chunder sen, Page 266.

সীতারাম রায় । (২য়)

যে স্বাস্থ্য-প্রদায়িনী মধুমতী নদী আজ মহম্মদপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, ২০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই মধুমতী আদৌ ছিল না। তখন মহম্মদপুর, হরিহর-নগর এবং ভূষণা প্রভৃতি খ্যাত নগর কালী-গঙ্গা নদীর তটস্থ ছিল। থাকের নক্সায় কালীগঙ্গা অঙ্কিত আছে এবং স্থানে স্থানে কালীগঙ্গার কাল জল পথিকের নয়ন ক্লিষ্ট করিয়া থাকে এবং যদি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে, তবে তৎক্ষণাৎ ক্ষত উৎপাদন করে।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কালীগঙ্গা কি প্রকার শ্রীশালিনী ছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু তত্তীরস্থ ভূষণা ও মহম্মদপুর নগর যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল, সন্দেহ নাই। এই উভয় নগরই সীতারামের। কি প্রকারে একজন উত্তর রাঢ়ীয় হীন বংশো-দ্ভব কায়স্থ এ অঞ্চলে একটী স্বাধীন রাজ্যের মূল পত্তন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় কিম্বদন্তী বিবিধ কল্পনা বিজৃম্ভিত করিয়াছে। (১) সীতারামের হরিহর নগরে তালুক ছিল। তদ্ভিন্ন শ্যামনগরে একটী জমা ছিল। একদা তিনি অশ্বারোহণে হরিহর নগর হইতে শ্যামনগর যাইতেছিলেন, পথে অশ্বের খুরে বাধিয়া একটী ত্রিশূল উঠিল। সেই ত্রিশূল দ্বারা ভূমি খনন করাতে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের মন্দিরের শীর্ষদেশ দেখা দিল। ক্রমে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের মন্দির, পরে সেই ঠাকুর (শিলাচক্র) প্রাপ্ত হওয়া গেল। সীতারাম দেবতার দাস বলিয়া আপনাকে ঘোষিত করিলেন; সহস্রলোক সঙ্গে জুটিল। তাহাদের সহায়-তায় রাজ্য বিস্তৃত হইল, দুর্গ নির্ম্মিত হইল, তিনি রাজা হইলেন। (২) এ অঞ্চলে ১২ জন ভূস্বামী ছিলেন। তাঁহাদের রাজকর বাকী পড়িয়াছিল। দিল্লীর সম্রাট সীতারামকে সসৈন্যে পাঠান; তিনি ভূস্বামী-গণকে একে একে পরাজিত করিয়া স্বয়ং রাজা হন, কিন্তু শেষে নিজেও রাজকর দেন নাই। (৩) সীতারাম দিল্লীতে চোপদার ছিলেন। ভূস্বামীগণের রাজকর অনাদায় বশত সম্রাট তাঁহাকে সাজোয়ান করিয়া পাঠান। (৪) সীতারামের পিতা "ভূষণা জয়কারক হরনারায়ণ বিশ্বাস" জয়াস্তে দিল্লীতে গেলে মৃত্যুমুখে পতিত হন; তাহাঁর পুত্র সীতারাম নানা দুর্দ্দশার পর স্বপ্নে দেখেন, পোড়া মাটী খাইতেছেন। পোড়ামাটী খাওয়ার ফল রাজ্য লাভ। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আসিলে রাজ্যলাভ হইতে পারে বিবেচনা করিয়া, আবাদী সনন্দ লইয়া আইসেন। *

* ১ম ও ২য় প্রবাদ ওয়েষ্টল্যাণ্ড (Westland) সাহেবের যশোহরের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হই-য়াছে। উক্ত সাহেব প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে সীতারামের রাজধানী মহাম্মদপুর সন্দর্শন করেন। কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তিনিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই, তিনি বলেন— There must be much in my report that would bear further enquiry (Vide his letter to Govt. dated the 25th Oct. 1870). তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদের অনৈক্য হইবে। সম্প্রতি প্রথমোল্লিখিত প্রবাদ আমরা শুনি নাই।

এই সকল প্রবাদের প্রকৃতার্থ স্থির করা কঠিন। সীতারামের পিতা ও মাতা এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার কতক কারণ আছে। অনেকেই বলে, মহম্মদপুরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে যে খাল অদ্যাপি বহমান আছে, উহা সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ দাসের কাটা বলিয়া উদয়গঞ্জের খাল নামে পরিচিত। সে স্থলে উদয়গঞ্জের হাটও ছিল। কিন্তু উদয় নারায়ণ ভূষণা "জয় কারক" ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভূষণা "চাকলে ভূষণা বলিয়া" খ্যাত। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে "চাকলা" নামক বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; সে সময় অর্থাৎ ১৫৮২ হইতে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ ৩৩ সরকারে বিভক্ত ছিল। ভূষণা সীতারামের নিজের নির্ম্মিত এবং সীতারামের পরাজয়ের পর "চাকলাতে" পরিণত হয়। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বিবেচনা করেন, সীতারাম ১৭১৪ কি ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে তনুত্যাগ করেন। একথার বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না। সীতারামের তিরোভাবের পর যাহা "চাকলা" হইল, সে চাকলা তাঁহার পিতা কি প্রকারে পূর্ব্বে জয় করিলেন? চাকলা সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যে জয় করার ছিল, এরূপ বোধ হয় না।

আমার বিবেচনা হইতেছে, সীতারামের পিতার আগমনের সহিত "মথুরাপুরের সংগ্রাম সাহার" ইতিবৃত্তের সংস্রব আছে। সুতরাং তদ্বিষয় যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধুমতী নদী সে সময়ে ছিল না। বাবুখালীর নিকট দিয়া সে সময়ে বারাষিয়া নদী প্রবাহিত হইত। বারাষিয়ার উত্তরাংশ পরিণামে মধুমতী হইয়াছে। বারাষিয়া ও কালীগঙ্গা ভিন্ন আর দুইটী নদী ছিল—ছত্রাবতী ও চন্দনা। ছত্রাবতী শুষ্ক-কলেবরা হইয়াছে; চন্দনা অদ্যাপি আছে, তাহাতে বৎসরে ৫। ৬ মাস নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

সংগ্রামসাহ সম্বন্ধে ডাক্তার হণ্টার নির্ব্বাক্; ঢাকার ইতিহাস লেখক ক্লে সাহেব নির্ব্বাক্; বরিশালের ইতিহাস লেখক বিবরিজ সাহেব নির্ব্বাক্; যশোহরের ইতিহাস লেখক ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব নির্ব্বাক।* কিন্তু তাঁহারা নির্ব্বাক হই-

২য় ও ৩য় প্রবাদ মূলতঃ প্রায় একরূপ। ইহার কিছুত্র সত্য থাকা অসম্ভব নহে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও ২য় প্রবাদ অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করেন।

৪র্থ প্রবাদ মহাম্মদপুর নিবাসী রাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে গৃহীত। উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন লোকেন—তাঁহার হস্তলিপির মধ্যে বঙ্কিম বাবুর শ্রী, নন্দ, রমা এবং মৃণ্ময় প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। যদিও তাঁহার হস্তলিপি আমার প্রধান অবলম্বন, তথাচ তাঁহার প্রত্যেক কথা আমার পরীক্ষা করিয়া লইতে হইতেছে। তিনি সীতারামের আগমন বিষয়ে যে প্রবাদ সংযোজিত করিয়াছেন, তাহা অন্য কেহ সমর্থন করে না এবং তাহা প্রায় সর্ব্বতঃ পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করি। তাঁহার মতে সীতারামের পিতা হরনারায়ণ বিশ্বাস; কিন্তু সীতারামের উত্তর পুরুষ বলেন, হরনারায়ণ সীতারামের পুত্র।

* তাঁহার পুস্তকে সিংহরাম সা নামে নবাবের প্রধান সেনাপতির নাম পাওয়া যায়। সিংহরাম সীতারামকে পরাজিত করেন। সিংহরাম আর সংগ্রাম এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে না। সংগ্রাম এ দেশে বাস করিয়াছিলেন। মথুরাপুরের দেউল সীতারামের দশভুজালয়, হরেকৃষ্ণ মন্দির

লেও সংগ্রামসাহ নামে এক ব্যক্তি সীতারামের অব্যবহিত পূর্ব্বে চন্দনা নদীতীরে রাজত্ব করিতে ছিলেন, এবিষয়ে মথুরাপুরের দেউল স্বাক্ষ্য দিতেছে এবং তদ্বিষয়ক কিম্বদন্তী * বর্ত্তমান মধুমতীর উভয় পার্শ্বে প্রায় সকল গ্রামে জাগরিত আছে।

সংগ্রাম সাহকে এদেশে "হামবৈদ্দী" সংগ্রামসাহ বলিয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধাংশে যখন বঙ্গদেশ (বর্ত্তমান পূর্ব্ব বাঙ্গালা) একদিকে মগ ও পর্ত্তুগিজ ও অপরদিকে আসামীদিগের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত ও মোগলসাম্রাজ্য আভ্যন্তরিক বিবাদে প্লাবমান, তখন সংগ্রামসাহ প্রাদুর্ভূত হইয়া নিরাপদে চন্দনা তীরে রাজত্ব করিতেছিলেন।

সংগ্রাম সাহকে পরাজিত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তৎসমভিব্যাহারে উদয়নারায়ণ বিশ্বাস (সীতারামের পিতা) সম্ভবত আসিয়া থাকিবেন, এবং কোন না কোন কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বিজয়ী সেনার অধিনায়ককে সন্তুষ্ট করিলে তদনুরোধে তিনি এ অঞ্চলে কতক জায়গীর প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে উত্তর রাঢ়ীয় একঘর কায়স্থ কালীগঙ্গা নদীর তীরে উপনিবেশিত হয়। উদয়নারায়ণ বিশ্বাসের পুত্র সীতারাম।—

সীতারামের অভ্যুদয় সম্বন্ধে যাক্ষমন্ত্রপ্রাপ্তিই প্রধান কারণ বলিয়া এ অঞ্চলবাসী সর্ব্বসাধারণ লোকে নির্দ্দেশ করে। সকলেই বলে, তিনি ঐ মন্ত্র প্রভাবে যে স্থানে ধন লুক্কায়িত থাকিত, তাহা জানিতে পারিতেন। তাহারা ইহাও বলিয়া থাকে "সীতারামকে ধনে ডাকিত", অর্থাৎ সীতারাম চলিবার সময় যে স্থানে ধন নিহিত থাকিত, সে স্থান হইতে আহ্বান

প্রভৃতির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার অনেকটা মাটীর নীচে বসিয়া গিয়াছে; হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের মন্দির প্রভৃতি তাহা হয় নাই। সুতরাং সিংহরাম নিশ্চয়ই সংগ্রাম নহেন।

* সংগ্রাম সাহের দরবারে শ্রীকান্ত বেদাচার্য্য নামে একজন জ্যোতির্বেত্তা ছিলেন। আদিষ্ট হইলে, বেদাচার্য্য মহাশয় সংগ্রামের আয়ুগণনা করিয়া দেখেন, সংগ্রামের মৃত্যু তৎপর দিন দ্বিপ্রহর বেলার সময় হইবে। তজ্জন্য তাহার ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করেন। সৈন্য আসিয়া তার পরদিন সংগ্রামকে মারিয়া ফেলে। এই কথা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, শ্রীকান্ত সংগ্রামের সমকালবর্ত্তী। শ্রীকান্তের বংশাবলী—এই প্রকার জানা যাইতেছে।

শ্রীকান্ত—বেদাচার্য্য
।
পুত্র—(অজ্ঞাত)
।
পৌত্র—(অজ্ঞাত)
।
প্রপৌত্র—দেবীপ্রসাদ ন্যায়লঙ্কার
।
নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য

১৪।১৫ বৎসর হইল প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে নন্দকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। নন্দকুমার জীবিত থাকিলে তাহার ৯০ বৎসর বয়স হইত। উঁহার ৪ পুরুষ পূর্ব্বে শ্রীকান্ত। ৩০ বৎসর করিয়া পুরুষ ধরিলে (৩০ বৎসর করিয়া পুরুষ ধরার কারণ আছে) শ্রীকান্তের আবির্ভাব কাল বর্ত্তমান সময় হইতে ২১০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে উপনীত হই। সে সময় সীতারাম ১০ বৎসর বয়স্ক বালক এবং তাঁহার পিতা জানিত।

২য় কিম্বদন্তী এই, সংগ্রামসাহ এদেশে আসিলে কেহ জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোন জাত?" সংগ্রাম প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসিলেন, "এদেশে কোন জাত প্রধান?" উত্তর "বৈদ্য প্রধান"। সংগ্রাম বলিলেন "তবে হামবৈদ্য" এই জন্য তিনি হামবৈদ্দি নামে খ্যাত।

সূচক শব্দ নির্গত হইত এবং সীতারাম যাইয়া ধন উঠাইয়া লইতেন। এই প্রকারে যে স্থান হইতে প্রথম ধন উঠান হয়, তাহা হরিহর নগরের নিকটবর্ত্তী "ধনভাঙ্গা" গ্রামনিবাসিনী কোন বৃদ্ধার অলাবু তলা। সেই স্থান হইতে এত ধন উঠান হইয়াছিল যে, সে স্থানে এক "দোয়া" অর্থাৎ জলাশয় হইয়াছিল। অদ্যাপি ধনভাঙ্গার দোয়া বলিয়া উহা বিখ্যাত। এই প্রবাদের ভিতর কি আছে, বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা এত দেশময় ব্যাপ্ত যে, ইহার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ফল, সীতারামের জলকীর্ত্তি এত অধিক এবং তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুর নির্ম্মাণ, হরিহরনগর, শ্যামগঞ্জ ও সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি নির্ম্মাণে এত টাকা ব্যয় হইয়াছিল যে, তাঁহাকে কোন সূত্রে প্রভূত অর্থবান বলিয়া গণনা না করিলে কিছুতেই ঘটনা পরম্পরার সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না। মোসলমান লেখকেরা * তাঁহাকে ডাকাইত বলিয়াছেন। ব্রহ্মদেশবাসীদিগকে যে প্রকার ডাকাইত বলা যাইতেছে, সীতারাম একজন সেইরূপ ডাকাইত নয়ত? ফল, সীতারামের বিস্তর অর্থসম্পত্তি হইয়াছিল।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

অবসাদ।

শিশির-প্রভাত-বায়ু অলসে বহিয়া যায়;
অলসে নিহার-কণা পত্রে পত্রে লতিকায়,
খেলি মরণের খেলা, খসিয়া, পরশে ধূলা
নিশ্বাসে কোমল প্রাণ অনন্তে মিশিয়া যায়!
মেঘে মেঘে কোলাকুলি অনন্ত গগণ জুড়ি;
রুদ্ধ প্রাণ শশীকর ক্লান্ত শ্রান্ত ফিরি ঘুরি,
যদি মেঘ অবকাশে, একাকী নিরুদ্ধ শ্বাসে
চাহে ধরণীর পানে স্বর্গের মমতা ছাড়ি.
অলস কম্পিত স্বরে, শিথিল সঙ্গীত ঝরে
নীরবে আঁধারে মিশে, ধরার মূরছি পড়ি!
ফুল ফুটে ঝরে যায়, শিথিলতা পশে প্রাণে!
বিযুক্ত হৃদয়-গ্রন্থি চূর্ণ মর্ম্ম সঙ্গোপনে!
দূরাগত বীণাধ্বনি, করুণা-গলিত বাণী
ছোয় কিনা ছোয় তার, তবু যে রে আনমনে
আপনারি সুখলয়ে, আপনারি দুখ লয়ে,
প্রাণ যে মিশাতে চাহে ধূলি-কণিকার সনে!
কে আমারে বলে দেবে দূরাগত গীতরব
কেন প্রাণে পশে মোর—কেন এ ঘুমের ঘোর?
সাধের বাসনাগুলি অভিমানে বিনীরব
কেন? কেন বুঝিনা যে কি নেশায় আছি
ভোর!

শ্রীকিশোরিলাল গুপ্ত।

সাধ

আঁধার রজনী কোলে,
তারকা মধুর হাসে,
বনলতা ধীরে দোলে,
শিশির নীরবে ভাসে।
আমার হৃদয় আজি,
তোমারে হেরিতে চায়,

* Vide Stewart's History of Bengal.

গাঁথিয়া কুসুমরাজি,
পরাতে তব গলায়।

তোমার প্রেমের হাসি,
শোভা দিবে এ জীবনে,
স্বর্গীয় কুসুমরাশি,
অমিয় ঢালিবে প্রাণে।

তোমার সুন্দর মুখ,
আঁকিয়া রেখেছি প্রাণে,
যখন পাইব দুঃখ,
চাহিব সে চিত্রপানে।

বনের বিহগ ডাকে
'বালিকা' বলিয়া মোরে,
পুষ্পহার দেয় মোকে,
ফুলবালা স্নেহভরে।

নদী বলে বালিকারে,
তোরে বড় ভালবাসি,
ইচ্ছা হয় প্রেমনীরে,
হৃদে লয়ে সুখে ভাসি।

আকাশ হাসিয়া বলে,
বালিকা আয় রে হেথা;
তোরে লয়ে ছলে ছলে,
বলিব মনের কথা।

সমীরণ মম সনে,
অতি ধীরে ধীরে বলে,
'বালিকা' একটী গানে
দেরে মন প্রাণ খুলে।

আমার 'বালিকা' নাম,
সকলেই স্নেহে বলে,
তুমি কেন নাহি মম
'বালিকা' নাম রাখিলে?

শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

মাতৃ অন্বেষণ।

এত নহে সেই মলিন গগণ
প্রাণ কাঁদে মম হেরিলে যাহায়,
এত নহে সেই চন্দ্রের কিরণ—
আনন্দবিহীন ছায়া ভাসে যায়!
এত নহে কভু সেই সমীরণ—
যে শুধু বহিত পরশিয়া কায়,
এত নহে সেই প্রাণী-কণ্ঠ-স্বর—
যাহাতে উদাসী হ'ত মম মন।
আর সে প্রকৃতি শূন্য নাহি আজ
প্রাণের সঞ্চার না ছিল যাহার,
নিরখি যে দিকে সেই দিক আজ
উথলি পড়িছে স্নেহে অনিবার।
নিরখি প্রবাসী তনয়ে আগত
যথা প্রেমময় অতুল বদনে,
দুঃখিনী জননী ডাকে অবিরত
স্নেহ পরিপূর্ণ মধুর বচনে।
পুত্র-পরিচিত সেই স্নেহে পূরি
আজি এ প্রকৃতি সম্ভাষে আমায়,
যেন ভূমণ্ডল-হৃদয় প্রসারি
ডাকিছে—"বাছনি আয় আয় আয়।"
এ অদ্ভুত স্নেহ ছিল যে কেবলি
মায়ের আমার হৃদয় ভাণ্ডারে;
পাইলে কোথায়? সেই মায়া তুমি,
বলগো প্রকৃতি, বলগো আমারে।
জাহ্নবীর তটে জীর্ণ গৃহ খানি,
বিদেশে নির্জ্জনে বসিয়া তাহায়,
খুলি বাতায়ন উদাসীর প্রায়
ভাবিতাম শুধু কোথায় জননী!
কে দিবে বলিয়া কোথায় জননী।
হেন সখা মম কে ছিল সংসারে,
কে করিবে স্নেহ জননীর মত

এ সুধা কার হৃদয় ভাণ্ডারে।
নিরাশহৃদয়ে সজল নয়নে
জগতের প্রতি করি নিরীক্ষণ,
জননী চিন্তায় বিরস বদনে
করিতাম শুধু অশ্রু বিসর্জ্জন।
আজি নভগুল মাতৃ-স্নেহ সম
ঘিরিয়ে আমায় আছে চারি ধারে,
এ চন্দ্রের আলো তাঁরি স্নেহ সম
আমার হৃদয়ে পড়িতেছে ঝ'রে।
অকস্মাৎ আজি কোথায় পাইলে,
প্রকৃতি, এ স্নেহ মায়ের আমার?
আছেন কি মাতা তোমাতে মিশিয়ে?
বলনা প্রকৃতি বল এক বার।
এ মৃদু পবন তালবৃন্ত যেন—
নড়িছে, মায়ের কোমল করেতে,
প্রাণী-কণ্ঠ-স্বর তাঁর সম্ভাষণ
শুনিলে পরাণ আকুলিত করে।
কেবল আমার মায়ের হৃদয়ে
ছিল স্নেহময় ভাব এ সকল,
তবে কি জননী তোমাতে মিশিয়ে
অয়ি স্বপ্রকৃতে! রয়েছেন বল?

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভাঙ্গা বাঁশী।

ংসার-শ্মশানে আছিল দাঁড়ায়ে
আলেয়াসুন্দরী প্রায়,
প্রায়শঃ নিশীথে হাসিতে খেলিতে
দেখিতে পেতেম তায়।
দুরাশার বাক্যে এক দিন আমি
ধরিতে তাহারে যাই,
সে দিন হইতে কোথায় লুকা'ল,
আর না দেখিতে পাই।
উদাস-পাগল সে দিন হইতে,
শ্মশান সমান ধরা,
ভূতের-কীর্ত্তন ভৈরব নর্ত্তন
ডাকিনী প্রেতিনী-ভরা।
সেদিন হইতে শশাঙ্ক 'বিধু',
যামিনী 'যমুনা' প্রায়;
হাসির বালুকা স্তরের তলে
দুঃখের ফলগু ধায়;
সে দিন হইতে লোকে দেখাইয়া
যখন তখন হাসি,
সে দিন হইতে লোকে না দেখায়ে
বিরলাশ্রুজলে ভাসি,
সে দিন হইতে একটী স্বপনে
হয়ে আছি নিমগন,
সে দিন হইতে অতীত সুখের
করিতেছি রোমন্থন;
সে দিন হইতে প্রদোষে সায়াহ্নে
আকাশের পানে চাই,
সে দিন হইতে নিরজন পেলে
আপনা আপনি গাই।
হে পিতঃ বিধাতঃ! জগতের নাথ!
ব'লে দাও একবার,
এমনি করিয়া মুহূর্ত্ত গণিয়া
যাবে কত কাল আর!
সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গল-বিধান
তোমায় বলিছে সবে,
হাসির উচ্ছ্বাসে দুঃখের নিঃশ্বাসে
কি হেতু মিশাও তবে!
আমোদের পথে নেচে নেচে যেতে
কেন না তোমার সয়!
পাঠাইয়া দাও বিষাদের চর,—
পথ আগুলিয়া রয়!
সুখের চন্দ্রমা উদিলে আকাশে
না পূরিতে ষোলকলা,
দুঃখ কালিমায় ঢেকে ফেল তায়,
চোখে বিঁধে তব শলা।

আমাকে কাঁদায়ে সুখী হ'লে হ'লে,
এ মিনতি মোর ধর,
এমন যাতনা অপরে দিওনা,
নমস্তে জগদীশ্বর!
উদাস-পাগল।

গান।

বল বল বল সখা শুনি যে একি,
তোমাতে আমাতে আছে প্রভেদ না কি?
অনন্ত তোমার রাজ্য,
অনন্ত তোমার কার্য্য,
কেবলি তোমারে দেখি যে দিকে ফিরাই আঁখি!
তুমি ছাড়া আমি নই,
আমি ছাড়া তুমি কই?
তোমারি আমারি কার্য্য অবিভিন্ন—মাখা মাখি!
দিয়েছ ভুগিতে সুখ,
কেন হইব বিমুখ?
করিব প্রাণে যা চাহে, পাপই বা কি পুণ্য বা কি!
ধূলিতে মিশিব ধূলি,
প'ড়ে র'বে কথা গুলি,
তোমারে করিব সুখী আপনি হইলে সুখী!
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের

ধর্ম্মবিষয়ক মতামত।

মৎ-প্রণীত "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত" পুস্তকে অক্ষয় বাবুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি মত ছিল, তাহার উল্লেখ নাই। মৃত্যু না হইলে, কাহারই ধর্ম্ম বিষয়ক মতামত প্রচার হয় না। তাঁহার জীবিতাবস্থায় আমার পুস্তক প্রকাশিত হয়, সুতরাং তাহাতে তদ্বিষয়ের নির্দ্দেশ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর কেহ কেহ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন; এবং ভবিষ্যতেও ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা। যিনি যিনি দত্তজ মহাশয়ের ধর্ম্ম-মতের আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের কেহই প্রকৃত তত্ব নির্দ্ধারণে সমর্থ হন নাই। যেহেতু এবিষয়ে নানা লোকের নানা মত প্রকটিত হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে নাস্তিক, অপর কেহ কেহ সংশয়বাদী ইত্যাদি কত কথাই বলিতেছেন। এই নিমিত্ত আমি এইবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১।—অক্ষয় বাবু ১২৪৬ সালের শীতকালে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। তাহারও বহু পূর্ব্বে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। ১২৭২ সালের আষাঢ় মাস হইতে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংস্রব রহিত হয়। ইহার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে "আত্মীয় সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মীয় সভাতে বাদানুবাদ চলিত। কাহারও কাহারও মতে আত্মীয় সভার অধিবেশনেই দত্তজ মহাশয়ের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইবার সূত্রপাত হয়। তদ্বিবরণ পশ্চাৎ বিবৃত হইল। এবিষয়ের বিশেষ বিবরণ বাবু কানাইলাল পাইনের উক্তিতে ব্যক্ত আছে। কানাই বাবু এক জন প্রাচীন ও মাননীয় ব্রাহ্ম। বিশেষতঃ তিনি আত্মীয় সভার এক জন সদস্য ছিলেন। তাঁহার বাক্য এবিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তিনি বলেন, "A society under the name of the আত্মীয় সভা

(society for intimate friends) was established towards the close of 1854. Babu Devendranath Thakur was its president and Babu Akshay-kumar Datta the secretary. This association soon attracted the sympathy of almost all intelligent, well-educated and earnest members of the community, some of whom held very respectable position in society. But Babu Devendranath could not agree with them as to introducing the changes they proposed in the formulae of worship which consisted in doing away chiefly as much as possible, with the reading of extracts from Sanskrit scriptures and substituting certain expressions for others, indicating the attributes of God. This disagreement caused hot discussions, in which Babu Akshaykumar Datta took an active part, and Babu Devendranath was much troubled about the matter. Finally he raised an objection, that no changes in the formulae could be made without the consent of the trustees of the Adi Brahma Samaj. This objection was found too difficult to overcome and the originators of the Association thought it better not to trouble him further on the subject; they had, therefore, to give up their hope of revising the formulae of worship"

[*Indian Messenger, June 13, 1886.*]

পাঠক মহাশয়েরা উপরি উক্ত উদ্ধৃতাংশ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, অক্ষয় বাবু কি কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত হইয়াছে,—দেবেন্দ্র বাবু ঐ সভাতে প্রস্তাব করিলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্।" অক্ষয় বাবু বলিলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, বিচিত্র শক্তিমান।" সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন বাক্য তিনি বলেন নাই। আর দেবেন্দ্র বাবু "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" পুস্তকে অথবা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে বলেন, 'হস্তোত্তোলন কর দেখি, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ কি না।' দেবেন্দ্র বাবু ও তাঁহার ন্যায় রক্ষণশীল ব্যক্তিরাই মনে করিতেন, হস্ত উত্তোলন করিলেই তাঁহাদের পক্ষ প্রবল হইবে, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত হইত। যেরূপে ও যে যে কথায় ঐ অংশ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দেবেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদেরই ত্রুটি বোধ হয়, বস্তুতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ঠিক নহে, প্রমাণিত হইল।

২।—কোন কোন ব্যক্তির মতে দত্তজ প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা অনাবশ্যক বলিতেন। কথা অযথার্থ। ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-সংক্রান্ত মত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ত্যাগের কিছু পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। আর, লোকে যে ভাবে প্রার্থনা-বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকটন করিতেছেন, তাহাও ঠিক নহে। এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ মৎপ্রচিত অক্ষয় বাবুর বৃহদাকার জীবনবৃত্তে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"অক্ষয় বাবু ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিবার বিষয়ে ইঁহার মত এই যে, জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; পরমেশ্বর তাহা অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করেন না। প্রাকৃতিক নিয়ম ঈশ্বরেরই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। মনুষ্য তাহার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিলে অভিপ্রেত ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ম-বলে যাহা সংঘটিত হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন নাই।

"একবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে কোন সাধারণ বিষয়ের জন্য ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব হয়। ইনি তাহার প্রতিবাদ করাতে তাহা রহিত হইয়া যায়। কিছু দিন হইল, অক্ষয় বাবু কোন কারণ বশতঃ পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাহার উত্তরে দেবেন্দ্র বাবু লিখিয়া পাঠান,—

"ইংরেজী ১৮৫৭।৫৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৭৯।৮০ শকে) কিভেন্টিপুল নগরের নিকটে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। তৎকালে ইংরেজদের জয়-কামনায় জন্য ইংলণ্ডের অনেক গির্জ্জাতে প্রার্থনা করা হয়। ঐ উপলক্ষে ভারতবর্ষের গির্জ্জা সকলেও তদনুরূপ প্রার্থনা করিবার আদেশ আইসে। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একটি অধিবেশনে হিন্দুপেট্রিয়ট্-সম্পাদক বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ সমাজে ঐরূপ প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আপনি ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করাতে তাহা রহিত হইয়া যায়।"

"যখন ইনি ব্রাহ্মসমাজে সুস্থ শরীরে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য-সম্পাদনে ব্রতী ছিলেন, সেই সময়ে এই বিষয়ের বিস্তর বাদ-প্রতিবাদ হয়। অতঃপর, সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হইবার পরেও একটি বৃত্তান্ত বর্ণন করা যাইতেছে।

"একবার এ বিষয় লইয়া একটি বড় কৌতুককর ঘটনা হইয়াছিল। কলিকাতার হিন্দুহষ্টেলে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন কালেজের বিদ্যার্থিগণ গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকটে অক্ষয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই বিষয় ইঁহার শ্রুতিগোচর হইলে ইনি ভাবিলেন, 'বহুসংখ্যক ছাত্রের আমার নিকটে আসা অপেক্ষা আমার সেখানে যাওয়াই সুবিধাজনক।' অনন্তর এক দিন ইনি ব্রজ বাবুকে সমভিব্যাহারে করিয়া তথায় গিয়া উপনীত হইলে, হষ্টেলের তাবৎ ছাত্র একত্র সমবেত হইয়া ইঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করার প্রয়োজন-বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তৎসম্বন্ধে ইঁহার মত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ইনি প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা বা স্বার্থকতা আদৌ নাই, এই অভিপ্রায় অতি প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করেন এবং দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলেন, "কৃষিজীবী লোক পরিশ্রম করিয়া শস্য লাভ করে; কিন্তু জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনা দ্বারা কোন কৃষাণের কস্মিন্ কালেও শস্য-লাভ হয় নাই।" ইহাতে কেহ কেহ কহিলেন,"ভাল,কৃষক—পরিশ্রম ও প্রার্থনা উভয়ই করুক না কেন?" তৎপরে ইনি বলিলেন, "বল দেখি, কৃষক যদি প্রার্থনা না করিয়া যথানিয়মে কৃষি-কার্য্যে নিরত থাকে, তবে তাহার কি ফল-লাভ হইবে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "কেন, শস্যরাশি।" তদনন্তর দত্তজ মহাশয় পুনরায় কহিলেন, "যদি তাহারা প্রার্থনাও করে, কৃষিকার্য্যও করে, তাহা হইলে কি ফল-লাভ হয়?" তাঁহারা এই প্রকার জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "তাহাতেও শস্যরাশি।" তখন ইনি বলিলেন, "যাহা তোমরা বলিলে, বীজগণিতের সমীকরণ-প্রণালীতে তাহা স্থাপন করিয়া বল দেখি, প্রার্থনার শক্তি কত?"

"পরিশ্রম = শস্য,

পরিশ্রম ও প্রার্থনা } = শস্য,

"অতএব প্রার্থনার শক্তি কত?

"এই প্রশ্নের পর সকলেই কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ও নীরব রহিলেন। পরে অপেক্ষাকৃত কোন বয়োজ্যেষ্ঠ যুবক বলিয়া উঠিলেন, "প্রার্থনার মূল্য ০ শূন্য, অর্থাৎ কিছুই নহে।" ইহা শুনিয়া তখন বড় কৌতুক ও কলরব উপস্থিত হইল।

"ইহার পরে যুবক ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহ ও আন্দোলন চলিতে লাগিল। কলিকাতার প্রধান প্রধান স্কুল ও কালেজেও এই বিষয় উপলক্ষ করিয়া তুমুল আন্দোলন ও আলোচনা হয়। এই ঘটনার দুই দিবস পরে মেডিকেল কালেজের ডিমনষ্ট্রেটার বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত অক্ষয় বাবুর সাক্ষাৎকার হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে ইঁহাকে বলিলেন, "আপনি ভাল এক সমীকরণ দিয়ে সহরটা তোলপাড় করে দিয়েছেন।" অক্ষয় বাবু উত্তর করিলেন, 'বিশুদ্ধ-বুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধ-সুলভ, তাহা এদেশীয় লোকদের নূতন বোধ হইল, এটি বড় দুঃখের বিষয়।'

"ব্রাহ্মদের অধিকাংশে অনেক পরিমাণে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। সাংসারিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা নিষ্ফল ও অন্যায় বলিয়া অনেকেরই প্রত্যয় হইয়াছে।" [অক্ষয়কুমার বাবুর জীবনবৃত্তান্ত ৯১—৯৪ পৃষ্ঠা।]

এ সম্বন্ধে আরও জানা আবশ্যক, এজন্য নিম্নে কিছু উদ্ধৃত হইল।

"কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন যে, যখন বিপদ্ কি অন্য কোন সময়ে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে, সে প্রার্থনা সিদ্ধ করিতে তিনি আপনার জগতের নিয়ম সকল লঙ্ঘন করেন না, আর যখন কোন পৃথিবীস্থ রাজার ন্যায় স্তুতি বন্দনা তাঁহার তুষ্টিকর হয় না, তখন তাঁহার উপাসনার আবশ্যকতা কি? এরূপ আপত্তিকারকেরা বিবেচনা করেন না যে, যদ্যপি ঈশ্বরোপাসনার প্রতি কোন সাংসারিক কামনার সাফল্য নির্ভর করে না বটে, তথাপি তাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি মঙ্গল অভিপ্রায়ে প্রাকৃতিক নিয়ম সকল স্থাপন করিয়াছেন,—যিনি জল, বায়ু, আলোক প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সকল এমত প্রচুররূপে দিয়াছেন যে, সে সকল মূল্য দিয়া আহরণ করিতে হয় না, যিনি মনের ক্ষুধা নিবারণ নিমিত্ত বিদ্যার নিয়োগ করিয়াছেন, যিনি ভাবি-বালকের পোষণ নিমিত্ত মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করেন, যিনি কি পুণ্যবান্, কি পাপী, কি ব্রহ্মনিষ্ঠ, কি নাস্তিক, সকলেরই উপজীবিকা বিতরণ করিতেছেন,—আর পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলেও, এবং প্রভুর কোপে জীবিকাচ্যুত হইলেও, যিনি বাস ও জীবিকা প্রদানে ক্ষান্ত হয়েন না, হা! তাঁহার প্রতি কি কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণ করা কি উচিত বোধ হয় না? যখন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে হইল, তখন পিতা, মাতা ও বন্ধু-স্বরূপে তাঁহার প্রতি আমাদিগের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাও সাধন করিতে হইবে। "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ" পরমেশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরাও যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। হে অকৃতজ্ঞ পুত্রেরা! তোমাদিগের পিতাকে তোমরা স্মরণ না কর, তাঁহার প্রতি তোমরা শ্রদ্ধা না কর,

কিন্তু তিনি তোমাদিগের প্রতি যেরূপ করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন না। পরমেশ্বরের উপাসনা কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে, তাহা অত্যন্ত আনন্দজনক হইয়াছে। জগদীশ্বর যত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই এক নিয়ম যে, ব্রহ্মচিন্তাতে অত্যন্ত সুখোৎপত্তি হয়। * * * মনুষ্যের যে নির্ব্বৃতির বাসনা আছে, তাহা মোক্ষাবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না।"—[১৭৭১ শকের ১১ই মাঘে অক্ষয় বাবুর বক্তৃতা।]

উপরি উদ্ধৃতাংশে ঈশ্বরের আরাধনা করার আবশ্যকতা-বিষয়ে দত্ত মহাশয়ের মত স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। যিনি উপাসনায় অত দূর নিষ্ঠাবান্, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাতেও যে ঐরূপ হইবেন, অনায়াসেই বুঝা যায়। অনুমানের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ বক্তৃতার অন্য এক স্থলের কয়েক পঙ্ক্তি দেখুন,—

"হে পরমাত্মন্! প্রীতিপূর্ণ মনের সহিত তোমার আলোচনার সময়ে যে সুস্নিগ্ধ সুনির্ম্মল মহানন্দ দ্বারা চিত্ত কখন কখন প্লাবিত হয়, তোমার নিকট এই প্রার্থনা যে, তুমি সেই আনন্দ চিরস্থায়ী কর; তাহা হইলে, আমি পরিত্রাত ও কৃতার্থ হইলাম।"

আমার লিপির উপর যাঁহারা নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহাদের তৃপ্তিবিধানার্থ ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার পত্রিকার প্রামাণিক উক্তি এ স্থলে প্রদত্ত হইল,—

"Our friend, the author of বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার was again opposed to the views entertained by Babu Devendranath Thakur on Prayer: the latter would pray for temporal or physical blessings to which the former strongly objected. He expressed his objection with much force on the occasion of a prayer meeting which was proposed to be held in Brahma Samaj in Bhawanipur in connection with a general calamity during which prayers were offered in the Christian churches. And he succeeded in upholding his views. The Brahmas now pray for their spiritual welfare and believe in the efficacy of such prayers.—[*Indian Messenger*, *13th June, 1886*.]

৩।—ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। কেন না, "১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পর এক দিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-কালে তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অত্যধিক দুর্ব্বল হইয়া, একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।" * এই উপলক্ষে সমাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কোন সম্পর্ক রহিল না।

৪। পীড়িত হইবার পরেও যে ব্রাহ্মধর্ম্মে ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, তাহার প্রমাণ চারুপাঠের তৃতীয় ভাগ। উহা, অক্ষয় বাবুর সমাজ হইতে সম্বন্ধ ত্যাগের ৪ চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৬৬ সালের শ্রাবণ মাসে প্রচারিত হয়। উহাতে যে সমুদায় বিষয় বিবৃত আছে, তাহার অধিকাংশ স্থলেই সৃষ্টিকর্ত্তার এত দূর অচিন্ত্য মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন স্বরচিত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে" বিরক্ত হইয়া লেখেন,—"অক্ষয় বাবু সকলে পুস্তকেই 'পরম কারুণিক'

* মৎপ্রণীত "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত" ২২৭ পৃষ্ঠা।

'পরম পিতা' 'পরাৎপর পরমেশ্বর' 'অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা' প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভাল জিনিষ বটেন, তাঁহাকে মনে করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্যও বটে, কিন্তু তালটী পড়িলেই ঈশ্বর ঢুপ্ করিলেন, পাতাটী নড়িলেই—ঈশ্বর হাই তুলিলেন, পাখীটী পড়িলেই—ঈশ্বর ফুড়ুৎ করিলেন—ইত্যাদি রূপে সকল কার্য্যে ও সকল কথাতেই যদি লোককে ঈশ্বর উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের বোধে সে উপদেশ সফল হয় না। ঈশ্বর প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়—অমনতর খেলাবার বিষয় নহেন। আমরা জানি, ঘন ঘন উল্লিখিত 'অত্যাশ্চর্য্য' 'অনির্ব্বচনীয়াদি' শব্দের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে অনেক পাঠকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন—ঈশ্বরানুরাগ প্রকাশ করেন না।"—[বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ২৫৯ ও ২৬০ পৃষ্ঠা।]

অনেকের মতে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের উক্ত লেখার জন্যই দত্ত মহাশয়, শেষাবস্থার রচিত প্রবন্ধাদিতে জগদীশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই। আমরা উল্লিখিত মতে সম্মতি দিতে পারি না। যিনি জ্ঞানালোচনায় সুদৃঢ়চিত্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত উক্তি, কোন মতে প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ত নয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি অসঙ্গত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যে যে স্থানে অক্ষয় বাবু জগৎপতির যশোঘোষণা পুরঃসর পুলকিত হইয়াছিলেন, তাহা অতিমাত্র মধুর ও চিত্তাকর্ষক।

৫।—১২৮৬ সালেও অক্ষয় বাবুর ঈশ্বর-বিশ্বাস বিষয়ের প্রমাণ আছে। প্রবীণ ব্রাহ্ম বাবু কানাইলাল পাইন্ দত্তজের লোকান্তর গমনের পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুনের ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার্ পত্রিকায় 'পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্ত ও আদি ব্রাহ্মসমাজে তাঁহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত কার্য্য, ("The late Akshaykumar Datta and his work in the Adi Brahma Samaj") নামে যে প্রস্তাব মুদ্রিত করেন, তাহার শেষাংশে লেখা আছে,—"I should like to state as a matter of fact that whilst passing two days with him (Babu Akshaykumar Datta) at Bali in September 1879, one morning I and my youngest son offered prayers and chanted hymns in his beautiful garden taking our seat under the shade of some lofty trees. Babu Akshaykumar Datta sat at a little distance from us. After the service was over, we met and I marked that his face glowed with the love of God and I heard him say—"আজ আমার গৃহ প্রতিষ্ঠা হ'ল" 'To day my house is consecrated.' In the evening, whilst driving to the Railway station he expressed a desire to hear hymns, and my youngest son forthwith sang some, to his great delight. Does not this speak of a heart susceptible of devotional feeling? It is true that his rationalistic tendencies were stronger than his devotional feelings; but the latter were active in him when he was enjoying the company of our revered friend Babu Devendranath Thakur." —[*Indian Messenger, June 13,1836.*]

৬।—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ২য় ভাগ ১২৮৯ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। তাহাতে যে অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সাধারণের সুগোচরার্থ উদ্ধৃত হইল,—

"অতর্কনীয় বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিলেই বুদ্ধিবিপাক ঘটিয়া উঠে। যে বিষয় অজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয়, তাহা জানিতে ও নির্ব্বাচন করিতে গিয়া, মানুষে

বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। লোকে পরমেশ্বরকে একটি অসামান্য মনুষ্যের মত মনে করিয়া এই বিপদ্ উপস্থিত করিয়াছে। রোমক-রাজ্য-বিনাশের অবিনশ্বর-ইতিহাস-রচয়িতা শ্রীমান্ গিবন্ মুসলমান্ ধর্ম্মের বিষয়ে যে নিম্নলিখিত কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা প্রধান প্রধান অনেক বিষয়েই তাহা নিয়োজন করিতে পারেন।

"They struggle with the common difficulties, how to reconcile the presence of God with the freedom and responsibility of man; how to explain the permission of evil under the reign of infinite power and infinite goodness."
[*Gibbon*,1820, vol. IX. chap. L.p. 263.

"পরামর্থ-পরায়ণ ভক্ত লোকের মধ্যেও কেহ লিখিয়াছেন,—

"To think that God is, as we can think him to be, is blasphemy"

"আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ মনে করিতে পারি, তাঁহাকে সেইরূপ বলিয়া বিবেচনা করিলে, তাঁহার নিন্দা করা হয়।

"A God understood would be no God at all."

"ঈশ্বর যদি বুদ্ধিগম্য হইলেন, তবে তিনি আর ঈশ্বর নন।

"উপনিষদ্-কর্ত্তারা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় এক এক বার স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন।*

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

—[তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ব্রহ্মবল্লী, ৯ শ্রুতি।]

"যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়।

"যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, তলবকার ঋষি তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন,—

'যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং।'

—[তলবকরোপনিষদ, ৯।]

"যদি মনে কর, আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপ জানিয়াছি, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্মস্বরূপ অল্পই জানিয়াছ।

"ফলতঃ অবিজ্ঞেয়-স্বরূপ বিশ্বকারণের অতলস্পর্শ স্বরূপ-সাগরের তলস্পর্শ করিতে পারি, এরূপ মনে করিতেও নাই। অন্য এক জন অনির্ব্বচনীয় বিশ্বকারণকে নির্ব্বাচন করিতে গিয়া তদর্থ অপরাধ-মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়াছেন।

'রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো ! দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থ-যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ ! তদ্বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥'

"তোমার রূপ নাই, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপ বর্ণন করিয়াছি; বিশ্বগুরু! স্তুতি করিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের খণ্ডন করিয়াছি; এবং তীর্থ-যাত্রাদি করিয়া তোমার সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব গুণের নিরাকরণ করিয়াছি। অতএব জগদীশ! আমার সেই বিকলতা নিবন্ধন তিনটি অপরাধ মার্জ্জনা কর।

"কিন্তু যদিও বিশ্বকারণ অজ্ঞেয়-স্বরূপ, তাহার সন্দেহ নাই, তথাচ সে বিষয়ে চিন্তা না করিয়া একেবারে

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথম্ ভাগের উপক্রমণিকা, ১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

নিরস্ত থাকা উচিত নয়। তাহাতে স্থির-নিশ্চয় হইবার উদ্দেশে যত দূর সাধ্য, জানিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। জ্ঞানাচল আরোহণ করিতে করিতে যখন শিখরদেশ তিমিরময় কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন দেখিবে, তখন জানিবে, আর আরোহণ করিবার অধিকার নাই।

"Man is not born to solve the mystery of Existence; but he must nevertheless attempt it, in order that he may learn how to keep within the limits of the Knowable."—[*Goethe.*]

"সাকারবাদীরাও সদসৎ পাঁচ কথা বলিতে বলিতে এক একটি অতি প্রধান কথা বলিয়া বসেন এবং কখন কখন বিশ্ব-কারণকে সুস্পষ্ট রূপে অজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করেন।

'কে জানে কালী কেমন। ষড়্ দর্শনে না পায় দর্শন। * * * * প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন। আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধোর্বে শশী হোয়ে বামন।'—[রামপ্রসাদ।]

"ঈশ্বরের স্বরূপ বাক্য-মনের অগোচর, বিশুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে এটি অতীব সহজ কথা। তবে তাঁহার শারীরিক বা মানসিক রূপ কল্পনা করিয়া প্রাচীন বয়সেও ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া বাল্যামোদে আমোদিত থাকিলে আর উপায় কি?"*

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকা, ৪৮—৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এক ব্যক্তি এই অক্ষয় বাবুকে বিনা প্রমাণে পৌত্তলিক বলিতে সাহস করিয়াছেন।

৭।—উল্লিখিত মতটীকে বিশেষরূপে আলোচনা করিলে, পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বরের কোন কোন স্বরূপ-সম্বন্ধে অক্ষয় বাবু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার অস্তিত্বে কোনই সংশয় করেন নাই। অক্ষয় বাবুর জীবনচরিত প্রচারের পর অনেকে আমাকে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস কি, জিজ্ঞাসা করেন। আমিও অক্ষয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি, "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ২য় ভাগের উপক্রমণিকার ১, ২ ও ৪৮ হইতে ৫১ পৃষ্ঠার মধ্যে যাহা লিখিত হইয়াছে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাহাই আমার মত।" *

৮।—এক দিন বালিতে তাঁহার শোভানোদ্যানে ভ্রমণ করিতে, করিতে আমি একটী হরিদ্বর্ণ তৃণের উপর একটী শ্বেত রেখা, তৎপরে হরিদ্বর্ণ, পুনরায় শুক্ল রেখা, আবার হরিদ্বর্ণ—একত্র এইরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য সমাবেশ দেখিয়া সমীপস্থ অক্ষয় বাবুকে বলিয়াছিলাম, "যেন এক জন মানুষে এক বার সাদা কালী দিয়ে রুল টেনেছে, আর এক বার সবুজ কালী দিয়ে রুল্ টেনেছে।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মানুষের সাধ্য কি ওরূপ কৌশল দেখায়।" তাঁহার ভাব ভঙ্গীতে তখন আমার মনে হইল, ঈশ্বরই উক্ত তৃণের সৌন্দর্য্যবিধানকর্ত্তা ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

৯।—অক্ষয় বাবুই ব্রাহ্মধর্ম্মে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রবর্ত্তনের প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম করেন।

* উদ্ধৃতি চিহ্নের অন্তর্গত বাক্যগুলি অক্ষয় বাবুর মুখের কথা।

ধর্ম্ম-বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে হইলে, সেই বৃত্তান্ত আদ্যন্ত জানা উচিত, এই কারণে মৎপ্রণীত অক্ষয় বাবুর জীবনবৃত্তান্ত হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত হইতেছে,—

"ইহার পর ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংক্রান্ত আর একটি মত প্রবর্ত্তিত করিবার মানস করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানই প্রকৃত নিশ্চিত জ্ঞানের আকর, সুতরাং বিজ্ঞান-লব্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম মনুষ্যের কার্য্যের নিয়ামক হওয়া উচিত। তদনুযায়ী কার্য্য করা বিজ্ঞানবিৎ প্রধানতম পণ্ডিত-কুলের স্থির নিশ্চয় হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি কোন দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এবম্ভূত উচ্চ মত সন্নিবিষ্ট হয় নাই। বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ মত শিক্ষিত-সমাজে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞান-বলে পরাভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইতেছে। বিজ্ঞান-প্রভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বার বার কম্পমান হইয়াছে। কম্পমান কেন? বিজ্ঞানবিৎ প্রধানতম শিক্ষিত সমাজের অসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে বিজ্ঞানেরই অধীনত্ব অঙ্গীকার করিয়া এবং স্ত্রীলোক, অশিক্ষিত লোক ও অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি অন্য লোকের শরণাপন্ন হইয়া কোন রূপে জীবন রক্ষা করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিজ্ঞান-সম্মত ও অবনি-মণ্ডলের হিতগর্ভ মহোপকারক হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মেরা বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপনার, আত্মপরিজনের, স্বদেশীয় জনসমাজের ও সমগ্র মানব-কুলের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বাংশে ভূলোকের হিত-সাধন করাকে পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা ও আপনাদের প্রকৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাই ইহাঁর অভিপ্রেত। এই হেতু ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্ম্মনীতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-গ্রন্থই প্রকৃত ধর্ম্ম-গ্রন্থ বলিয়া অক্ষয় বাবুই সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করেন। ব্রাহ্মসমাজে এই নূতন কথা ইনিই বিশেষ করিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। অতএব যখন বিশ্ব-গ্রন্থই ব্রাহ্মদের ধর্ম্ম-পুস্তক, তখন বিজ্ঞানই সেই পুস্তকের প্রকৃত জ্ঞান। বিজ্ঞান-গ্রন্থই তাহার ব্যাখ্যা-পুস্তক। বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী কার্য্য করা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, এই বিষয়টি স্বতন্ত্র পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবেন, মনে করিয়াছিলেন। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনের শেষ-ভাগে তদ্বিষয়ে নিদর্শন রহিয়াছে,—

"ব্রাহ্মগণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক (বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার) অধ্যয়ন ও পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে সমস্ত কার্য্য আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও, তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কোন্ কোন্ কার্য্য তাঁহার প্রীতিকর, তাহা না জানিলে, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তৎসমুদয় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম। এ পর্য্যন্ত কত প্রকার নিয়ম অবধারিত হইয়াছে এবং কি রূপেই বা সে সকল নিয়ম শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা এই পুস্তকে

যথাসাধ্য সংশোধিত হইল। অতএব এ গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মশিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই গ্রন্থোক্ত অভিপ্রায় সকল অবলম্বন পূর্ব্বক তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে ও অন্য লোকদিগকে তৎসমুদায়ের উপদেশ প্রদান করিতে যত্নবান্ থাকা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই উচিত।”—[বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপন।]

“ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, ইঁহার মতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য্য করাই ধর্ম্ম এবং না করাই অধর্ম্ম।”* ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মত ও সাধনাটি প্রকৃতরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত-মণ্ডলে ব্রাহ্মধর্ম্মের যার পর নাই গৌরব ও মহিমা বৃদ্ধি পাইত, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অক্ষয় বাবু বিদ্যালয়ে প্রবৃত্ত হইয়াই যে সামান্য ইংরেজী কাব্য অধ্যয়ন করেন, তাহাতে লিখিত আছে, মনুষ্যের উপকার করিলেই ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়।

"Let gratitude in deeds of goodness flow :
Our love to God, in love to man below."
(Poetical English Reader, No. I., P.3. 1884.)

“এই কথায় ইঁহার এমনই প্রতীতি ও প্রীতি জন্মিয়া গেল যে, তদবধি ইহা ইঁহার অন্তঃকরণে চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়া রহিল এবং উত্তরকালে একটি প্রকৃত মত হইয়া দাঁড়াইল। মহাত্মা রামমোহন রায় যে মহার্থকর পারসীক বচনটি সচরাচর আবৃত্তি করিতেন †, সেই বচনে এবং পশ্চাল্লিখিত মহাভারতীয় বচনে যে মহোচ্চ পরম ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, ইহঁার মতে তাহাই প্রধান ধর্ম্ম ও তাহাই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা।

‘ন হীদৃশং সংবদনং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
দয়া মৈত্রী চ ভূতেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাক্॥’

“ত্রিভুবনে প্রাণিগণের প্রতি দয়া-প্রকাশ, বন্ধুভাব দর্শন, সুমিষ্ট বাক্য প্রয়োগ এবং দানানুষ্ঠান এই সমুদায়ের সদৃশ ঈশ্বর-উপাসনা আর নাই।

“অক্ষয় বাবুর মত এই যে, যাহাতে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যুগপৎ সমুন্নতি সাধন হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত, এবং সেই সমুদায়কে আপনাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মগণের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বা পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিয়ম-পরিপালনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন ও তৎসংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করা বিধেয় এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে তদনুযায়ী-প্রণালী প্রচলন করা আবশ্যক। ভৌতিক-নিয়ম-লঙ্ঘনে ভৌতিক পাপ, শারীরিক-নিয়ম-লঙ্ঘনে শারীরিক পাপ, আর বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনে মানসিক পাপ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ ভৌতিক নিয়ম-পালনে ভৌতিক ধর্ম্ম, শারীরিক-নিয়ম-পালনে শারীরিক ধর্ম্ম এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক নিয়মপালনে মানসিক ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনও কি এই অত্যুদার প্রধান ভাব গ্রহণ করিয়া সকল ধর্ম্মের শিরোরত্ন হইতে পারিবেন? বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার গ্রন্থের উপসংহারে এই বিজ্ঞান-সম্মত বিশুদ্ধ অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে,—

* * * “তিনি (জগদীশ্বর) যে সকল ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থা-

---

* নববার্ষিকী, ১২০ পৃষ্ঠা।

† “মানব কুলের হিত সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা।” ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকা ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

পন করিয়াছেন, সেই সমস্ত পরিপালন করা ব্যতিরেকে আমাদের দুঃখ-সাগর উত্তরণ পূর্ব্বক সুখরূপ সুরম্য-দ্বীপ-সমাগমনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাঁহার নিয়ম-পালনই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘনই অধর্ম্ম; অতএব, তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যবহারই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারণ। তাঁহার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র ও প্রতিপাল্য। অতএব কোন প্রকার নিয়ম-পালনে অবহেলা করা উচিত নহে। যাঁহারা পরমেশ্বরের শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণাদি সাধনে সমুদায় কাল ক্ষেপণের মানসে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ঘোরতর ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই এ সংসারের কর্ত্তা, এবং সংসারের পালনার্থে যে সমস্ত শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। যাহাতে ক্রমে ক্রমে সংসারের উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। অতএব তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিয়া পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

"যদিও বিশ্ব-নিয়ন্তার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র, কিন্তু তিনি মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম সকলকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং সেই সমুদায়েরই উপরে আমাদের সুখ-সম্ভোগ অধিক নির্ভর করে। আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তেজস্বিনী হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে যত আয়ত্ত করিতে থাকিবে, সংসারে দুঃখপ্রবাহ ততই মন্দীভূত হইয়া সুখ-প্রবাহ প্রবল হইবে।

* * * "ইহা যথার্থ বটে যে, এক্ষণে জন-সমাজে যেরূপ বিরুদ্ধ রীতি-নীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে এই গ্রন্থোক্ত যথার্থ তত্ত্বানুগত সমুদায় ব্যবহার সম্পাদন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহাতে এরূপ অবধারণ করা কর্ত্তব্য নয় যে, কোন কালেই ভূমণ্ডলের কুপ্রথা সকল রহিত হইয়া যুক্তি-সিদ্ধ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত হইবে না। জ্ঞান-প্রচার হইয়া লোকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, ব্যবহার শুদ্ধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

"জন-সমাজস্থ প্রভুত্বশালী লোকদিগের যে প্রকার স্বভাব থাকে, তদনুরূপ রীতি, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত হয়। যে কালে নরমেধ, সহমরণ ও বলিদান আরম্ভ ও প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে ঐ সমস্ত কুনীতি-সংস্থাপকদিগের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি প্রবল ও উপচিকীর্ষা-প্রবৃত্তি দুর্ব্বল ছিল। যে সকল জাতি যুদ্ধ-নির্ব্বাহার্থে অকাতরে অধিক অর্থ ব্যয় করে, অথচ লোকের সুখ-সচ্ছন্দতা-বর্দ্ধনার্থে অল্প ব্যয় করিতে কাতর হয় এবং অর্থোপার্জ্জনে প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে, অথচ জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি-সাধনার্থে নিতান্ত অনুরাগ শূন্য থাকে, তাহাদের জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর ও অর্জ্জনস্পৃহা যে,—উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণকার অনেক জাতীয় লোকেরই ঐ প্রকার স্বভাব; অতএব তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে মনের ভাব পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে সুশিক্ষিত করা, পরে তদ্বিষয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিয়োজন করা, অবশেষে তদনুযায়িনী রীতি নীতি সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

* * * "এইরূপে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়া শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই সত্যস্বরূপ জ্যোতিঃ-প্রকাশের প্রতিবন্ধক সকল খণ্ডিত হইয়া সদাচার-সংস্থাপনের সুবিধা হইতে থাকিবে। এই গ্রন্থে যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি শুভদায়ক বলিয়া তখন বোধ হইবে, বোধ হইলেই তদনুযায়ী ব্যবহার দ্বারা বিদ্যা, ধর্ম্ম, সুখ ও সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি সকল তেজস্বিনী হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অতএব যে সকল নিয়ম পরমেশ্বরের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও যথার্থ শুভদায়ক, তাহা অবশ্যই প্রচলিত হইয়া পরিণামে সত্যের জয় হইবে। কোন অভিনব তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে অজ্ঞ লোকে

তাহা সহসা অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না; কিন্তু তাহা কালক্রমে বিচক্ষণ লোকদিগের গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রচলিত হব, তাহার সন্দেহ নাই,—"[বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচারের দ্বিতীয় ভাগের উপসংহার।]

* * * * "উদার মত ও বিজ্ঞানসম্মত মতের বিবরণে যেরূপ প্রশস্ত ভাব ও মহৎ অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, অবনিমণ্ডলে পরমার্থ-বিষয়ে অর্থাৎ কোন দেশীয় লোকের ধর্ম্মশাস্ত্রে বা ধর্ম্ম প্রণালীতে সেই উভয় মিলিত করিয়া অত্যুদার, মহোন্নত, সমগ্র মত কেহ কুত্রাপি সন্নিবেশ বা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এরূপ জানা নাই। ইনিই কেবল ভূমণ্ডলের যাবতীয় প্রচলিত ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ঐ সুপ্রশস্ত তত্ত্ব পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।"*

১০।—একবার অক্ষয় বাবুকে আমি পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া, এই উত্তর পাইয়াছিলাম, কেবল"সৃষ্টি-প্রণালীর উপর নির্ভর করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় না। জগতে যেমন অনন্ত দয়ার কার্য্য বিদ্যমান আছে, তেমনই অনেক নিষ্ঠুরতারও দৃষ্টান্ত দেখা যায়।"

১১।—অক্ষয় বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার কোন পরম বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি দত্তজের শেষাবস্থার ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অভিপ্রায় কি জানেন? তিনি কহিলেন, "শেষাবস্থায় বহুদিন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে নাই। নাস্তিকতা লইয়া তাঁহার সহিত আমার যখন বাদানুবাদ চলিত, তখন তিনি সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি অবজ্ঞা না করিয়া আমার তর্কবিতর্ক মনোযোগ সহকারে শুনিতেন।"

১২।—সর্ব্বশেষ প্রমাণ অক্ষয় বাবুর উইল্। উইল্ প্রস্তুত হইবার সময়ে কথা হইল, উইলের শিরোভাগে ঈশ্বরের নাম লিখিতে হইবে, কোন্ শব্দ প্রয়োগ করা যায়। দত্ত মহাশয় "বিশ্ব-বীজ" লিখিতে আদেশ করেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, "বিশ্ববীজ" শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ কি? উহার অর্থ জগতের মূল — বিশ্বকারণ অর্থাৎ জগতের আদি কারণ। এ অংশের আর একটু আলোচনা বিধেয়। শিবের ধ্যানে শিবকে "বিশ্ববীজ" শব্দে শৈবেরা অভিহিত করেন। শিবভক্তের পক্ষে শিবই উপাস্য দেবতা—ঈশ্বর। অতএব "বিশ্ববীজ" শব্দে এখানে ঈশ্বরকে বুঝাইবার বাধা কি? অক্ষয় বাবুর মত উত্তরোত্তর কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছিল, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুশীলন করিলে তাহা অনুভূত হইতে থাকে। বিচক্ষণ দার্শনিক ও বিজ্ঞানবেত্তারা যে ভাবে ঈশ্বরের আলোচনা করিয়া থাকেন, অক্ষয় বাবুর প্রকৃতি তদ্রূপ, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে নাস্তিক ও আস্তিক দুই শ্রেণী আছে। অক্ষয় বাবু আস্তিক দার্শনিক ছিলেন। ইহার নিদর্শন তাঁহার জীবনে দৃষ্ট হইয়াছিল। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বেদবেদান্তাদির ভ্রম বুঝাইয়া দেওয়া সুতীক্ষ্ণ বিশুদ্ধবুদ্ধি বিজ্ঞানবিতের লক্ষণ।

১৩।—দত্ত মহোদয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসার কত দূর বিস্তারিত করিতে উদ্যত ছিলেন, ১৭৭৭ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহা অবগত হওয়া যায়।

* মৎপ্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত, ১০০ হইতে ১০৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্রাহ্মসমাজে মত-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহই তদপেক্ষা মহান্ উদার মত প্রচার করিতে পারেন নাই, কখনও কেহ পারিবেন কি না, বলা যায় না। ধর্ম্ম-মতালোচনা-উপলক্ষে সেই বৃত্তান্ত পাঠ না করিলে, ধর্ম্ম-বিষয়ে অক্ষয় বাবু ক্রমশঃ কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, বুঝা যায় না, আমার অবলম্বিত প্রবন্ধও অসম্পূর্ণ থাকে; সুতরাং তাহা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল।—

"ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নয়। ধর্ম্মবিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তর কালে যাহা নির্ণীত হইবে, সে সমুদয়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্ম্ম-তত্ত্ব উদ্‌ভাবিত হয়, তাহাও আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। আমরা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে ভীত হই না এবং ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ন্যায় কোন অভিনব বিদ্যার প্রচার দেখিয়াও কম্পিত হই না। আমরা অবনিমণ্ডল সচল শুনিয়াও শঙ্কিত হই না এবং তদর্থে ক্রুদ্ধ হইয়া পিসা নগরীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে নিগ্রহ করিতেও প্রবৃত্ত হই না। আমরা ইতিপূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি শুনিয়াও সচকিত হই নাই, এবং অধুনা জর্জ্জ্ কুম্ব্ প্রণীত অদ্ভুত পুস্তক প্রচার বিষয়েও প্রতিকূল হই নাই। অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন্ ও লাপ্লাস্ যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্‌ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ, এবং বেকন্ ও কোম্ত্* যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার, মুসা ও মহম্মদ এবং য়িশু ও চৈতন্য পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমে ক্রমে কেবলই বৃদ্ধি হইবে এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর অনির্ব্বচনীয় রূপ উৎপন্ন হইবে।"†

১৪।—ব্রাহ্মসমাজে আত্মপ্রত্যয় বা সহজ জ্ঞানের প্রচারও অক্ষয় বাবু কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত হয়। ইহাতেও তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি-চেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায়। লিওনার্ড বলেন,—

"The theory of intuition was broached in an article headed "Dharma Tatwa Viveka "published in the *Patrika.* It emanated from the pen of Akshaykumar Dutta, who derived his first idea on the subject from the Mundak Upanishad which says: এক-মাত্মপ্রত্যয়সারম্ ।" —[*Leonard's, History of the Brahmo Somaj, p 93.*]

১৫।—দত্তজ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তাহার সর্ব্বোত্তম প্রমাণ এই,—

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। সাংখ্যপ্রবচন, ৯২ সূত্র।

"কেননা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না।

---

* মূল প্রবন্ধে লাপ্লাস্ ও কোম্ত্ এই দুইটি নাম সন্নিবিষ্ট ছিল। ইহা যে সময়ে প্রথম মুদ্রিত হয়, তখন ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ঐ দুইটি শব্দ নাস্তিকের নাম বলিয়া উঠাইয়া দেন ও তাহার পরিবর্ত্তে অন্য দুইটি নাম সন্নিবেশিত করেন, কিন্তু অক্ষয় বাবুর ঐ দুইটি নাম দিবার তাৎপর্য্য এই যে, আস্তিক দূরে থাকুক, নাস্তিকেও যদি বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া এরূপ কোন অভিনব তত্ত্ব উদ্‌ভাবন বা অবিদিতপূর্ব্ব সদভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, তদ্দ্বারা অনির্ব্বচনীয় বিশ্ব-কৌশলের জ্ঞান-লাভ ও মানুষের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন নূতন পথ বা কোন নূতন বিষয় জানিতে পারা যায়, তাহাও আমাদের আদরণীয়। ইঁহার এইরূপ অভিপ্রায় অত্যন্ত উন্নত মনের কার্য্য।"

† ১৭৭৭ শক, বৈশাখের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অথবা মৎপ্রণীত অক্ষয়বাবুর জীবন বৃত্তান্ত ৯০ হইতে ৯২ পৃষ্ঠা দেখ।

"কপিল ঋষির এই নাস্তিকতা-বাদ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে সাংখ্য পণ্ডিতেরা নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। কেহ কেহ কহেন, শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর নির্গুণ ও জগৎ সগুণ অর্থাৎ নানা প্রকার-গুণ-বিশিষ্ট, অতএব নির্গুণ ঈশ্বর হইতে কিরূপে সগুণ সংসারের উৎপত্তি হইল।

"সাংখ্যাচার্য্যা আহুঃ নির্গুণত্বাদীশ্বরস্য কথং সগুণতঃ প্রজা জায়েরন্।

—[৯২ সাংখ্য-প্রবচনের ভাষ্য।]

"সাংখ্যাচার্য্যেরা বলিয়া গিয়াছেন, নির্গুণ ঈশ্বর হইতে কিরূপে সগুণ প্রজা উৎপন্ন হইল?

"কোন কোন ব্যক্তি বলেন, জগতে কেহ বা সুখী ও কেহ বা দুঃখী হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে জীবের সুখ-দুঃখের এরূপ বৈষম্য দোষ ঘটিত না। অতএব ঈশ্বর নাই। কিন্তু ঘটিকা যন্ত্র, বাষ্পীয় যন্ত্র, গ্রন্থকারের গ্রন্থ ইত্যাদি বস্তুতে যেরূপ বুদ্ধি-কৌশল বিদ্যমান আছে, যাঁহারা এই বিশ্বযন্ত্রে তদপেক্ষা শত সহস্রগুণ কৌশল রাশি দর্শন করিয়া প্রজ্ঞাবান্ বিশ্বকারণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন, এবং সেই সমস্ত অদ্ভুত কৌশল অনির্ব্বচনীয় কৌশল-সম্পন্ন নৈসর্গিক আদিম নিয়মের কার্য্য জানিয়া বিশ্ব-নিয়ন্তার অচিন্ত্য মহিমার অতিমাত্র আধিক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সাংখ্য পণ্ডিতদিগের উল্লিখিত আপত্তি তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিতে পারেন, ঐ আপত্তি ঈশ্বরের স্বরূপ-নির্দ্ধারণ বিষয়ে একদিন উত্থাপিত হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব নিরূপণ বিষয়ে কোন রূপেই নিয়োজিত হইতে পারে না।"—[ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগের উপক্রমণিকা, ১ ও ২ পৃষ্ঠা।]

১৩।—১৮০৮ শকের কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়া "ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয় কুমার দত্ত" নামে যে ক্ষুদ্র পুস্তক ঐ শকের মাঘ মাসে মুদ্রিত হয়, তাহাতে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতি প্রবীণ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় বলেন,—

"অক্ষয় বাবু অনেক কাল যাবৎ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিয়া অজ্ঞতাবাদী হইয়াছেন। তাঁহার হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন সপ্রমাণ করা যাইতে পারে।" *

এই উপলক্ষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা রাজনারায়ণ বাবুর অবলম্বিত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের অংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের মত সমর্থন করেন নাই। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দুই খানি আছে। ১২৮৯ সালের চৈত্র মাসে ২য় ভাগ প্রচারিত হয়। এই ভাগের কোনও অংশকে লক্ষ্য করিয়া রাজনারায়ণ বাবু বলিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, তাহা হইলে "অনেক কাল" ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করা বলা অসঙ্গত হয়। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের ঈশ্বর সংক্রান্ত সমুদায় স্থল আমরা এই প্রস্তাবে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি। প্রথম ভাগে এবিষয়ে সবিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বলা বাহুল্য।

এক্ষণে এই প্রবন্ধে প্রমাণিত হইল, দত্তজ মহাশয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় করেন নাই; তিনি ঈশ্বরের

---

* "The Babu long abjured his belief in Brahmoism and turned an agnostic. This change in his opinion could be proved by passages in his work on Hindu sects"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০৮ শক, কার্ত্তিক মাস দেখ।

কোন স্বরূপে সন্দিগ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে অজ্ঞতাবাদী বলিলে,তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সংশয় করেন, বলা হয়। রাজনারায়ণ বাবু এমন কথা কেন কহিলেন, জনসাধারণ তাহা বুঝিয়া দেখিবেন। ফলতঃ, অক্ষয় বাবু পূর্ব্বে যেরূপ ব্রাহ্ম ছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও প্রায় সেইরূপ ছিলেন।

দত্তজ মহাশয়ের ধর্ম্মমত কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিলেও, * ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাঁহার আন্তরিক নিগূঢ় প্রেম ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম সমাজের শুভাশুভ সংবাদ তিনি সর্ব্বদাই লইতেন। যে কেহ তাঁহার সহিত বালিতে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তিনিই এ বিষয়ের সপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপক রাজা রাম মোহন রায়ের প্রতি অচলা ভক্তি। রাম মোহন রায়ের প্রতি তিনি কি কারণে শ্রদ্ধা করিতেন? প্রশ্ন করিলে, আমরা দত্ত মহাশয়ের লিপি হইতেই বিনা আয়াসে এই সদুত্তর প্রদান করিব, "ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন" জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত রামমোহন রায়ের গুণ কীর্ত্তন করেন। সেই প্রশংসা-বাদ দত্ত মহাশয়ের শেষাবস্থায় লিখিত হয়। তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। অক্ষয় বাবুর পরলোক গমনের পর মহানুভব রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩ নং মৃজাপুরষ্ট্রীটে সেই রচনা যখন পঠিত হইয়াছিল,তখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রাজার উপর দত্তজের কি অটল শ্রদ্ধা। দত্তজের জীবৎকালেও রাজার স্মরণার্থ সভায় উহা আরও একবার পঠিত হয়। রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলির প্রকাশক বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ও যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বি, এল্ মহাশয়েরাও রামমোহন রায়ের প্রতি দত্ত মহাশয়ের এই ভক্তি ভাবের প্রসঙ্গ রাজার শেষ গ্রন্থমধ্যে নির্দ্দেশ করাতে, বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্মে অক্ষয় বাবুর অশেষ অনুরাগ ছিল।†

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

হিন্দুসমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা (৭ম)

ধর্ম্ম।

মনুসংহিতা হিন্দুদিগের একখানি অতি প্রাচীনগ্রন্থ। ইহা যে সময় রচিত হয়, সে সময় বীর্য্যবন্ত আর্য্যকুল সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সকল স্থান অধিকার করিয়া তদুপরি আপনাদিগের অব্যাহত প্রভুত্ব বিস্তার পূর্ব্বক শান্তি ও নিরাপদে দিন দিন শ্রী ও সৌভাগ্য পদবীতে অধিরোহণ করিতেছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মনুসংহিতাকে হিন্দুসভ্যতার প্রথম যুগের ব্যবস্থাপক গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের

* অক্ষয় বাবুর কোন কোন বন্ধু কহেন, "দীর্ঘকাল দুরন্ত রোগভোগ, ঐরূপ মতপরিবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ।" তাঁহার জ্ঞান পূর্ব্বাপর সমভাবেই ছিল। অতএব ঐ কথা ঠিক নহে।

† ৫১২ পৃষ্ঠায়শেষার্দ্ধ ভাগের (2nd column) ২য় পঙ্ক্তিতে সর্ব্বশক্তিমান্ স্থলে সর্ব্বজ্ঞ হইবে।

উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, সর্ব্বপ্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা ইহা উৎপাদন করেন, তৎপরে তিনি নিজ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে ইহার শিক্ষা প্রদান করেন এবং তাহার পরে তিনি ভৃগু মরীচি প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে এই পরমশাস্ত্র শিক্ষা দেন এবং এইরূপে ইহা ক্রমে ক্রমে মানবমণ্ডলে প্রচারিত হয়। মনুসংহিতার আর একটী নাম মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র, ইহাতে বোধ হয় যে,এই সংহিতা-শাস্ত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নিরূপণের জন্য মানবমণ্ডলে প্রথম প্রচারিত হইয়াছে। বাস্তবিক রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও আশ্রমনীতি প্রভৃতি বহুবিধ অত্যাবশ্যকীয় হিতকর বিষয়ের ব্যবস্থাসঙ্কলন পক্ষে হিন্দুদিগের ইহা একখানি আদিগ্রন্থ তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদিও বৈদিকবিভাগের মধ্যে শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে আশ্রম ধর্ম্ম ও যাগযজ্ঞাদির ক্রিয়া কলাপ সমূহের ব্যবস্থা বিনিবদ্ধ হইয়াছে এবং যদিও সে সকল মনুসংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতর; তথাপি ভারতীয় সভ্যতার প্রথম বিধি-প্রবর্ত্তক বলিয়া হিন্দুগণ ইহাকে প্রথম স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হন না। কি বিষ্ণু, কি যাজ্ঞবল্ক্য, কি হারীত অন্যান্য সকল ধর্ম্ম প্রয়োজক পণ্ডিতদিগের প্রণীত সংহিতা অপেক্ষা মনুসংহিতা প্রাচীনতর, অথবা ইহা সকল সংহিতার অগ্রজস্বরূপ। সেই জন্য হিন্দুগণ ইহাকে সর্ব্বোপরি সম্মান দান করেন এবং সর্ব্বোপরি ইহার প্রভুত্বকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখন আমরা দেখিব হিন্দুদিগের এই পরমপূজ্য পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র কোন্ সময় রচিত হইয়াছে। মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে জানা যায় ইহার রচনাকালে আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যের সীমায় পদার্পণ করেন নাই। কারণ মনুসংহিতাতে বিন্ধ্যাচলকেই আর্য্যদিগের আবাসভূমির দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণ রচনার সময় ভারতের অর্দ্ধাংশস্বরূপ এই বিস্তৃত ভূভাগ তাঁহাদিগের নেত্রপথে পতিত হয়। এমন কি দক্ষিণাপথ-সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনাতেই রামায়ণের বহু স্থল পূর্ণ হইয়াছে। রামায়ণ রচনাকালে দক্ষিণাপথ নিবিড় অরণ্যমালায় পরিপূর্ণ ছিল এবং তন্মধ্যে অনার্য্যজাতিরা বাস করিত। যাহাহউক মহাভারত পুরাণাদি অপেক্ষা রামায়ণও যে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যখন মনুসংহিতার মধ্যে দক্ষিণাপথের উল্লেখ মাত্রও নাই, কিন্তু রামায়ণের মধ্যে তাহার উল্লেখ, তাহার ভূরি ভাগ পরিদর্শন এবং তৎসংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনার কথা লিপিবদ্ধ আছে, তখন মনুসংহিতাকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর কালের রচিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়া বলেন যে খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে রামায়ণ রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে মনুসংহিতাকে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর রচিত গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পৌত্তলিক-প্রণালী প্রচলনের পূর্ব্বেও এদেশে মূর্ত্তি পূজা প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দুধর্ম্মের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিলে তিনটী দেবতাকে অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পরমপূজ্য আসনে সমাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। সে তিনটী দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব। মূলে এই দেবতাত্রয় যদিও পৃথক পৃথক দেবতা নহেন, ভিন্ন দেহ

দেবাদিদেব পূর্ণ পরমেশ্বরের বিভিন্ন শক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র, তথাপি কল্পনাসুলভ মানব বুদ্ধির দ্বারা তাঁহারা এক এক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে আখ্যাত হইয়াছেন। কেন না শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে; যথা—

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ॥
স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণু পাল্যঞ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ। ২ অধ্যায়। ৬৩।৬৪।

অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই তিন কার্য্যের নিমিত্ত একমাত্র ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি স্রষ্টারূপে সৃষ্টি, পালকরূপে পালন এবং সংহর্ত্তা রূপে অন্তে সংহার করেন। সুতরাং স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইহাঁরা ভগবানের সৃজনী, সংহারিণী এবং পালনী এই শক্তিত্রয়ের নামান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কল্পনাপটু আর্য্যগণ ইঁহাদিগকে এক এক মূর্ত্তিতে পরিণত না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই। যে রূপেই হউক ব্রহ্মার দেবত্ব অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তৃত বক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মনুসংহিতাকার পূর্ব্বোক্ত ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মাকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মাকে স্থাবরজঙ্গমাদিসঙ্কলিত বিশ্বচরাচর এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মনুসংহিতা রচনাকালে ব্রহ্মার দেবত্ব এমন কি ঈশ্বরত্ব পদ বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন হয়ত অনেকের মনে প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, ব্রহ্মা কি তবে বিশ্ব-কারণ পরমেশ্বরের সৃজনী শক্তির মূর্ত্তিমান্ আকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে? ব্রহ্মার দেবত্ব পদের কি আর কোন অস্তিত্ব নাই।

হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা উৎপত্তি, কার্য্য, শক্তি এবং স্বরূপ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া বেদবর্ণিত একটি অতি সুপ্রসিদ্ধ প্রধান দেবতার সহিত ব্রহ্মার একত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। বেদবর্ণিত সেই প্রধান দেবতার নাম বিরাট পুরুষ। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের অন্তর্গত পুরুষ সূক্তে এই বিরাট পুরুষের অসীম মহিমা পক্ষে বহুতর স্তুতিকর রচনাবলী প্রকটিত হইয়াছে। এই বেদবর্ণিত বিরাট পুরুষের সহিত ব্রহ্মার অভেদত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে যে অনেক যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাবলী নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। যাহাহউক ব্রহ্মা বেদকীর্ত্তিত বিরাট পুরুষের সহিত অভিন্ন পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হউন, আর তিনি বিশ্বপতি পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষের মনঃকল্পিত মূর্ত্তিমন্ত দেবতাই হউন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র বাদানুবাদ না করিয়া আমরা তাঁহার দেবত্ব ও উপাসনার বিষয়ে দুই একটী কথা বলিতেছি। শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মার প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে, তখন বলা বাহুল্য যে বিষ্ণু ও শিবমূর্ত্তি পূজার বহুতর বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মার পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মনুসংহিতা যখন খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছে বলিয়া এইরূপ অনুমিত হয় এবং তন্মধ্যে যখন

ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব পক্ষে ভূয়সী মহিমাবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন তদ্রচনার পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই যে ব্রহ্মার পূজা প্রচলিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময় ব্রহ্মার পূজা যদিও তত বহুল পরিমাণে এমন কি কিছু পরিমাণেও দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপি পুরাকালে এদেশে যে ব্রহ্মার উপাসক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শঙ্করবিজয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থে হিরণ্যগর্ভোপাসক অর্থাৎ ব্রহ্মার উপাসকদিগের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। তাহারা চতুর্ম্মুখ কমণ্ডলু শ্মশ্রু প্রভৃতি চিহ্নধারী এইরূপ বর্ণনা আছে। তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের সময় অর্থাৎ অনুমান অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে পূর্ব্বোক্ত উপাসক সম্প্রদায়ের বিদ্যমানতা সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন আমাদিগের দেশে গৃহে অগ্নিসংযোগ হইলে লোকে ব্রহ্মার পূজা করিয়া থাকে। অতদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে মনুসংহিতা বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময় ব্রহ্মার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তৎপরে তাহার আরাধনা প্রচলিত হইয়া কিছুকাল প্রবল থাকে এবং ক্রমে তাহা বিলুপ্ত অবস্থায় পতিত হইয়া এখন হিন্দুদিগের দৃষ্টিপথে একেবারে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের বিস্তৃত ইতিহাসে ব্রহ্মার পর শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কত কাল বা কোন্ বিশেষ সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মার আরাধনা হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা কেহই নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন না। এবং বিষ্ণূপাসনা ও শিবোপাসনাই বা ঠিক কোন্ সময় হইতে আরব্ধ হইয়াছে তাহা বলাও একরূপ অসম্ভব। যাহা হউক শিবোপাসনা যে আমাদিগের প্রচলিত পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রণালী প্রচলনের বহুপূর্ব্বে প্রবলরূপে এদেশে বিদ্যমান ছিল তাহার পক্ষে বহুতর নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রামায়ণ একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ ইহা প্রচলিত পুরাণ উপপুরাণ সকল অপেক্ষা যে বহু পুরাতন তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বহু প্রাচীন রামায়ণের মধ্যে শিবপ্রসঙ্গ ও শিবমাহাত্ম্যের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের স্থানে স্থানেও শিবমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভুবনবিখ্যাত কবিকেশরী কালিদাস খৃষ্টীয় চতুর্থ ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা পণ্ডিতদিগের নিরূপণানুসারে একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তলা মেঘদূত এবং কুমারসম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থে শিবমাহাত্ম্য ও শিবার্চ্চনার কথা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অধিক কি শিবপার্ব্বতীর গুণকীর্ত্তন ও মহিমাবর্ণন উদ্দেশেই কুমারসম্ভবের একরূপ সৃষ্টি হইয়াছে। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় সুপণ্ডিত হিউয়েন্সাঙ্ ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার সেই সুবিস্তৃত পরমাশ্চর্য্য জ্ঞানগর্ভ ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে তিনি বারাণসী পর্য্যটন কালে অনেকগুলি শিবমূর্ত্তি ও শৈব সম্প্রদায়ী লোক দর্শন করেন। এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালীর উৎপত্তির বহু পূর্ব্বে ভারতক্ষেত্রের বহুল স্থানে শিবারাধনা প্রচলিত হইয়াছিল। যাহা হউক

বর্ত্তমান কালপ্রচলিত মূর্ত্তি-পূজা অপেক্ষা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্ত্তির পূজা বহু পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীনতর কালে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এখন সহজেই বুঝা যাইতেছে। কেবল শিবাদি ত্রিমূর্ত্তি কেন? দুর্গামূর্ত্তি-পূজা-প্রসঙ্গও বহুদিনের প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। হিউয়েন্থসাঙ্গের পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণ-বিবরণী মধ্যে এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি অযোধ্যা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আসিতে আসিতে পথি মধ্যে এক স্থানে এক দল দুর্গাভক্ত নরঘাতক দস্যুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েন। ঐ সকল দস্যুরা এই বিদেশীয় সুপণ্ডিত তীর্থযাত্রীকে উপাস্য দেবীর নিকট বলিদান দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। হিউয়েন্থসাঙ্গের ভারত-পরিভ্রমণকাল খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে সম্ভাবিত হইলে ঐ সময়ে দুর্গারাধনা প্রচলিত থাকার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীশদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ এরিয়ান নামক গ্রন্থকার ভারতের অনেকানেক বিষয় বর্ণনোপলক্ষে একস্থলে কুমারিকাস্থিত কুমারী নাম্নী একটি শক্তিমূর্ত্তির প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ দেবী মূর্ত্তির নাম হইতেই কন্যাকুমারী সংজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ দুর্গার অপর একটি নাম কুমারী বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা হইলে ঐ মূর্ত্তিকে দুর্গা-মূর্ত্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং এতদ্দ্বারা ঐ সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে দুর্গারাধনা প্রচলিত থাকার সম্ভাবনাও কথিত হইতেছে। দুর্গাদি মূর্ত্তি পূজাকে ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্যবংশীয়দের ধর্ম্মান্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিলে উপরিউক্ত সময়ে প্রচলিত থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় এবং তাহা যুক্তিযুক্তও বটে। বিশেষতঃ হিউয়েন্থসাঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্তোল্লিখিত দুর্গাভক্ত দস্যুদিগের প্রসঙ্গে দুর্গামূর্ত্তি পূজা যে অনার্য্যজাতীয় লোকদিগের ধর্ম, তাহা আরও সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কালের প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্ম-প্রণালীর অনেকাংশ আদিম অধিবাসী অসভ্যদিগের ধর্ম্মের উপাদানে গঠিত। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, সেই বহু পুরাতন কালপ্রতিষ্ঠিত দুর্গাদি মূর্ত্তির আরাধনাও বর্ত্তমান পৌত্তলিক-পদ্ধতিরূপ বিস্তৃত মন্দিরে অধিকার লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি মূর্ত্তির আরাধনা বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের বেগবান্ প্রচণ্ড প্রবাহের নিকটে এ সকল তাদৃশ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি স্থাপনে সমর্থ হয় নাই, অমনি জীবন্মৃতাবস্থায় হিন্দুধর্ম্মের বিদ্রাবিত কাননে অবস্থিতি করিতেছিল বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে যখন বিলুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্ম ভারতক্ষেত্রে সতেজে পুনরধিকার বিস্তার করিতে লাগিল, তখন সেই জীবন্মৃত শ্লথমূল বৃক্ষ সকল একে একে সতেজ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া হিন্দুদিগের ঝটিকা-বিলোড়িত শ্রীহীন ধর্ম্মোদ্যানকে পরিশোভিত করিতে লাগিল। অচিরে শিবাবতার স্বরূপ শঙ্করাচার্য্যের প্রতাপে শিবমাহাত্ম্য ও শিবারাধনা বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইতে লাগিল, নির্জীবকল্প শৈবধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইয়া বিশাল ভিত্তির

উপরে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিল। এইরূপে শৈবধর্ম্মের বহুল প্রচারের পর রামানুজ রামানন্দ প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা আবির্ভূত হইয়া বিষ্ণু-মাহাত্ম্য ও বিষ্ণূপাসনা প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। এইরূপে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরধিকার দ্বারা, সকল প্রকার মূর্ত্তি পূজার আধার স্বরূপ শৈব বৈষ্ণবাদি সকল ধর্ম্মের আশ্রয়ীভূত বর্ত্তমানকাল-প্রচলিত এই পৌত্তলিক পদ্ধতির উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয়লাভরূপ প্রকাণ্ড প্রবাহকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালীর একরূপ মূলস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিলে আমাদিগকে কিছুমাত্র অযুক্তি বা অসঙ্গতদোষে দূষিত হইতে হয় না।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গ-মহিলা।

(মথুরা।)

২৬এ ফেঃ প্রত্যুষেই আমরা সুন্দর আগ্রাপুরী পরিত্যাগ করিয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা করি।

আগ্রার গাড়ী ত্যাগ করিয়া আমরা যখন হাট্রাসে মথুরার ট্রেনে চড়িলাম, তখন উষার সুখময়ী মূর্ত্তি, তরুণ তপনের মধুর হাস্য পূর্ব্ব গগণ অনুরঞ্জিত করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আশার তরঙ্গ তুলিয়া দিল। সেই শোভা আবার প্রভাতিক বিহঙ্গের কলকণ্ঠ স্বরে আরো দ্বিগুণতর ঘনীভূত হইয়া যেন অভিনব প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে দীপ্তি পাইতে লাগিল। এমন শান্তিময় সুখ-প্রভাত দর্শন মনুষ্যের ভাগ্যে অতীব দুর্লভ। মথুরা যাইবার পথে বিস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্রে মৃগ শিশুগণ কোথায় বা নির্ভয়ে শুইয়া আছে, আবার কোথায় তাহারা চকিতে চাহিয়া, শব্দমাত্র শ্রবণে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই আছে এই নাই, কেমন মনোমোহন দৃশ্য! ইহা দেখিয়া অতীত কালের পবিত্র তপোবনের চিত্র মানসক্ষেত্রে সমুদিত হয়। জীবনের এ সুখস্বপ্ন, বাস্তবিক স্বপ্ন নহে। যিনি এ দৃশ্য, এমন প্রভাত কখন নয়ন ভরিয়া দেখেন নাই, তাঁহাকে আর কি বলিব? আমি জীবনের অনেক প্রকৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির মধ্যে এ স্মৃতিও হৃদয়ে সযত্নে রক্ষা করিব।

হাট্রাসে মথুরা যাইবার জন্য যে গাড়ীতে আরোহণ করিলাম, তাহাকে বাষ্পীয় শকট না বলিয়া গজেন্দ্রগামী বণিকপোত বলিলে ঠিক হয়। এই ট্রেণ কখন চলিবে, কখন থামিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন পথিকগণ ইচ্ছানুসারে তাহাতে উঠিতে লাগিল। কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না, করিলেও কথা গ্রাহ্য করিতে কেহ স্বীকৃত হয়

না। কোন নিয়মও নাই, যাহার যা ইচ্ছা সে তাই করে। ধুমপানের ধূমের ত সীমা নাই। তামাক খাইবার জন্য প্রায়ই গাড়ী থামান হইতে লাগিল। আরোহীগণ ইহাকে যেন স্বকীয় বাসভবন মনে করিয়া সেইরূপ ব্যবহার করিয়া নামা উঠা জল-যোগ ইত্যাদি করিতে করিতে চলিল। গরিব আমরা কেবল অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। ইহার পরিচালকগণ হিন্দুস্থানী। এ গাড়ীর সহিত ইংরাজ কি ফিরিঙ্গীর সহিত কিছুমাত্র সংস্রব নাই, সুতরাং দৌরাত্ম্য কি অপমান কাহাকেও সহ্য করিতে হইল না, তবে সেই মৃদু-মন্দবাহী গজেন্দ্র-গমন আমাদের খুব প্রীতিকর বোধ হয় নাই।

আমাদিগের গাড়ীর পার্শ্বস্থ কক্ষে কতকগুলি ইংরাজীনবিশ হিন্দুস্থানী উঠিয়াছিল। তাহাদিগের হাব, ভাব, কথাবার্ত্তা সমুদায়ই অদ্ভুত। এমন জন্তু বিশেষ মনুষ্য দর্শন আমার কপালে পূর্ব্বে বড় ঘটে নাই। আমি তাহাদিগকে কি বলিয়া ডাকিব, ঠিক করিতে পারি না। মনুষ্য যে এইরূপ ঘৃণার পাত্র হইতে পারে, ইহা দেখিয়া আমার মনে অনুকম্পারও উদয় হইল না। অন্য যাত্রীগণও প্রকাশ্য ভাষায় ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কলহের চেষ্টায় ছিল। তাহারা একটু ইংরাজী জানে, বোধ হইল বাঙ্গালাও আধ আধভাবে একটু আধটু কহিতে পারে। কিন্তু "little learning is a dangerous thing" এই প্রসিদ্ধ বাক্য তাহারা সপ্রমাণ করিয়া আরোহীদিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিল। আরোহীগণের সৌভাগ্যবশতঃ গাড়ী খানিক পথ যাইতে না যাইতেই এক জন বৃদ্ধ পরিব্রাজক পথিমধ্যে এই গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার পবিত্র সৌম্য মূর্ত্তি ও স্থির দৃষ্টিতে কেমন যেন অপার্থিব ভাব। সে স্নেহময়, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া প্রত্যেকেই ভক্তিভাবে তাঁহাকে অযাচিত অভিবাদন করিল। তিনিও হাস্যমুখে সংস্কৃত ভাষায় সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই বন্যব্যক্তিরা প্রথমে একটু পরিহাসের চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তাহাদিগের সে চেষ্টা সুবিধামত হইল না। জীবন্ত পবিত্রতা পাপীর হৃদয়েও পুণ্যের শান্তিবারি ঢালিয়া দেয়। সে হাস্যের হিঃ হিঃ বিকটশব্দ, বাক্যের চাতুরী, এবং পাণ্ডিত্য-প্রকাশক গর্ব্বিত ভাষা কোথায় যেন উড়িয়া গেল, অবিলম্বে সমস্ত নিস্তব্ধ শান্তিপ্রদ ভাব ধারণ করিল।

সচরাচর আমরা পথে ঘাটে যে সকল সন্ন্যাসী দেখিতে পাই, আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি সে রূপ সন্ন্যাসী নহেন। হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে প্রকৃত সন্ন্যাসি বলে, তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়া পরমার্থ চিন্তায় নির্ব্বাণ ধর্ম্মে এবং জ্ঞান বিতরণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। "সদম্মে বা কিদম্মে" তাঁহার সমান প্রীতি, "লোষ্ট" ও "কাঞ্চন," তাঁহার নিকট একরূপ। শীত প্রধান দেশে শরীর রক্ষার্থে ও লজ্জা নিবারণ করিতে পরমহংসের পক্ষে যে প্রকার গৈরিক বসন সাজে, তাঁহারও তাই ছিল। একখানি কম্বল এবং তাল পত্রের একটা ছত্র তাঁহার জীবনের প্রয়োজনীয় স্বরূপ সঙ্গে আছে, দেখিলাম। তিনি দ্বারকা হইতে মথুরায় জনৈক সন্ন্যাসীর মঠে শাস্ত্রীয় বিচারের মীমাংসার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া শিবাসহ যাইতেছেন, শুনিলাম।

সোঁ, সা, করিতে করিতে কোন প্রকারে চলিয়া থামিয়া, অতি কষ্টে আমাদিগের গাড়ী বেলা ১০ ঘটিকার সময় মথুরা আসিয়া পৌছিল, আমরাও সুপ্রসন্ন মনে নামিয়া নিস্তার পাইলাম।

রৌদ্র তখনি চারিদিকে চনচন করিতেছে, আমরাও সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং পরিশ্রান্ত। অশ্বযান সহরে প্রবেশ করিল, আমরা বাসা খুঁজিয়া লইবার জন্য এদিক ওদিক একটু করিতে লাগিলাম, বেশিক্ষণ কষ্ট পাইতে হইল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে বহুসংখ্যক পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগের গাড়ী ঘেরিয়া ধরিল এবং আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ পূর্ব্বে কেহ কখন মথুরা গিয়াছিলেন কিনা, তাহাই জনে জনে খাতা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অতগুলি লোকের পাতার নামাবলী শ্রবণ করিবার ধৈর্য্যবল ও সৌভাগ্য না থাকায়, তাহারা আমাদিগকে ক্রমে মুক্তি দিয়া চলিয়া গেল। কেবল তিনজন মাত্র পাণ্ডা আমাদের গাড়ীর বাহিরে চড়িয়া একটী অতি সুন্দর প্রস্তরের বাড়ীর সম্মুখে আনিয়া সেই বাটীতে বাসা স্থির করিয়া দিল। আমরা যমুনার নিকটে একটী বৃহৎ প্রশস্ত দ্বিতল বাটীর একদিক ভাড়া লইলাম; তার অন্যদিকে মথুরার মুনসেফ বাবু সপরিবারে ছিলেন। পাণ্ডাঠাকুরেরা আমাদিগের জন্য বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃত মিষ্টান্ন প্রভৃতি 'হিন্দুর আহারীয় সামগ্রী আনিয়া দিয়া, মাছ মাংস আনিতে নিষেধ করিয়া, তখনকার জন্য বিদায় হইলেন। তাহাদিগের মুখে গল্প শুনিলাম, কলিকাতা হইতে কয়েক জন ব্রাহ্ম নাকি মথুরায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন ও আমরা যে বাসায় ছিলাম, তাঁহারাও সেই খানে ছিলেন। কিন্তু গৃহস্বামীর অমতে স্বাধীনতা প্রকাশার্থে গোপনে অনেক মাছ মাংস ও পলাণ্ডু খাইয়াছিলেন। সেই সকল গৃহকোণে লুকাইয়া রাখাতে ধরা পড়িয়া শেষে অপমানিত হইয়া বাসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আরো অনেক শোচনীয় দুঃখের কথা আমাদিগের কাণে আসিল। কিন্তু তাহা বিশ্বাস না করিলেও তাঁহাদিগের ব্যবহারের জন্য আমাদিগের একটু কষ্ট পাইতে হয়। আমরা যেন, রুষভীত ইংরাজ-রাজ্যে ছদ্মবেশী গুপ্তচরবৎ সন্দেহের ছায়ায় "নজরবন্দী" পাহারায় রহিলাম।

মথুরার পাণ্ডাগণের আত্ম-পরিচয়ের রহস্য সহসা ভেদ করা কঠিন। তাহারা যাত্রীগণের নিকট আসিয়া বলে "আমরা সাড়ে চারিভাই" কেহ বা "আড়াই" "দেড় ভাই"। ইহা না বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারা যায় না। অন্ততঃ, আমরাত "সাধু সাধু সাড়ে পাঁচ ভাই" বুঝিতে পারি নাই। কাজেই ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়। অবিবাহিত ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, সুতরাং যে ভাইরা বিবাহিত তাহারা পূর্ণ ও তাহাদিগের মধ্যে যাহার বিবাহ হয় নাই, সে অর্দ্ধেক। আমাদিগের ভাগ্যে "সাড়ে পাঁচ ভাই" জুটিয়াছিল। এই অর্দ্ধাঙ্গটী বড় সুশীল, মিষ্টভাষী ও প্রিয়দর্শন। তাহাকে ধনীর গৃহের যত্ন-পালিত বালক বলিয়া বোধ হয়। সংসারের কোন চিন্তা নাই, লেখা পড়ারও ধার ধারে না, "লাড্ডু পুরী" মিষ্টান্ন পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া স্বচ্ছন্দে বেড়াইয়া বেড়ায়। তবে বাঙ্গালী বালকের সহিত ইহার শারীরিক বিভিন্নতা অনেক,

তাহাদের মত, ইহারা রুগ্ন দুর্ব্বল ও ম্যালেরীয় প্রপীড়িত নহে। ইহারা প্রত্যহ নিয়মমত দুইবেলা ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া থাকে। কুস্তীর "আড্ডা" আছে, সেখানে অধিক কাল অতিবাহিত করে এবং কুস্তীতে সুশিক্ষিত হইলে কখন কখন গোয়ালিয়ার হোলকার প্রভৃতি মহারাজ সদনে আত্মবলের পরিচয় দিয়া সম্মানের সহিত পুরস্কার লইয়া আইসে।

মথুরা দেখিতে বড় পরিপাটী। পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও কোন স্থানে ময়লা নাই। কংসরাজ-রাজধানী মথুরা, ঠিক রাজধানীরই মত সুন্দর। মথুরায় কেমন একটী শান্তিময় শোভা ও নির্জ্জনতা দেখিলাম, ইহা আমার মনের সঙ্গে ঐক্যতানে নীরবে মিলিয়া গিয়াছিল। আমি মথুরা গিয়া কেমন যেন এক স্মৃতি-স্বপ্নে ডুবিয়া গিয়াছিলাম, কেবল মুক্ত গবাক্ষে দাঁড়াইয়া চারিদিকের শোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিতাম,এবং যমুনার কল কলনাদে আমার স্মৃতিমগ্ন হৃদয় ঘুমাইয়া যাইত। কল্পনায়, স্মৃতিতে, ও আশার চিন্তাতে দিন কাটাইতাম, প্রবাসের শূন্যতা তত অনুভব করি নাই। মথুরাবাসী স্ত্রী পুরুষগণ প্রায়ই গৌরাঙ্গ ও সুস্থ। তাহাদিগের শিশু-সন্তানগুলি এমন সুশ্রী এবং সবল যে, দেখিলেই সাদরে কোলে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করে। পাণ্ডাদিগের সুন্দর সুন্দর বালকগণ পরিষ্কার পরিচ্ছদে দেবালয়ের পথে পথে দাঁড়াইয়া, আধ আধ ভাঙ্গা বাঙ্গালা ভাষায় "দাদা দিদি" বলিয়া ডাকিয়া যখন সামান্য পয়সা ভিক্ষা চাহে, তাহাতে কেমন মায়া হয় ও কিছু না দিয়া থাকা যায় না। একটী স্বর্ণ মুদ্রায় লোকের যত আহ্লাদ না হয়, একটা পয়সা মাত্র পাইলে ইহারা ততোধিক আনন্দিত হইয়া থাকে। 'ব্রজবাসী' মধুর কণ্ঠে গাইয়া এবং যাত্রীগণের সম্মুখে করতালি দিয়া যে নৃত্য করে, তাহা দেখিতে আমোদ আছে।

ধনবান ব্যক্তি পুত্রহীন হইলে, সকল দেশেই পোষ্যপুত্র রাখিবার নিয়ম আছে, কিন্তু বাঙ্গালীগণ যেরূপ দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী, তাহাদিগের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সংস্কার করা আবশ্যক। এই সকল ব্রাহ্মণ বালকগণকে নিঃসন্তান ধনী বাঙ্গালীরা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া সুশিক্ষিত করিলে, ও প্রাপ্তবয়সে বাঙ্গালী বালিকাদিগের সঙ্গে বিবাহ দিলে সময়ে বেশ বলবান ও স্বাস্থ্যপূর্ণ সন্তান জন্মিতে পারে, এবং তাহাতে খুব উপকার হইবার সম্ভাবনা। সমাজ-সংস্কারকগণ এই বিষয়ে চেষ্টা করিলেও সমাজের পক্ষে একটী স্থায়ী উপকার করিতে পারেন। বাল্যবিবাহ উঠাইলে, ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিলে যেমন সামাজিক মঙ্গল, তেমনি বঙ্গবাসীর স্বাস্থ্য সংস্কার এইরূপে করিতে পারিলেও উপকার আছে। আমাদিগের সমাজে অদ্যাপি রাঢ়ী বারেন্দ্রর মধ্যে পর্য্যন্ত বিবাহপ্রথা প্রচলিত না থাকাতে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের যে কত কষ্ট সহিতে হয়, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাহাতে আবার পাশকরা ছেলের উৎপাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। আমাদিগের দেশহিতৈষীগণ এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি কেন মনোযোগ দেন না, তাহা দুঃখের সহিত বুঝিতে পারি না। কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে সামাজিক অশেষ দুর্গতি যাইবে না। আর সমাজ-সংস্কারক মহাশয়েরাও অসবর্ণ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য এত চিন্তা ও যত্ন না করিয়া অগ্রে সবর্ণে

সবর্ণে ঐপ্রকার বিবাহ দিবার চেষ্টা ও আন্দোলন করিলে সামাজিক কল্যাণ সাধন করা হয়।

মথুরায় অনেক বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন ও তাঁহাদের সহবাসে পাণ্ডাগণ বেশ "চলন সই" এক রকম বাঙ্গালা কথা কহিতে শিখিয়াছে। তাহাদিগের সে আধভাঙ্গা বাঙ্গালা আমার নিকট ভাল লাগিত। আহারাদি করিয়া আমরা সেই দিন বৈকালেই মথুরার বিগ্রহগণ দর্শন করিতে বাহির হইলাম। মথুরায় বেশ গাড়ী পাওয়া যায়, তবে তাহার ভাড়া কিছু অধিক। বাসা ছাড়িয়া প্রথমে আমরা "কংসখেড়া" ও "রণভূম্" দেখিতে গেলাম। এক পাণ্ডা আমাদিগের সহিত থাকিয়া "গাইডের" কাজ করিতে লাগিল। প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে যখন মথুরাতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করা হয়, কিন্তু বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ, সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া সম্মুখ-যুদ্ধে কংসরাজকে বিনাশ করিলেন এবং পরিশেষে স্বয়ং মথুরার রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই সমরাঙ্গণের নাম "রণভূম্"। অতি ছোট একটু জমী, চারিদিকে ছোট ছোট গাছ, চারিজন লোক একত্র হইলে তাহা পূর্ণ হইয়া যায়। কোন কালে সেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহা কেহ না বলিয়া দিলে কল্পনাতেও অনুমান করা যাইতে পারে না। "গলিভার ভ্রমণে" "লীলিপুটীয়ানদিগের" যেরূপ অদ্ভুত যুদ্ধ কাহিনী আছে, এও বোধ হয় সেইরূপ যুদ্ধ এবং রণভূমি। আবার এই যুদ্ধক্ষেত্রে এক ভগ্নমন্দিরে চোক মুখ বিশিষ্ট এক মহাদেব মূর্ত্তি আছেন। অত্যাচারী কংসরাজা সমরে নিধন প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া রণক্ষেত্রের মধ্য হইতে সহসা এক শিব আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে উঠিয়াছিলেন ও তাহাতেই তাঁহার নাম—"রঙ্গেশ্বর মহাদেও" শুনিলাম।

কংসরাজ রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ও গড়খাই দেখিলে, অদ্যাপি রাজকীয় সম্পদের চিহ্ন রহিয়াছে, দর্শকের মনে হয়। এই ভগ্নরাশির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র মন্দির সজীবভাবে দণ্ডায়মান আছে; তাহা অতীতের হিন্দু মহিলার পবিত্রতার নিদর্শন। প্রবাদ এই যে, এই "সতীমঠে" কংসের মহিষী বাস করিতেন এবং তিনি এই মন্দিরেই পতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন ও স্বামীর চিতায় একত্র ভস্মীভূত হন। সেই জন্য তাহার সতীত্বের পবিত্র চিহ্নস্বরূপ এই মঠ, "সতীমঠ" নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে ও ধনকুবের জগৎ শেঠরা তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার করাইয়া যান। তাহাতেই আজিও "সতীমঠ" নূতন অবস্থায় রহিয়াছে যেন বোধ হয়। এই গল্প আমরা পাণ্ডাঠাকুরদিগের মুখে শুনিয়াছি, ও তাহা সত্য কিনা, সে বিষয় অনুসন্ধান করিবার কোন চেষ্টা করার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। ভাল গল্প, ভাল লাগিল সুতরাং লিখিলাম। ভারতীয় রত্নভাণ্ডারে কত কীর্ত্তিময়ী মহিলার ঐরূপ পবিত্র জীবন-কাহিনী লুকায়িত আছে, তাহার খোঁজ কে করিবে? ইতিহাসহীন ভারতের পূর্ব্ব গৌরব এখন হয়ত বিদেশীর নিকট মূল্য শূন্য উপকথা; কিন্তু আমাদের কাছে তাহা নহে।

প্রভাত সায়াহ্নে "মথুরাবাসিনী মধুর হাসিনী শ্যামবিলাসিনী'রা নানা বর্ণের বিচিত্র বসন পরিয়া পুষ্পমালা হস্তে দেবদর্শনে যায়। তাহাদিগের অবগুণ্ঠনাবৃত সৌন্দর্য্যরাশি মুগ্ধ ভাবে দর্শন করা যদিও প্রবাসীর ভাগ্যে সকল সময় ঘটিয়া উঠে না, তবুও যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে তাহারা যে সুন্দরী, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মে নাই। সাধারণতঃ তাহারা গৌরাঙ্গিনী এবং তাহাদিগের মুখশ্রী বেশ জ্যোতির্ম্ময়। তবে পশ্চিমাঞ্চলের মহিলাগণ প্রায়ই সুকেশিনী নহে। বঙ্গনারীর সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ তাহাদিগের নিকট উপাদেয় এবং হিংসনীয় সামগ্রী। পাণ্ডাগণের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে "মথুরাবাসিনীরা" নাকি গৃহকার্য্য করে না, এবং নব্য বঙ্গরমণীর ন্যায় "ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাঠ পড়া" শিখিয়া অসার আমোদে ও তাসক্রীড়ায় এবং আলস্যে জীবন কাটায়। বঙ্গের নব্যগণ কোনরূপ ধর্ম্মকর্ম্মও করে না, কিন্তু ইহারা দুই বেলা "মথুরানাথ" দর্শন না করিয়া জলগ্রহণ করে না, এই প্রভেদ।

আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মথুরার চারিদিকে দেখিয়া আরতির একটু আগে "মথুরানাথ" দর্শনার্থে তাঁহার মন্দিরে গেলাম। কিন্তু তখনি সেই প্রকাণ্ড দেবালয় জন কোলাহলে এবং মনুষ্যমস্তকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, একটু দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। লোক ঠেলিয়া সেই গোলে মিশিয়া বিগ্রহ দর্শন করা তৎকালে ঘটিল না। কোনরূপে পাণ্ডা ঠাকুরদিগের সাহায্যে সংকীর্ত্তন প্রাঙ্গণে আমরা নিরাপদে একটু আশ্রয় পাইলাম।

দেখিতে দেখিতে দীপালোকে মন্দির দিবাবৎ উজ্জল হইয়া উঠিল। গায়কগণ মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই অবিশ্রান্ত কোলাহল থামিয়া সকল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। সেই অসংখ্য প্রাণী বৃন্দ একেবারে নীরবে ভক্তিভাবে হরিপ্রেমে নিমগ্ন হইয়া স্তব করিতে লাগিল। আর কোন শব্দ নাই, প্রতিধ্বনিও সেই সান্ধ্যসঙ্গীতে মিশিয়া কোথায় গেল, তাহা কে বলিবে। সহসা এই নিস্তব্ধতা ভেদ করিতে বায়ু পর্য্যন্ত সাহসী নহে, সেও আর সে দিকে বহিতে না পারিয়া, হরিগুণে মজিয়া মথুরার দ্বারে দ্বারে পবিত্র গান গাইয়া যেন বেড়াইতে লাগিল। এই অপরূপ দৃশ্যে, এই প্রাণপূর্ণ ভক্তিভাবে ও অলৌকিক সংকীর্ত্তন শ্রবণে আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এমন ভক্তিভাব, এমন মোহময় আত্মবিস্মৃতি!—প্রতিদিন মথুরানাথের মন্দিরে আসিয়া যাঁহারা ইহা দেখিয়া যান, তাঁহাদের নিকট ইহা কল্পনায় অনুভব করিবার সামগ্রী নহে। এইরূপ পবিত্র মনোহর কীর্ত্তন আমিত কখনও শুনি নাই। বৈষ্ণবদিগের তখনকার সেই আনন্দময় ভক্তিপূর্ণ উৎসাহ দেখিলে মনে শান্তির উদয় হয়। জগতে চৈতন্যের পবিত্র ধর্ম্ম, পতিতের আশ্রয় ও পাপীর মুক্তি। সময় ও অবস্থার পীড়নে তাহার সে পবিত্রতা নাই। তথাপি এইআরতির সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে ক্ষণকালের জন্যও পতিত জনের মনে পরকালের কথা উদিত হয় এবং হরিনামের মোহে ইহ সংসার ভাসিয়া যায়। এমন ঈশ্বরগান শুনিলে, আমার বোধ হয়, অধম মনুষ্যজীবন তরিয়া যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে

স্থানে জাহ্নবী সৈকতে শুইয়া যিনি ভক্তি-ভাবে এইরূপ হরিসংকীর্ত্তন শুনিয়া মরিতে পারেন, তাঁর আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

আমরা এখান হইতে আবার "বিশ্রাম ঘাটের" আরতি দেখিতে গিয়া আর এক ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যে ডুবিয়া গেলাম। এই "বিশ্রামঘাটে" শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিয়া "বাঁশী" ও "মোহনচূড়া" রাখিয়া যান এবং সেই জন্য ইহাকে "বিশ্রামঘাট" বলে। এইখানে শত সহস্র ব্যক্তি যুক্ত করে মুদ্রিত নয়নে দাঁড়াইয়া "জয় জয়" শব্দে নিশীথ নীলাম্বর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। রাশি রাশি সুরভিময় কুসুমহার চারিদিক হইতে জলধারার ন্যায় বর্ষিত হইতেছে, শাঁক ঘণ্টা এবং বাঁশির রবে যমুনার হৃদ-দেশও যেন কম্পিত তরঙ্গ উঠিয়াছে। আর কিছু দেখা যায় না, কেবল লোকা-রণ্য, তাহার মধ্যে শান্তিরক্ষকের গভীর মুখ। প্রতি সন্ধ্যায় তাহারা নিয়মমত "বিশ্রামঘাটে" আসিয়া থাকে, নতুবা গোল থামাইয়া যাত্রীগণের ও দর্শকের জীবন রক্ষা করা সুকঠিন ব্যাপার।

"বিশ্রামঘাটের" আরতিতে একটু নূতনত্ব আছে। একজন অতি বলবান্ ব্রাহ্মণ উজ্জ্বা-লিত সহস্র দীপাধার প্রথমে হস্তে লইয়া তারপর বক্ষে তুলিয়া, এবং পরিশেষে মস্তকে করিয়া আরতি করেন। তাহার কৌশলময় আরতি সকলেই মুগ্ধবৎ নেত্রে দেখিয়া ধন্য ধন্য করে। সেই ব্যক্তি এতই লম্বা যে, তাঁর মস্তক এত লোকের মাঝেও প্রত্যক্ষ রূপে দেখা যায়।

"বিশ্রামঘাটে" আরতির সময় পুষ্প বিক্রেতা রমণীরা ফুলমালা ও দীপ লইয়া সারি সারি বসিয়া থাকে। তাহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে তাহাদিগের মধ্যে রূপে কেহ বঙ্কিম বাবুর "রজনী" কিম্বা লর্ডলিটনের "নিডিয়া"র মত না থাকিলেও তাহারা যে প্রায় সকলেই দেখিতে ভাল তাহা আমি বলিব। কেমন পবিত্রমাখা কোমল মুখে তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত শোভা-ময় দীপালোকে বসিয়া সলজ্জভাবে যাত্রী-গণকে ডাকিয়া মালাফুল লইতে বলে। সেস্বরে মায়া আছে, ব্যবসার চাতুরী নাই। সে কণ্ঠ কোমলতায় পরিপূর্ণ, বিক্রেতার কপটতা তাহারা যেন জানে না। ফুলমালা স্ত্রী-পুরুষে সকলেই ক্রয় করে, কিন্তু প্রদীপ কেবল স্ত্রীলোকেরাই কিনিয়া প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় যমুনাবক্ষে ভাসাইয়া দেয়। যাহার শুভ উদ্দেশ্যে তাহা ভাসান হয়, দীপ ডুবিয়া গেলে তাহার সমূহ অমঙ্গল। আর তাহা ভাসিতে ভাসিতে দূরে গিয়া অদৃশ্য হইলে কোন অশুভ নাই। আমি কোন দীপ নিমগ্ন হইতে দেখি নাই। নীল যমু-নার বক্ষে সেই অসংখ্য দীপমালা যখন ভাসিয়া যায় এবং মৃদুল বায়ুভরে একটু নিবু নিবু হইয়া আবার তখনি জ্বলিয়া উঠে, সে শোভা অপূর্ব্ব ও অপার্থিব। তাহা একবার মাত্র দেখিলে মনুষ্য ইহ জীবনে কখন আর ভুলিতে পারিবে না। আমি যখন অতি ছোট ছিলাম, সেই সময় একখানি সংবাদ পত্রে একজন ইংরাজ ভ্রমণকারীর একখানি পত্র (বাঙ্গালা অনু-বাদ) পড়িয়াছিলাম, তাহাতে যমুনার ঘাটের এই দীপ ভাসাইবার বর্ণনা ছিল এবং তাহা এমন সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছিল যে, আজ কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তবু আমার সেই শৈশবের স্মৃতি অদ্যাপি সঞ্জীবিত রহিয়াছে। আমি নিজে তাহা

স্বচক্ষে না দেখিলেও লিখিবার সময় কল্পনার সাহায্যে সে দৃশ্য এইরূপই অনুভব করিতে পারিতাম, বোধ হয়।

এদিকে আরতির শোভা, আবার অন্য দিকে যমুনার বক্ষে অযুতদীপালোকের উজ্জ্বলতা ও তটভূমে মনুষ্য হস্তে এই সকলের শোভা; এই সকল দৃশ্য একত্র অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসে এবং আশা-নৈরাশ্য কেমন যে হইয়া গেল, তাহা বলিতে পারি না। যমুনাতীর ছাড়িয়া রাত্রে বাসায় আসিলাম, কিন্তু তখন সকলই আঁধার হইয়া গেল, এখন আর কিছু স্মরণ নাই। মনুষ্যের প্রাণের উপর দিয়া যুগ যুগান্তর বহিয়া যায়, তথাপি স্মৃতি জাগরিত রহিয়া অতীতের সমুদায় স্বপ্নবৎ স্মরণ করাইয়া কখন কখন মন শান্তনা করে। আমার জীবনের অন্য অনেক প্রিয় স্মৃতির মধ্যে এই ভ্রমণের স্মৃতি আর একটী প্রিয় সামগ্রী।

শ্রীমতী নীহারিকা দেবী।

বীর-কাহিনী।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষণজন্মা লুই কস্থথের প্রাণ-গত যত্ন ও উত্তেজনায় হঙ্গেরির স্বাধীনতা-সমর বিঘোষিত হইলে তাঁহার এক প্রিয় অনুচরের স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমে আত্মোৎসর্গ সন্দর্শনে সমগ্র ইয়ুরোপ বিস্মিত হইয়াছিল। যে মহাসমরে বল-দর্পী, পরাক্রমশালী, ও যথেচ্ছাচারী অষ্ট্রিয়া ভীত, কম্পিত ও বিড়ম্বিত হইয়াছিল, সেই মহাযুদ্ধে এই মহাবীর কস্থথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, ইঁহার নাম আজিও ইয়ুরোপীয় ইতিহাস গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। যদি এইরূপ অসাধারণ হৃদয়বান ও অদ্ভুত বীর-গর্ব্ব-সম্পন্ন মহাত্মার গুণ গরীমায় অমর ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত না হইবে, তবে আর কোন বিষয় উহাতে স্থান পাইবে? স্বদেশের পবিত্র ললাট হইতে দুর্গন্ধময় কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষালন এবং স্বজাতির কল্যাণ-সাধন-কামনায় পবিত্র মন্ত্রগ্রহণ, মন্ত্রগোপন ও মন্ত্রসাধনার্থ আত্মপ্রাণ বলিস্বরূপ উৎসর্গ করিয়া হৃদয়ের মহান শৌর্য্য প্রদর্শনে তিনি বীর-জগতে অমরত্বলাভ করিয়াছেন। অতি অল্পদিন হইল, এই মহাত্মা বুডা পেস্থ (Buda Pesth) নগরের একটি অনাথ-আশ্রমে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে ইঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইঁহার মহান্ উদ্দেশ্যপূর্ণ ও প্রকৃত কার্য্যময় জীবনের যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই প্রিয় পাঠক-সমাজে সাদরে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই বীরপুরুষের নাম ফেরেঙ্স্ রেনিও (Ferencz Renyi)। ইঁহার পিতা মাতার তাদৃশ উন্নতির অবস্থা ছিল না; কিন্তু তাঁহারা উভয়েই সুশিক্ষিত ও ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। ইঁহাদের আদর্শে পুত্র বাল্যকাল হইতেই সুবোধ, সচ্চরিত্র, উৎসাহী, পরিশ্রমশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং

অল্পবয়সেই সুশিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিলেন। বাল্যে বিদ্যা উপার্জ্জন ও চরিত্র সংগঠন পক্ষে তিনি তাঁহার উন্নতমনা স্নেহময়ী জননীর নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ মহৎ লোকেই আপন আপন জননীর উন্নত চরিত্রের সমুজ্জল আদর্শে স্ব স্ব চরিত্র নিয়মিত করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইতে না হইতেই ফেরেঙ্‌সের পিতা পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার জননী তাঁহাকে এবং তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনীকে লইয়া অতি কষ্টের অবস্থায় পতিত হইলেন, কিন্তু বুদ্ধিমতী ও পরিণামদর্শী মাতার পরিমিত ব্যয় ও কার্য্যদক্ষতা গুণে তাঁহাদের অর্থের অনাটন প্রবল হইতে পারে নাই। তাঁহাদের যে আয় ছিল, তাহাতেই কোনরূপে পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, কিন্তু ফেরেঙ্‌সের উচ্চ শিক্ষা লাভের আর সুবিধা ঘটিয়া উঠিল না; সুতরাং অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ হইল। অনন্তর অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্থানীয় একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

তিনি যেমন বলিষ্ঠ ও সুশ্রী ছিলেন, তেমনই উদ্যম-শীল ও সদা-প্রফুল্ল ছিলেন। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য নিহিত ছিল। বিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি বহুল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠের অবসর পাইয়াছিলেন। মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত ও ইতিহাস পাঠে তাঁহার অধিকাংশ সময় নিয়োজিত হইত। এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয় স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমে পূর্ণমাত্রায় সুশোভিত হইয়াছিল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার হৃদয়ের চারুশোভা ও চরিত্রের মধুরতায় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং ছাত্রবর্গের প্রীতি, সম্মান, ও ভালবাসা অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার তেজোপূর্ণ প্রফুল্ল-মুখ-জ্যোতি অবলোকনে দর্শক মাত্রেরই মনে প্রবল উৎসাহ ও অনুরাগ জন্মিত। তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার কার্য্য-নিপুণতা, সুশিক্ষা-দান-প্রণালী ও সদ্ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, এবং তাঁহার বন্ধু ও পরিচিত স্বদেশবাসীগণ তাঁহার সরলতা ও সৌজন্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সহিত সম্মান করিতেন। যখন তিনি তাঁহার ছাত্রগণের সম্মুখে কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, যখন তিনি তাঁহার সমবয়স্ক এবং বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া কোন নির্দ্দোষ আমোদে রত হইতেন, যখন তিনি তাঁহার সাধের বীণাযন্ত্রে সুমধুর স্বর সংযোজনে ও সেই সুরে স্বীয় সুললিত কণ্ঠ-স্বর মিলাইয়া স্বদেশের গুণ গান করিতেন, এবং যখন তিনি তাঁহার স্বদেশানুরাগী ভ্রাতৃগণের সহিত কোন প্রকাশ্য সভাস্থলে মিলিত হইয়া তেজস্বিনী বক্তৃতায় স্বদেশের স্বাধীনতা ও স্বজাতীর গৌরব কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয়ের অপ্রতিহত উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন শত শত হৃদয় মন্ত্র-মুগ্ধবৎ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত—শত শত চক্ষু তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলের প্রতি নির্নিমেষ চাহিয়া থাকিত, এবং বক্তৃতা শেষ হইলে শত শত সুশিক্ষিত নরনারী অন্তরের সহিত তাঁহার দীর্ঘায়ু ও

সুযশ কামনা করিতে করিতে তাঁহার কর-স্পর্শ সুখ অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন।

ফেরেঙস্ তাঁহার সংসারের প্রধান অবলম্বন, স্নেহময়ী জননী ও সহোদরাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। একটি পরম রূপ-লাবণ্যবতী সুশোভনা রমণী তাঁহার সুকোমল হৃদয়ের গভীর অনুরাগ ও প্রণয় অধিকার করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য ও সরলতার প্রতিমা রূপিণী এই প্রেমময়ী ললনা তাঁহাকে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে সমুচিত ভক্তি ও সম্মানের সহিত ভাল বাসিতেন। তিনি এক দিন সুখ-শান্তির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তি-চক্রের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে পিতা, মাতা এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধন-সম্পত্তি হারাইয়া একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ঘটনা ক্রমে রেনিএর নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার ও তৎসঙ্গে তাঁহার উদার হৃদয় ও উন্নত মনের পরিচয় পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি আত্ম-হারা হইয়া লোক চক্ষুর অগোচরে তাঁহাকে আপনার হৃদয়টি দান করিয়া ফেলিলেন। মঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতার যে অত্যাশ্চর্য্য বিধানে কালিদাসের মনোরমা শকুন্তলা দুষ্মন্তের পরিচয়ে ও মধুর আলাপে পরিতৃপ্ত হইয়া আত্ম-হারা হইয়াছিলেন, এবং যে বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া সেক্ষপিয়রের আশ্চর্য্য সৃষ্টি মধুরতাময়ী মিরন্দা তুফান-সন্তাড়িত তরণী-বক্ষে কম-কান্তি ফার্ডি-ন্যাণ্ড্‌কে দেখিবামাত্রই তাঁহার কল্পনার জগতে একমাত্র ফার্ডিন্যাণ্ডের মধুময় সত্তা অনুভব করিবারই বিবশা হইয়াছিলেন, সেই গভীর রহস্যময় বিধানের সম্মোহন প্রভাবে রেনিএর ভবিষ্য প্রণয়িণী তাঁহার পরিচয় লাভ মাত্রই আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিলেন। বিমুগ্ধা রমণী প্রায় এক বৎসরকাল আপনার প্রাণের বাসনা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; ক্রমে যখন পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টতা বাড়িতে লাগিল এবং রেনিএর ভালবাসার গভীরতার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, তখন এক দিন তিনি ভয়ে ভয়ে, লজ্জাবনত মুখে, সঙ্কোচ-দুর্ব্বলতা জড়িত-কণ্ঠে তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি অনুগ্রহ পুরঃসর তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন, তাহা হইলে তিনি কৃতার্থ হইবেন! রেনিএ অনেক দিন হইতে তাঁহার প্রণয়িণীর মুখ হইতে এই প্রস্তাব শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; এখন এই প্রস্তাবে তিনি একান্ত পুলকিত হইয়া প্রগাঢ় অনুরাগ ভরে তাঁহার সুকোমল করচুম্বন করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে ভিন্ন অপর কোন রমণীর ভালবাসা হৃদয়ে স্থান দিবেন না। অনন্তর দিন দিন ইহাঁদের উভয়ের প্রতি উভয়ের বিশ্বাস, অনুরাগ ও ভালবাসা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রেনিএর জননী ও ভগিনী আনন্দের সহিত তাঁহাদের বিহারের অনুমোদন করিলেন।

১৮৪৮খৃঃ অব্দে যখন হঙ্গেরির স্বাধীনতা-প্রিয় বীর সন্তানগণ স্বদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে অষ্ট্রিয়ার কঠোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে আহ্বান করিলেন, তখন রেনি-এর বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর মাত্র। ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রিয়ার হৃদয়-বিহীন নিষ্ঠুর কর্ম্মচারীগণের কলঙ্কিত হস্তে স্বদেশের শত শত প্রিয় সর্ব্ব-

দেশ অশেষ দুর্গতি এবং ক্ষীণ-প্রাণা ললনাগণের লাঞ্ছনা দৃষ্টে কতবার তাঁহার কোমল হৃদয় নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিল,—কতবার নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া করযোড়ে সকাতরে বলিয়াছিলেন,—"ভগবান, তোমার মঙ্গলময় রাজ্যে প্রবলের পদতলে বিদলিত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার জন্যই কি দুর্ব্বলের সৃষ্টি হইয়াছে? মানব জীবনের এই ঘৃণিত বৈষম্য-ভাব কখনই তোমার অনুমোদিত হইতে পারে না। আর কত দিন স্বদেশের এরূপ অবনতি ও স্বজাতির এমন দুর্গতি চক্ষে দেখিব? কত দিনে এ হৃদয়-ভেদী দুর্দ্দিন অস্তমিত হইবে? কতদিনে স্বদেশের প্রিয় সন্তানগণ স্বাধীনতা অথবা স্বর্গসুখের অমৃতাস্বাদে জাতীয় ইতিহাসে অমরতা লাভ করিবে?" আজি হঙ্গেরির স্বাধীনতা ঘোষণ ও স্বাধীনতা-সমরবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার হৃদয় আনন্দের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল ও উদাস হইয়া উঠিল। আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন স্বদেশের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। স্বদেশপ্রেমিক বীর ভ্রাতৃগণকে স্বদেশ-উদ্ধারব্রতে বদ্ধপরিকর ও যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত দেখিয়া তাঁহার অন্তর অস্থির হইয়া উঠিল। অনতিবিলম্বে তিনিও স্বীয় ভবিষ্য জীবনের লক্ষ্য স্থির করিলেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়া বীরবেশে সজ্জিত হইলেন—পবিত্র ঈশ্বরের নাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমির পদতলে জীবনের সুখ-শান্তি উৎসর্গ করিলেন। দিন দিন তাঁহার দল বাড়িতে লাগিল—দিন দিন তাঁহার যশ চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল।

একদিন তিনি তাঁহার অধীনস্থ ভলণ্টিয়র সৈন্যগণের নেতা হইয়া একটি যুদ্ধে প্রভূত পরাক্রম ও অদ্ভুত রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন, এমন সময় কতিপয় স্বদেশদ্রোহী নর-পিশাচের বিশ্বাস ঘাতকতায় তিনি ও তাঁহার কতিপয় বিশ্বাসী অনুচর-বন্দী হইলেন। তিনি ও তাঁহার অনুচর বর্গ শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া অষ্ট্রিয় সেনাপতি এনোর (Haynau) সমক্ষে নীত হইলে, বিজয়োৎফুল্ল সেনাপতি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"স্বদেশানুরাগী বীর, আমি এই যুদ্ধে তোমার সাহস, পরাক্রম ও বীরত্ব দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি যদি তোমার দলকে পরিত্যাগ কর, তোমার অবশিষ্ট অনুচরবর্গ কোথায় কিভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদের নাম কি, তাহা প্রকাশ কর, এবং যদি তুমি শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কখনও তাহাদের কোন কার্য্যে উৎসাহ দান করিবে না, তাহা হইলে আমি তোমার এই গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত আছি। আমার অনুরোধে এই দণ্ডেই তুমি রাজদরবারে উচ্চপদ ও রাজসম্মান লাভ করিবে—সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তোমাকে সাদরে স্নেহালিঙ্গন দান করিবেন।" রেনিএর হৃদয় নীচ নহে; অথবা শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহ কোন্ কালে আপনার হৃদয়ের তেজ হারাইয়া থাকে? তিনি ঘৃণার হাসি হাসিয়া সেনাপতির প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। সকলে তাঁহার অদৃষ্টের পরিণাম দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠিল।

অষ্ট্রিয় সেনাপতি অনুসন্ধানে জানিতে পাইলেন যে, নিকটবর্ত্তী পল্লীতে রেনিএর বাসভূমি; তথায় তাঁহার মাতা ও ভগ্নী

বাস করেন। তখন তিনি উক্ত দুইটী নিরপরাধা রমণীকে বন্দিনী বেশে তাঁহার সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। তদণ্ডেই রাজাজ্ঞার ন্যায় সেনাপতির কঠোর আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল—দেখিতে দেখিতে শত শত লোক-পরিবৃত হইয়া রেনিএর মাতা ও ভগিনী বন্দিনীরূপে কারাগৃহের সম্মুখে আনীত হইলেন। আজি রেনিএর স্বদেশ-দ্রোহীদলের বড় আনন্দের দিন! দেশের প্রধান কণ্টক রেনিএ শৃঙ্খল-বদ্ধ ও কারাবরুদ্ধ এবং তাঁহার স্নেহের জননী ও ভগিনী কারাগৃহের সম্মুখে বন্দিনী! অষ্ট্রিয় সেনা-নিবেশে মহা আনন্দের কোলাহল উথলিয়া উঠিতেছে। অন্য দিকে চাহিয়া দেখ;—রেনিএর সম-দশা-গ্রস্ত স্বদেশীয় বন্দী বীর-ভ্রাতৃগণ লজ্জায়, ক্রোধে, অভিমানে জ্বলিয়া অবনত শিরে এই ঘৃণার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কি এক মহা সঙ্কল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতাপ্রিয় হঙ্গেরির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গভীর বিষাদের ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই ঘন বিষাদে প্রকৃতির মুখ মলিন হইয়াছে। ঐ দেখ, সমীরণ হেথা হোথা ছুটিয়া ছুটিয়া মহা স্বননে ঘোরতর শোক-কাহিনী প্রচার করিতেছে। পশু, পাখী, তরু, লতা, পত্র পুষ্প সকলেই নিস্তব্ধে গভীরভাবে প্রতি-শোধ-গান গাইয়া হঙ্গেরির স্বাধীনতা-প্রিয় অযুত নরনারীর হৃদয়ে সঞ্জীবনী-সুধা বর্ষণ করিতেছে। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি প্রাণ ভরিয়া এই মহা দৃশ্য হইতে জাতীয় জীবনের পবিত্র ভাব উপলব্ধি করুন—শোকাকুলা প্রকৃতি জননী তাঁহার অবসন্ন হৃদয়ে বল দান করিবেন।

অষ্ট্রীয় সেনানায়ক এবার কর্কশ কণ্ঠে গম্ভীরভাবে বলিলেন—"যদি এই দুইটী স্ত্রীলোকের জীবনে সাধ থাকে—যদি ইহা-দিগকে জীবিত থাকিতে দেখিলে সুখী হও, তবে এখনও বলিতেছি, আমার আদেশ পালন কর—তোমার অনুচরবর্গ কে কে, কোন্ কোন্ স্থানে লুকাইয়া আছে, প্রকাশ কর। তোমার কোন ভয় নাই; আমি তোমার সমস্ত অপরাধ মাপ করিব, এবং তুমি যদি তোমার কৃতকার্য্যের জন্য অনু-তাপ কর, তাহা হইলে তোমাকে উচ্চ পদে ও উচ্চ গৌরবে সম্মানিত করিব। স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া উত্তর দান কর—তোমার কথার উপরে আমার বর্ত্ত-মান কার্য্য নির্ভর করিতেছে।" এবার বাক্যে রেনিএ কম্পিত হইলেন; একবার ক্ষণকালের জন্য হতভাগিনী জননী ও ভগিনীর বিষণ্ণ মুখ পানে দৃষ্টিপাত করি-লেন, আর একবার তাঁহার পার্শ্বস্থ স্বদে-শীয় কারাবাসীগণের মলিন মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু জল পূর্ণ হইয়া আসিল—তিনি নীরবে দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সেই পাপ দৃশ্য আর যেন না দেখিতে হয়, এই ভাবিয়াই বুঝি চক্ষু মুদিয়া রহি-লেন। তখন তাঁহার প্রাণ কি ভীষণ যাত-নায় অধীর হইয়াছিল, কে তাহা সম্যক রূপে বুঝিতে পারিবে? মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মনে কত প্রবল ভাবনার তুফান বহিতে লাগিল। সম্মুখে পরমারাধ্যা জননীর দুর্দ্দশা এবং স্নেহময়ী ভগিনীর লাঞ্ছনা এবং সকলের অদৃষ্টের পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে তিনি অবনত মুখে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সে অশ্রু-

অবলা রমণীর কাতর হৃদয়ের অশ্রু নহে—উহা বীর-হৃদয়ের অতুষ্ণ শোণিতধারা! উহা বর্ষিত হইতে দেখিয়া এনোর হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল।

এনো আবার বলিলেন,—"আর বৃথা চিন্তার সময় নাই, এখনই আমার আজ্ঞা পালন কর, অনাথা এই দণ্ডেই এই দুইটি স্ত্রীলোকের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে।" এই বাক্যে রেনিএ চমকিয়া উঠিলেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—তাঁহার মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি শোভা পাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাঁহার যে চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছিল, এখন তাহা হইতে যেন দ্রবময় অনল-প্রবাহ উদ্গীরিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে কঠোর প্রতিজ্ঞা বিভাসিত হইল! এই সময় তিনি আর একবার তাঁহার ভগিনী ও জননীর মুখ পানে তাকাইলেন। তখন উপযুক্ত বীরের উপযুক্ত জননী স্বর্গীয়তেজে উত্তেজিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন;—"Do not speak, my son, do not speak—do your duty calmly and never think of me, for my hairs have become grey—at least I have only a few days to live—think of God, and he will give you strength to bear.—"বলোনা, বাছা, বলোনা—তুমি তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ধীরভাবে সম্পাদন কর—আমার জন্য কিছুমাত্র ভেবোনা—আমার মাথার চুল পাকিয়াছে—আমি আর অল্প দিন মাত্র বাঁচিব—এখন কেবল পরমেশ্বরকে ভাব—তিনি তোমার হৃদয়ে বল দান করিবেন।" বীর-জননীর কথা শেষ হইতে না হইতেই বীর-ভগিনী অলন্ত উৎসাহের সহিত মধুমাখা কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন;—"Do not speak dear brother, do not speak—if you betray your country our name will be covered with shame—our fair fame will be soiled for ever—and what is life without honor? Do not speak Ferencz—be calm, have courage, and only think of God—I shall know how to die.—" "প্রিয় ভ্রাত, কথনো বলোনা, বলোনা—যদি তুমি তোমার স্বদেশের বিশ্বাস-হন্তা হও, তাহা হইলে আমাদের নাম লজ্জায় ডুবিবে—আমাদের সুযশ চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হইবে—মান গেলে জীবনে কায কি ভাই? ফেরেঙ্স্, তুমি কোন কথা বলোনা—স্থির হও, সাহস অবলম্বন কর, এবং কেবল ঈশ্বরকে ভাব;—কেমন করিয়া মরিতে হয় তাহা আমি জানি।" বীর-জননী ও বীর-ভগিনীর অলন্ত উৎসাহ বাক্যে চারিদিক স্তম্ভিত হইয়া উঠিল—রেনিএর হৃদয় অভ্রভেদী পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও অটল হইল—মহা সঙ্কল্পে তাঁহার প্রাণ অনুপ্রাণিত হইল—তিনি স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন,—"এ জীবন, ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছি—তাঁহার ইচ্ছায় ইহা প্রিয় জন্মভূমির পদতলে বলি দিব—তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ হউক" এই বলিয়া করযোড়ে নীরবে প্রার্থনা করিলেন—আবার তাঁহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইল। অনতিবিলম্বে তাঁহার সম্মুখে ঘাতক হস্তে শাণিত তরবারি ঝলসিয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে জননী ও ভগিনীর মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। রেনিএ এই পাশব দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিলেন। রেনিএর হৃদয়ের প্রধানতম পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই;—তাঁহার জীবন-নাটকের একটি ঘোর বিষাদময় অঙ্ক শেষ হইল, এক্ষণে আর একটি মহা আতঙ্কজনক অঙ্কের অভিনয় জন্য যবনিকা উত্তোলিত

হইয়াছে। সেই ভীষণ মর্ম্ম-ভেদী দৃশ্যে কাহার হৃদয় অরুন্তুদ বেদনায় অবসন্ন না হইয়া থাকিতে পারে? রেনিএর স্বদেশ-প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার উন্নতমনা জননী ও ভগিনী, এনোর কঠোর আদেশে, তাঁহার সম্মুখে নিষ্ঠুর ঘাতক-হস্তে নিহত হইলেন, তাহাতেও এনোর হৃদয়ের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইল না, আর একটি প্রফুল্ল কুসুমোপমা নিরপরাধা রমণীকে বলি দিবার জন্য আয়োজন হইল! এই অল্পবয়স্কা সুশোভনা ললনা কে? ইনিই মহাবীর রেনিএর প্রেম-মুগ্ধা প্রণয়িণী। তিনি যখন শৃঙ্খলা-বদ্ধা হইয়া উন্মাদিনী বেশে তাঁহার হৃদয়-দেবতার পার্শ্বে আনীত হইলেন, তখন অষ্ট্রীয় সেনাগণের শত শত পাপ-চক্ষু ক্ষণকালের জন্য স্বতঃই মুদিয়া আসিল—তাঁহার অদৃষ্টের শোচনীয় পরিবর্ত্তন ও অনিবার্য্য পরিণাম কল্পনা করিয়া অনেকের কঠিন হৃদয় গভীর আতঙ্কে ও বিষম ক্ষোভে শিহরিয়া উঠিল। কাহার সাধ্য নিয়তির অপ্রতিহত গতি রোধ করে? তাঁহার হৃদয় রেনিএর জননী ও ভগিনীর হৃদয়ের ন্যায় উন্নত নহে—উহা অতি দুর্ব্বল, অতি কোমল—অতি সামান্য মাত্র দুঃখের তাপে উহা বিগলিত হইয়া পড়ে। তিনি সেনা নিবেশে উপস্থিত হইয়াই সম্মুখে দুইটী পরিচিতা রমণীর মস্তক শূন্য মৃতদেহ এবং পার্শ্বে তাঁহার জীবনের ধ্রুব নক্ষত্রের মর্ম্মভেদী দুর্দ্দশা অবলোকনে দুর্ব্বিসহ শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া বাতাহত তরুর ন্যায় রেনিএর পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন অষ্ট্রীয় সেনাপতি পুনরায় গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন "এখনো যদি দুর্ম্মতি দূর করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত করিতে সাধ থাকে, এই শোক-বিহ্বলা যুবতীর জীবনকে যদি প্রিয় জ্ঞান কর, এবং ইহার সহবাস-সুখে পূর্ব্ব-শোক ভুলিতে চাও, তবে এখনই আমার আদেশ পালন কর—এখনো বল, তাহারা কোথায় কি ভাবে লুকাইয়া আছে।" ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই শোকাকুলা রমণীর মূর্চ্ছা অপনোদিত হইয়াছিল; এক্ষণে তিনি সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভূমি হইতে উঠিয়া রেনিএর গলা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"Speak, speak, dear, my life, my heart's treasure, my all, pray speak out. See, I am young, I love you with all my heart,—do not let me be killed—do not kill yourself. You will save yourself and me if you speak out. When you are free, we will go far away and be happy. Speak my dearest Ferencz, and save your future wife—not a single desire of my heart is yet fulfilled!"—"বল, বল, প্রিয়, আমার জীবন, আমার হৃদয়ের ধন, আমার সর্ব্বস্ব, মিনতি করিতেছি, বলিয়া ফেল। দেখ, আমার বয়স অল্প, আমি তোমাকে সমস্ত হৃদয় ভরিয়া ভালবাসি—আমাকে মরিতে দিও না, এবং তুমিও আপনাকে আপনি নিপাত করিও না। তুমি বলিলে তোমার এবং আমার জীবন রক্ষা হইবে। যখন তুমি কারা-মুক্ত হইবে, তখন আমরা অতি দূরদেশে যাইয়া সুখে থাকিব। প্রিয়তমে ফেরেঙ্স্, তুমি বলিয়া তোমার ভবিষ্য প্রণয়িনীর প্রাণ রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের একটি বাসনাও এখনও পূর্ণ হয় নাই!"

অনন্তর তিনি একান্ত প্রেমভরে রেনিএর দুইহস্ত ধারণ করিলেন—কতবার উহাতে

চুম্বন বর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"জীবনের সর্ব্বস্ব ধন, এখন আর চুপ করিয়া থাকিবার সময় নাই—যথার্থ কথা প্রকাশ কর—তোমার কথার উপরেই আমাদের উভয়ের জীবন নির্ভর করিতেছে।" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার হাত দুই খানি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন শেষ একমাত্র ভাসমান অবলম্বনকে জড়াইয়া ধরিয়া একবার ভাসিয়া উঠে এবং পরক্ষণেই ডুবিয়া যায়, আবার ভাসিয়া উঠে, আবার ডুবিয়া যায়, তিনিও সেইরূপ তাঁহার প্রণয়ীর প্রিয় হাত ধরিয়া কাতর ভাবে একভাবে উঠিতে লাগিলেন, পুনরায় অবসন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিলেন। মহা সাধনায় অনুপ্রাণিত মহাবীর রেনিঐ আর কতক্ষণ এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য নীরবে স্থিরভাবে সহ্য করিবেন? এইবার পাষাণ গলিল। তিনিও কাতর ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন—দুই হাতে ধরিয়া প্রণয়িনীকে ভূমি হইতে তুলিলেন—তাঁহার মৃণাল-ধবল-সুকোমল করে দুইটী চুম্বন দান করিলেন—দুঃখ ও শোকের গভীর উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল—প্রাণের কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারিয়া মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিলেন! সহসা দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল! সহসা তাঁহার মুখ-ভাব পরিবর্ত্তিত হইল! কে যেন তাঁহাকে গোপনে বলিল—"সাবধান, রেনিঐ, সাবধান!—রমণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিও না—এই পৃথিবী কয় দিনের জন্য? ইহার সুখ-শান্তি ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী—এখানে প্রাণের বাসনা পূর্ণ হয় না—অন্তরের পিপাসা মিটে না! নির্ভয়ে, অবিচলিত হৃদয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন কর—পর জগতে অনন্ত সুখ ও অনন্ত শান্তি লাভের জন্য প্রস্তুত হও। এই মৃত্যুর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তিলাভে অমর হইবে। ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠায় তোমার নাম সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে এবং উহা স্বদেশ প্রেমিক নরনারীর রসনায় নিত্য ক্রীড়া করিবে। ঐ দেখ, পরলোকগত বীরেন্দ্র-সমাজ প্রীতির পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি লইয়া সবিস্ময়ে, স্তম্ভিতভাবে, অনিমেষ নয়নে তোমার হৃদয়ের অদ্ভুত বীরত্ব নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তাঁহারা স্বর্গ হইতে মঙ্গলগান ও তোমার প্রতি অজস্রধারে পুষ্প বৃষ্টি করিবেন—চারিদিকে তোমার বীরত্ব-বিজয় বিঘোষিত হইবে—তোমার পরজীবন স্বর্গের প্রাতঃস্মরণীয় স্বদেশানুরাগী বীরেন্দ্র-সমাজে পরম রমণীয় সুখে অতিবাহিত হইবে। মায়া-মোহ ত্যাগ কর—ঐ দেখ তোমার পরলোকগতা জননী ও ভগিনী তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহ দান করিতেছেন!" এই কথায় যেন তাঁহার মোহ-নিদ্রা দূর হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রণয়িনীর বক্ষোমাঝে মুখ লুকাইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; এখন তাঁহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি সহসা মুখ তুলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিল, এবং চক্ষু হইতে যেন অনল-কণা নির্গত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই তিনি স্থির গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন—তাঁহার চক্ষুদ্বয় মস্তকোপরি নীল নভোমণ্ডলের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল,—বিমল

আকাশ-পটে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে যেন এক উদ্দীপনা মন্ত্র লিখিত রহিয়াছে, তিনি তাহা এক মনে পাঠ করিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ দুই হাত যোড় করিয়া সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন "জগদীশ, তোমারই প্রিয় কার্য্যে এ জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তোমারই আদেশে ইহা হাসিতে হাসিতে বিসর্জ্জন করিব। কিন্তু দেব, এই দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে যে, এত সহ্য করিয়াও প্রিয় জন্মভূমির সুদিন চক্ষে দেখিয়া মরিতে পারিলাম না। আর কিছুই সাধ নাই, এখন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এই বলিয়া তিনি সদা-বিকসিত শিশির-স্নাত সরোজিনীর ন্যায় তাঁহার প্রণয়িণীর অশ্রু-অভিষিক্ত মুখ-কমল আর একবার প্রশান্ত ভাবে প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে জন্মের মত শেষ বিদায় লইবার জন্য তাহাকে হৃদয় ভরিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন দান করিলেন। অনন্তর সম্পূর্ণরূপে আত্ম সংযম করিয়া বলিলেন,—"Farewell! Prepare yourself dearest, for that bright and happy land where mother and sister have gone—there we shall meet again, and part no more! Farewell!" "বিদায়, প্রিয়তমে—মাতা ও ভগিনী যে জ্যোতির্ম্ময় এবং সুখকর দেশে গমন করিয়াছেন, তুমিও তথায় যাইতে প্রস্তুত হও—সেখানে আমরা পুনরায় মিলিত হইব—আর কখনও আমাদের বিচ্ছেদ হইবে না! তবে এখন বিদায় দাও।" এই বলিয়াই তাঁহাকে সরাইয়া দিলেন এবং আপনি কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী গগণভেদী ক্রন্দনে আবার তাঁহাকে মিনতি করিয়া কত কথা বলিলেন, কিন্তু আর তিনি তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন না। তৎক্ষণাৎ নিষ্ঠুর অষ্ট্রীয় সেনাগণ বেগে ধাবিত হইয়া তাঁহাকে বলি দিবার জন্য ধরিল। তিনি বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন,—"Be cursed, be cursed, you who let me die; you who kill me; who are my assasin." রেনিএ নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিমেষ মধ্যে অষ্ট্রীয় সৈনার গুলির আঘাতে হতভাগিনী রমণীর প্রাণ-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল;—নরাধম সেনাপতি এনোর নিষ্ঠুর আদেশে একটী প্রস্ফুটিত সজীব কুসুম অকালে বৃন্ত-চ্যুত হইয়া পৃথিবীর ধূলায় পরিণত হইল। হায়রে! হৃদয়হীন নিষ্ঠুর এনো, কি করিলি, কি করিলি! অস্ত্রবলে—পশুবলে—বীরের দুর্ভেদ্য হৃদয় জয় করিতে গিয়া তিনটী নিরপরাধিনী স্ত্রীলোকের প্রাণনাশে তোর কি ফললাভ হইল? এখনও কি তোর শোণিত-পিপাসা মিটে নাই?

আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া বন্দুকের গুলি নির্গত হইবামাত্র উহা রমণীর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল;—এক আঘাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল! রেনিএ পূর্ব্বের ন্যায় দুই চক্ষু আবৃত করিয়া মর্ম্মভেদী স্বরে গভীর উচ্ছ্বাসে ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিয়া জলন্ত দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—"ওঃ .... হো .. .ও .... !!" বন্দুকের শব্দ থামিবামাত্রই রমণীর প্রাণ-শূন্য কায়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল, কিন্তু রেনিএর গভীর আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি শীঘ্র থামিল না—উহা চারিদিকে ছুটিয়া ছুটিয়া ভীষণ গভীর স্বরে গাইতে লাগিল,—"ওঃ .. হো .. ও!!"

সেই ভীষণ দৃশ্যে ও ভীষণতর স্বরে সমবেত অষ্ট্রীয় সেনাদলে ক্ষণকালের জন্য বিষাদের ছায়া পরিব্যাপ্ত হইল। সেনাপতি হায় সে দৃশ্য সহিতে না পারিয়া বিবেকের মর্ম্মান্তিক দংশনে স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন—সে তীব্র দংশন-যাতনা সহজে মিটিল না!

অনেকক্ষণ পরে রেনিএ অতি কষ্টে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সেই কলঙ্কিত হত্যার-ক্ষেত্র হইতে মৃত দেহ গুলি অপসারিত হইয়াছে, এবং অষ্ট্রীয় সেনাদল একে একে কে কোথায় চলিয়া যাইতেছে! এমন সময় দুইজন সেনা ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি ভাবিলেন, এইবার তাঁহার দুর্ব্বহ জীবনের শেষ যবনিকা পতিত হইবে। তিনি বিকট হাসি হাসিয়া তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার করিলেন। তাহারা বুঝিতে পারিল, তিনি ঘৃণার সহিত মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন। তাহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, "ভয় নাই, আমরা তোমার জীবন লইতে আসি নাই, তোমাকে প্রাঙ্গণ হইতে গৃহাভ্যন্তরে নিরাপদ স্থানে রাখিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া তাহারা তাঁহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া তাঁহাকে কারা-গৃহ মধ্যে রাখিয়া প্রস্থান করিল। রেনিএ এখন একাকী কারাগৃহে উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতেছেন? এক এক বার বিকট হাস্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া স্তম্ভিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন, আবার উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া পড়িতেছেন। স্নেহময়ী জননী, প্রীতিময়ী ভগিনী ও প্রেমময়ী প্রণয়িণীর একে একে কলঙ্কিত অপমৃত্যু স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার বিরাট হৃদয় একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মন ক্রমশঃ বিকৃত ভাব ধারণ করিল। তিনি কখনও হৃদয়ে করাঘাত করিয়া অলক্ষ্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, কখনও হাসিতেছেন, কখনও স্বদেশের স্বাধীনতা গান করিতেছেন, কখনও প্রণয়িণীর নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সাদরে প্রণয়-গীতি শুনাইতেছেন, এবং কখনও বা একদৃষ্টে শূন্য পানে তাকাইয়া কি-যেন-কি সুন্দর ছবি দেখিয়া তাহাকে হাসিতে হাসিতে হৃদয়ে ধরিতে যাইতেছেন। দুই দিন কাটিয়া গেল, তৃতীয় দিবসে তিনি ঘোরতর উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার স্মৃতি-শক্তি একবারেই বিলুপ্ত হইল, সুতরাং আর তাঁহাকে কোন যাতনা অনুভব করিতে হইল না। তাঁহার চিত্ত-বিকার ও উন্মত্ত ভাব দৃষ্টে অষ্ট্রীয় রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দান করিলেন। তাঁহার কতিপয় পরিচিত ও স্বদেশবাসী ভক্ত তাঁহাকে লইয়া গিয়া আপনাদের আশ্রয়ে রাখিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই হঙ্গেরিতে যে সকল লোমহর্ষণ অভিনয় হইল, ইতিহাস পাঠক মাত্রই তাহা অবগত আছেন; এস্থলে তাহার অবতারণা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সংক্ষেপতঃ ইহা উল্লেখ করিলে যথেষ্ট হইবে যে, তিনটি নির্দ্দোষী স্ত্রীলোকের প্রাণ বধ এবং মহাবীর রেনিএর তীব্র লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্যই যেন হঙ্গেরির বীরগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অষ্ট্রীয়াকে নানারূপে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত করিলেন। এই যুদ্ধের অবসানে তথায় শান্তি স্থাপিত হইলে পর রেনিএ [illegible]টি অনাথ আশ্রমে রক্ষিত হইলেন। তাঁহার

কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসীগণ তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মানসিক বিকার ও উন্মাদাবস্থা দূর করিতে পারেন নাই। প্রতি দিন হঙ্গেরির শত শত কৃতজ্ঞ-হৃদয় তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহার অদ্ভুত বীরত্ব ও জলন্ত আত্মোৎসর্গের স্তুতি-গান করিতেন। প্রতিদিন তাঁহার জন্য নূতন নূতন বস্ত্র উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী প্রেরিত হইত—জ্ঞানহীন উন্মত্ত রেনিএ কিছুই জানিতে পারিতেন না! কিছুই বুঝিতে পারিতেন না! প্রায় ৩৭ বৎসর কাল অনাথ আশ্রমে উন্মত্তাবস্থায় বাস করিয়া মহাত্মা রেনিএ অল্পদিন হইল এই দুঃখময় পৃথিবী পরিত্যাগ পুরঃসর দিব্যধামে বীরেন্দ্র-সমাজে বাস করিতে গিয়াছেন। সেখানে কোনরূপ বৈষম্য, শোক, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, বিরহ, নৈরাশ্য, অশান্তি ও অত্যাচার, কিছুই নাই; সেখানে কেহ কাহারও হৃদয় লইয়া খেলা করে না;—সেখানে চির প্রণয়, চিরসুখ, চিরশান্তি, চিরআনন্দ, চির আরাম, পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত! সে রাজ্যের মহান্ অধিপতি প্রেমময় ঈশ্বর মহাবীর রেনিএকে শান্তিময় ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের সমুচিত পুরস্কার দান করিয়াছেন; অন্যান্য দেবতাগণ আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়া তাঁহার উন্নত মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন, এবং স্বর-সিমন্তিনীগণ বিপুল হর্ষে অধীর হইয়া করতালি দিয়া মঙ্গল গান করিয়াছেন!

ভাই স্বদেশবাসি! এস, আমরা সসম্ভ্রমে এই পরলোকগত মহাবীরের উদ্দেশে শতবার প্রণাম করি। এস ভাই, আমরা এক্ষণে একবার ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মহান্ চরিত্র পর্য্যালোচনা করি। আজি আমাদের দেশ মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে! শত শত বৎসরের কঠোর পরাধীনতায় এদেশের বীরত্ব-বহ্নি চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছে! হলদিঘাটের মহা যুদ্ধের পর পুণ্যভূমি ভারতে আর প্রকৃত হৃদয়ের বীরত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। এখন এদেশের যেদিকে দেখি, সেই দিকেই অন্ধকার, সেই দিকেই কঠোর পরাধীনতা বিকট বদনব্যাদান করিয়া চরাচর গ্রাস করিতে যাইতেছে। এদেশের কোটি কোটি লোক যেন অধীনতার তীব্র কষাঘাতে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া গভীর অবনতির গহ্বরে, কলঙ্কিত মৃত্যুর পুরে ছুটিয়া চলিয়াছে। হায়! হায়! কে তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া উন্নতির পথে, গৌরবের রাজ্যে পুনরানয়ন করিবে! অনৈক্য, ঈর্ষা, দলাদলি ও কুসংস্কারে দেশের অস্থি-মজ্জা পর্য্যন্ত জর জর হইয়াছে। হায়! হায়! কে তথায় অমৃতকুণ্ডের জল সিঞ্চন করিয়া তাহাকে পুনরায় সজীব ও সতেজ করিয়া তুলিবে? জাতিভেদ, বর্ণ-ভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ ও জ্ঞানভেদে দেশের সকল কার্য্য বিফল হইতেছে। সমগ্র দেশ মধ্যে দিন দিন ঘৃণিত ছদ্মবেশের প্রাদুর্ভাব হইতেছে—বাহ্যিক চাকচিক্যশালী প্রাণ-জুড়ান অন্তঃসার-শূন্য সভ্যতার দিন দিন আদর বাড়িতেছে;—এখানে সাধনা, ভণ্ডামীতে পরিণত হইতেছে—যোগ-শিক্ষা, চপলতায় পরিণত হইতেছে—স্বদেশানুরাগ, বৃথা বাগাড়ম্বরে পরিণত হইতেছে—স্বজাতি প্রেম, বিদ্বেষভাবে অথবা ঘোর ঔদাসীন্যে পরি-

গত হইতেছে—আত্মোৎসর্গ, স্বপ-সেব্য বিলাসিতায় পরিণত হইতেছে। এই ঘোর দুর্দ্দিনে—এই ঘোর অধঃপতনের দিনে আমরা রেনিঞ ও তাহার তুল্য ক্ষণজন্মা মহাত্মাদিগের স্বদেশানুরাগ, স্বজাতি প্রেম ও অনন্ত আত্মোৎসর্গ হইতে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি। এস ভাই, হতাশ হইও না: দয়াময় ঈশ্বরের পবিত্র নাম লইয়া পবিত্র জন্মভূমির পদে জীবনের সমস্ত আশা ও সুখশান্তি উৎসর্গ করি। একদিন আমাদের প্রাণের বাসনা পূর্ণ হইলেও হইতে পারে।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

আলিপুর প্রাণি-বাটিকা।

ইংরাজ শাসনে বঙ্গসাহিত্য।*

১ম প্রস্তাব।

অন্নদামঙ্গল বিরচিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাসীর আম্র-কাননে ভারতের ভাগ্য-দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। স্বর্ণ-বিহঙ্গ পিঞ্জর হইতে পিঞ্জরান্তরে প্রবেশ করিল। ইস্‌লামধর্ম্মের উপাসকবর্গ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হিন্দুস্থান যীশু-ভক্তগণের কর-কবলিত হইল। একদিকে মুসলমান রাজ্যের বিসর্জ্জন, অপরদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা;—প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া, এই উভয় প্রবল প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে পড়িয়া, দেশ হাবু-ডুবু খাইতে লাগিল। অবসর বুঝিয়া; অরাজকতা স্বীয় অনুরূপ দল বল লইয়া চারিদিকে তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিল। দুঃসময় দেখিয়া শান্তি-দেবী ম্লানমুখে ধীরে ধীরে অন্তর্হিতা হইলেন। ইহার উপর আবার ঘোরতর দৈব বিড়ম্বনা—দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সোণার বঙ্গদেশ ছারখার হইয়া গেল। এই সময়ের একখানি চিত্র পাঠকগণের সমক্ষে ধারণ করিতে ইচ্ছা করি।

"১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই। সুতরাং ১১৭৫ সালে চাউল কিছু মহার্ঘ্য হইল। লোকের কিছু ক্লেশ হইল; কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গাহিল: কৃষক পত্নী আবার রূপার পৈঁছার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র

---

* এই প্রবন্ধটী মেদিনীপুরের অন্তর্গত মহিষাদলস্থ আলোচনা সভায়, ১২৯৪ সালের ১০ই বৈশাখ শুক্রবার পাঠিত হয়। প্রস্তাবটী যে বিবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক, সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।—যেরূপ আকারে পাঠিত হইয়াছিল, অবিকল তাহাই মুদ্রিত করা গেল। পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বুঝিলেও, নানা কারণে তাহা হইতে বিরত রহিলাম। লেখক।

বৃষ্টি পড়িল না। মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পায় না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল; তারপর, এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তারপর, দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজার্খা রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিলেন, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল। লোক প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়?—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল। ঘর বাড়ী বেচিল, জোত জমা বেচিল, তারপর, মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল; তারপর, ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর, স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী—কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়: খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর ও বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল। যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। আর যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রোগ সময় পাইল। জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়? কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহার চিকিৎসা করে না। কেহ কাহাকে দেখে না। মরিলে ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকা মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়। * * * কাল ৭৬ সাল ঈশ্বর কৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে—কত কোটী তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া, সেই দুর্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল; পৃথিবী শস্যশালিনী হইলেন। যাহারা বাঁচিয়া ছিল; তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকেই তাহাতে মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী কিন্তু জন শূন্যা। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া পশাদির বিশ্রাম ভূমি ও প্রেত ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্ব্বরা ভূমি-খণ্ড অকর্ষিত হইয়া জঙ্গলে পূরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলময় হইল। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই। বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই। চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না। জমীদারে খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমীদারি কাড়িয়া লওয়ায় জমীদার সম্প্রদায় দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী সুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায়, কাড়িয়া খায়। চোর, ডাকাতেরা

মাথা তুলিল। সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।" (আনন্দমঠ)।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকে আমার উপর বিরক্ত হইতেছেন। বোধ হয়, অনেকে মনে করিতেছেন, ধান ভানিতে, শিবের গীত কেন? বঙ্গ-সাহিত্যের কথা কহিয়া; দুর্ভিক্ষের দৌরাত্ম্য, দেশের দুর্দ্দশার বিষয় আলোচনা করা কেন? স্বীকার করি, ইহাতে আমার দোষ হইয়াছে। কিন্তু ভ্রাতৃগন! একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, যখন দেশের অবস্থা এইরূপ শোচনীয়, লোক অখাদ্য খাইয়া, বা না খাইয়া যখন দলে দলে দুর্ভিক্ষানলে আপনাদিগকে আহুতি প্রদান করিতেছে; বলবান যখন দুর্ব্বলকে আক্রমণ করিতেছে; দুর্ব্বল সেই অত্যাচারের প্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া যখন ব্যথিত প্রাণে, ঊর্দ্ধপানে তাকাইয়া নীরবে নেত্র-নীর মোচন করিতেছে; যখন "দেশেব মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি, বউ রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঝি, বউয়ের পেটে ছেলে রাখিয়া শোয়াস্তি নাই;" যখন রাজা রাজ-ধর্ম্ম অতল-জলে ডুবাইয়া, দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে; যখন নবাগত বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বৃটেনবাসীর বলবতী অর্থ-পিপাসা, অস্তগামী মুসলমান পৌরুষের সাহায্যে,—পবন-সহায় সর্ব্বভুক্ হুতাশন-শিখার ন্যায়, এই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্য-শ্যামলা, স্বর্গাদপি-গরীয়সী জননী জন্ম-ভূমিকে কেবল শ্মশান—শ্মশানময় করিয়া তুলিতেছে,—সে সময় সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতে বসিবে কে? লোক যখন পেটের দায়ে, মানের দায়ে, প্রাণের দায়ে বিব্রত হইয়া, উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, তখন সাহিত্য সেবা অসম্ভব। সাহিত্য, শান্তি-সরোবরের শোভন শতদল। দর্পণ-হৃদয়া সরসী-বক্ষে কমলদল সুন্দর মলয়-মারুত-হিল্লোলে ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া চারিদিকে সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিস্তার করে; কিন্তু যখন বায়ু দিগ্বিদিক্-জ্ঞান হারাইয়া প্রচণ্ড বেগে বহিতে থাকে, তখন সরোবরের সুনীল আরসী খানি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, এবং প্রফুল্ল পদ্মদল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। যে সমাজ যে পরিমাণ শান্তি-সুখ উপভোগ করে, তথায় সাহিত্য-সাধনা সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সমাজ বিপর্য্যস্ত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে সাহিত্যালোচনার পথ তৎসঙ্গে সঙ্গেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়। বঙ্গদেশে এই সময়ে তাহাই ঘটিয়াছিল। এই ঘোরতর অশান্তির সময়ে দেশের কথা যদি কেহ ভাবিতেন, তবে সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। তাঁহারা লোভী, স্বার্থপর, ক্ষমতা-প্রত্যাশী, তোষামোদ-পটু ছিলেন না। তাঁহারা প্রকৃতই সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, মাণিক-তর্কভূষণ প্রভৃতি নিষ্ঠাবান, স্বাধীন-চেতা ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছিল। তৎকালের দুরাচার, নীচাশয়, অর্থগৃধ্নু ইংরাজগণ পর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতেন। ইঁহারা বিচারক, ব্যবস্থাপক অথবা অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। "কিন্তু ইঁহারা বিদ্যা-ব্যবসায়ী ছিলেন মাত্র; সাহিত্য-সমালোচনা করিবার ইঁহাদের অবসর ছিল না।"

১৭৬০ খ্রীঃ গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় দেহ-

লোক পরিত্যাগ করেন। তিনি যে কিরূপ অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার—

'খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কবাট।'
'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন;'
'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে;'
"বড়র পীরিরি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি,
ক্ষণেকে চাঁদ."
'মিছা কথা, সেঁচা জল কতক্ষণ রয়?'
'জলে শিলা ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়'
'নির্ম্মল চন্দ্রিকা, প্রফুল্ল মল্লিকা, শীতল
মন্দ পবন;'
'হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়,
হ্যাদে লক্ষী হ'ল লক্ষী ছাড়া।'

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি নিচয় আজিও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, ভারতচন্দ্র কৃত গ্রন্থাবলী আমাদের সমালোচ্য নহে।

অন্নদামঙ্গলের পর, "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনীর" নাম উল্লেখ যোগ্য। উলাগ্রামনিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কাব্যের রচয়িতা। সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ, কপিল-শাপ-ভস্মীভূত স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের উদ্ধার সাধনার্থ, কঠোর তপস্যায় গঙ্গাদেবীকে প্রসন্ন করিয়া, ধরাতলে তাঁহাকে আনয়ন করেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী উচ্চদরের কাব্য না হইলেও প্রশংসার যোগ্য বটে। স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায় ইহার বিলক্ষণ পক্ষপাতী। আজিও কোন স্থলে, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতির ন্যায় মন্দিরা-চামর-সংযোগে ইহা গীত হইতে দেখা যায়। কাব্যখানি ভক্তিরস-প্রধান। "গঙ্গার ষষ্ঠী পূজায় বিধাতার আগমন" স্থল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

'আদি, অন্ত তোমার মা! জানে কোন্ জন?
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড মা! করেছ সৃজন।
তোমার চরণ-গুণে কহিতে কি পারি?
তব নামে মাগো! যেন হই অধিকারী।
প্রসবিনী আপনি মা জান সে যেমন,
জঠোর-যাতনা মাতা জানিলে এখন।
যাতায়াত বারে বারে সবে কত আর?
জানিনা জননি! দাসে কর গো নিস্তার।
বিধি বটি, বিজ্ঞ নই, বালক তোমার,
লিখিয়া পড়িয়া মরি আছে এই ভার।
অবকাশ নাহি কিছু—মাহিনাতে শূন্য,
কে জন্মিল কোথায়, কি লিখি পাপ পুণ্য।
পরের কপালে আমি লিখি ভোগাভোগ,
নাহি জানি আপন ললাটে কর্ম্মযোগ।
কপালিনি! কপাল রূপিণী তুমি সার,
আমি কি লিখিব মাগো কপালে তোমার।
ব্রহ্মাণ্ড সমান যদি মস্যাধার হয়,
কারণ সলিল যদি হয় কালিময়,
আকাশের তুল্য পত্রে যিনি চিরজীব;
আশা-রূপ লেখনীতে লিখে সদাশিব;
তথাপি মহিমা তব লেখা নাহি যায়,
আমি কি লিখিব মাগো না দেখি উপায়,
কোন বর্ণ ললাটে মা, লিখিব তোমার।
বর্ণময়ী তুমি মাগো, আপনি বর্ণাকার।"

গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনীর পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন ভাল গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। এই সময়ে এক দল "স্বভাব-কবি" জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষার বিলক্ষণ পুষ্টি সাধন করেন। তাঁহারা যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তখন প্রতিভা-শক্তি সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইতে পারে না। তখনকার জমীদারগণ ও

"হঠাৎ-অবতার-বাবু"দিগের চিত্ত-রঞ্জনের জন্য তাঁহারা নানাবিধ গান বাঁধিতেন। আদিরস-ঘটিত সঙ্গীত রচনায় তাঁহারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আপনারা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমি টপ্পা-ওয়ালা নিধুবাবু এবং কবিওয়ালা রামবসু ও হরুঠাকুরের নামোল্লেখ করিতেছি। এতদ্ভিন্ন, রাসুনৃসিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, চিন্তাময়রা, নীলুপাটুনি, ভোলাময়রা, আন্টুনী ফিরিঙ্গী প্রভৃতি কবিওয়ালা, সমাজে সমাদৃত ও গৌরবান্বিত ছিলেন। কিন্তু হরুঠাকুর ও রাম বসুর ন্যায় আর কেহই তাদৃশ কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না।

নিধিরাম গুপ্ত, ওরফে নিধুবাবুর প্রকৃত বাসস্থান পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত চাঁপ্‌তা গ্রাম। ১৭৩৭ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। নিধুবাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। সেই জন্য কলিকাতায় কুমারটুলীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ ৯৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। নিম্নে নিধুবাবুর ৪টী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল।

ভৈরবী—মধ্যমান। (১)

বিচ্ছেদান্তে মিলনে কত সুখোদয়।
হিমান্তে বসন্ত যেমন, মেঘান্তে শশীর উদয়।
যে হ'ল অন্তরবাসী, সে হ'ল অন্তর বাসী,
সে পুনঃ অন্তরে আসি, সে যেন সে জন নয়।

(২)

নয়ন-নীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী ম'রে, অন্য বারি নাহি হারে,
ধারাজল বিনা তার সকলি বিফল॥
যবে তারে হেরি সখি! হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে জানি অনল-প্রবল॥

(৩)

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

এ যাতনা জানাওনা তায়।
শুনিলে আমার দুঃখ, সে পাছে বেদনা পায়।
তার দোষ গুণ যত, সকলি মম বিদিত,
দোষ ত্যজে অবিরত, রত প্রশংসায়॥
নীর ত্যজে ক্ষীর যেমন, হংসে করে গ্রহণ,
তেমতি আমার মন তার পানে ধায়॥
ভাবিয়া দেখিলাম ভাল, সকলিরে কর্ম্মফল,
তাহে এ দুঃখ ঘটিল, কি দোষ তাঁহায়॥

(৪)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
গগণে শরত শশী উদয় কলঙ্ক ছলে॥
সৌরভে, গৌরবে, কে তোমার তুলনা হবে,
তোমাতে সকলি সম্ভবে, যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে॥

হরুঠাকুর (হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী) ১৭৩৯ খ্রীঃ কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ইঁহার একটী সখের কবির দল ছিল। শোভাবাজার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজা নবকৃষ্ণের উৎসাহে ও অনুরোধে তিনি শেষাবস্থায় পেশাদারি কবির দল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। নিম্নে তাঁহার একটীমাত্র সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল।

সখী সংবাদ।

মহড়া।

ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি,
ব্রজ-কুলনারী, বধিলে।
বলনা কি বাদ সাধিলে॥

নবীনো পিরীতো, না হইতে মাধো,
অঙ্কুরে আঘাতো করিলে ॥

চিতেন।

একি অকস্মাতো, ব্রজে বজ্রাঘাতো,
কে আনিল রথো, গোকুলে।
অক্রূরো সহিতে, তুমি কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে, চলিলে॥
শ্যাম, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাবো, শুন হে মাধবো
তোমারি প্রেমেরো প্রয়াসী॥
ঘোরতর নিশি, যথা বাজে বাঁশি
তথা আসি গোপী সকলে।
দিয়ে বিসর্জ্জন কুল-শীলে॥
এতেই হ'লাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি,
এই দোষে কিহে ত্যজিলে?
শ্যাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি, যথা সুখ পাও।
একবার, সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে,
ব্রজ-গোপীর প্যানে ফিরে চাও।
জনমের মত, শ্রীচরণ দুটী,
হেরি হে নয়নে শ্রীহরি!
আর হেরিব আশা না করি॥
হৃদয়ের ধন, তুমি গোপীকার,
হৃদে বজ্র হানি চলিলে।
রাধারে চরণে, ত্যজিলে, রাধানাথ!
কি দোষ তাহার পাইলে?

আহা! কেমন সরল! কেমন সকরুণ! কেমন প্রাণস্পর্শী! প্রেমময়ী সরলার প্রাণের মধুর সৌন্দর্য্য ইহার মধ্যে কেমন ফুটিয়া পড়িতেছে।

রাম বসু, কলিকাতার অপর পারস্থ শালিখা নামক স্থানে, ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার "বিরহ" দেশ-বিখ্যাত। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। নিম্নে তাঁহার দুইটী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল।

(১)

মহড়া।

মনে রৈল সই, মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি
বলা হল না।
শরমে মরম কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।
সখি, ধিক্ থাক আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন করে না।

চিতেন।

একে আমার এ যৌবন কাল,
তাহে কাল বসন্ত এল।
এ সময় প্রাণনাথ বিদেশে গেল।
যখন হাসি হাসি, সে "আসি" বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না।

অন্তরা।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম স্বজনি!
অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি!
একি সখি, হল বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান,
মদন দহিছে এখন, এ অবলার প্রাণ।
যদি সে হ'ল নিদয়, লইল বিদায়,
তবে যেন সখি! প্রাণও রহে না।

(২)

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ!
বদন ঢেকে যেও না।

তোমায় ভালবাসি তাই,
চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক থাক বলে ধরে রাখ্‌ব না।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল।
তোমার পরের প্রতি নির্ভর,
আমি ত ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।
দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ!
হ'ল এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা,
তোল ও বিধুবদন।
পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি?
এমন ত প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি,
অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ,
বিধাতা হ'ল বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচে কিছু মাণিক পাব না।

সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"রাম বসুর গানের ভাব ও শব্দ-বিন্যাস-কৌশল, উভয়েরই আমরা প্রশংসা করি। মোটামুটি এরূপ প্রশংসা করা যায়, কিন্তু আঁটাআঁটি করিয়া ধরিয়া সূক্ষ্ম সমালোচনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, ইঁহার ভাব-পারিপাট্য অপেক্ষা রচনা-চাতুর্য্য অধিকতর জাজ্বল্যমান,—ভাবুকতা অপেক্ষা মুনসিগিরি অধিক—কথার বাঁধুনি, কথার গাঁথনি যেমন, ভাবের মনোহারিতা, ভাবের চমৎকারিতা তদ্রূপ নহে। সুতরাং ইহার বিরহিনীদিগের বিরহ-সঙ্গীত শুনিয়া "বহবা" দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু "আহা" কথাটা মুখে আসে না।"

শ্রীহেমনাথ মিত্র।

অন্ধকার।

(সমুদ্রতীরে)

১

গোধূলির দীপ্তি ওই বিশাল অম্বরে,
ছাইয়ে আসিছে শুধু ঘন অন্ধকারে
নীল বারিধির কায়া,
অতি নীল,—শেষে ছায়া;
মহাসিন্ধু, মহাশূন্য পড়ি একত্তরে;
সাগর, সাগর-পাতে হ'ল একাকার!

২

আকাশের শ্রান্ত পাখী, দূর সিন্ধু কোলে,
অসীমে না পেয়ে দিশে,
এলায়ে গিয়াছে মিশে;
স্বর্গ মর্ত্ত্য সবি আজি অন্ধ শূন্যে দোলে।

৩

হেরগো, হেরগো সিন্ধু, আকাশ সমান
চির-অন্ধকার মাখা,
চির-ধূম্র মেঘে ঢাকা,
অনন্তে ছুটিয়া শ্রান্ত, আমার পরাণ!
তাই সে আজিরে হায়,
আঁধার সাগর চায়,
অমনি মিশিতে সাধ, বুকেতে তাহার;
তুমি কি লইবে কোলে, ওহে পারাবার?

৪

অথবা
দেখগো তোমারি মত,
হৃদয়ে তরঙ্গ শত

গর্জ্জিয়া উঠিয়া পুন পড়ে নিজ গায় ;
জানেনা কাহার তরে.
অজ্ঞেয় আকাঙ্ক্ষা ধরে,
আঁধার গর্জ্জন তাই আঁধারে মিলায় !
এ পরাণ নহে বিন্দু,
তোমারি মতন সিন্ধু
অনন্ত প্রবাহ তার, অসীম প্রসার ;
সাগরে সাগর তাই,
আজি মিশাইতে চাই ;
এসো এসো আলিঙ্গন করি পারাবার !

(৫)

বুঝিতে পারিনি যাহা,
তুমি কিগো জান তাহা ?
জান কি অতীত কি,সে ? কোথা সে লুকায় ?
কার্থেজ্ হইল ভস্ম ;
বাবিলন হ'ল ধ্বংস ;
লুপ্তকুরু পাণ্ডু বংশ, ব্রহ্মে হায় হায় !
কোথা চন্দ্রগুপ্ত রাজা ?
অশোক, পুণ্যের ধ্বজা ?
কোথা সে মগধ পুরী নব পাটনায় ?
আজি বৃন্দাবন ধামে,
আর কিশোরীর নামে,
প্রেমের বাঁশরী ধ্বনী কই শোনা যায় ?
ওইনা আসিব বোলে,
মথুরায় গেল চোলে,
কাঁদিছে গোপের বালা, কোথা শ্যামরায় ?
সহচরী সহচর,
হাসি, ক্রীড়া নিরন্তর,
প্রণয়, বিচ্ছেদ মিষ্ট; লুকাল কোথায় ?
সেই অভিমান রাশি,
প্রেম চেয়ে ভালবাসি ;
মিছে রাগ, মিছে কান্না মিছে যাতনায় ?

৬

আমার সে বৃন্দাবন, ?
সেই চারু চন্দ্রানন ?
প্রেমের সে জলকেলি প্রিয় যমুনায় ?
জল বুদ্বুদের মত,
কোথা গেল জানিনে ত ?
নরভাগ্য দগ্ধ এত কেন, কে বুঝায় ?

৭

কোথা বা সম্ভোগ সুখ, বল বর্ত্তমানে ?
দুরন্ত অতীত স্মৃতি,
তিক্ত করে নব প্রীতি,
উপজে কত না ভীতি, দুর্ব্বল পরাণে।
এই যাহা আছে মম,
কে জানে তাহার ক্রম ?
এই চারু বিম্বাধর, এই অনুরাগ,
জানিনা কদিন পরে,
ফাঁকি দিয়ে যাবে মোরে,
পরাণে রহিবে শুধু চিতা-ভস্ম-দাগ ! !
ধরিতে নবীনে তাই,
আশার সে আশা নাই ;
তাইতো লুকাতে চাই, ও অতল তলে,
আছে কি নির্ব্বাণ-সুখ ; সিন্ধু, তোর জলে ?

৮

জানিনা কি ভবিষ্যৎ, অন্ধকার পারে ;
আছে কি জ্যোছনা তথা ?
মৃত যত প্রিয়-লতা
অঙ্কুরিত বল কি, তা পাব দেখিবারে ?
অজ্ঞেয় অজ্ঞাত যাহা
বুঝিতে কি পাব তাহা ?
মরণে জীবন নব, সত্য কি তা শুনি ?
পাবে বারি দগ্ধ মরু ?
জনমিবে সুখতরু
সেই দুঃখ বীজ হতে, রেখেছি যা বুনি ?

ক্ষণেক গর্জ্জন ভুলি,
শোন সিন্ধু কথাগুলি।

চারিদিকে অন্ধকার শুধুই ছাইল;
"তুচ্ছ মানবের দুঃখ" সাগর গর্জ্জিল!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মহিমাধর্ম্ম।

(২)

অতঃপর তিনি পশ্চিমাঞ্চলের বহুতর স্থান পরিভ্রমণ ও তৎসঙ্গে বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী উদাসীন ও পণ্ডিতগণের সহিত বিচার পুরঃসর মহিমাধর্ম্মের তত্ত্ব সকলকে প্রচারিত করিয়া উৎকল-ভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তখনও পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দ দাস সমাধি-সিন্ধুর সুগভীরতলে নিবিষ্ট ছিলেন। তিনি গোবিন্দ দাসকে সমাধি হইতে সচেতন করিয়া এই নব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মালোক বিস্তারের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দ দাস এদিকে ধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত রহিলেন, তিনি ওদিকে ঢেঙ্কানল নামক প্রসিদ্ধ ও সভ্যতর রাজ্যের সমীপবর্ত্তী কপিলাস পর্ব্বতে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কপিলাস উৎকলদেশের মধ্যে একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রকাণ্ড পর্ব্বত, একদিকে ইহার জল বায়ু যেমন মনুষ্য শরীরের পক্ষে বিলক্ষণ হিতকর ও স্বাস্থ্য-সাধক, অপরদিকে ইহার প্রকৃতি ও সৌন্দর্য্যও সেইরূপ নয়নমনের সুখকর ও আনন্দ সম্পাদক। সেই জন্য এদেশীয় লোকেরা উপমা-স্থানে বঙ্গদেশের দার্জ্জিলিংএর ন্যায় কপিলাস গিরিকে উৎকলের দার্জিলিং বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।* যাহা হউক পুরাকালে এই নয়নানন্দকর প্রশান্ত পর্ব্বত-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া যে অনেক সাধু সন্ন্যাসী তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা এই সমুন্নত গিরির শিখর-দেশে আরোহণ করিলেই জানিতে পারা যায়। কারণ ঐ স্থানে পর্ব্বত-পৃষ্ঠ-খোদিত অনেক সুরম্য গুম্ফা অর্থাৎ গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু এই পর্ব্বতারোহণের মধ্যবর্ত্তী পথের পার্শ্বদেশে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যাহাকে এদেশীয় লোকেরা কপিলঋষির গুহা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই সুবিশাল অরণ্যমালাপূর্ণ; হস্তীভল্লুকব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদ-সমাকীর্ণ গিরিরাজি যে তপস্যার স্থান বলিয়া পুরাকাল হইতে উৎকলে প্রসিদ্ধ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এখন এই নবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বাবাজী কপিলাসাচলে গমন করিয়া কঠোর সমাধি-ব্রতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহার অবস্থা সময় সময় এরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত যে, তিনি একেবারে হত-চেতন ও অসাড় হইয়া পড়িতেন। তখন শিষ্যগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার সচেতনতা সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইত। এইরূপে সমাধি ও সাধনার সহিত কয়েক বৎসর কাল কপিলাসে ক্ষেপণ করিয়া, তথা হইতে

---

* শ্রীযুক্ত দামোদর পট্টনায়ক প্রণীত 'কপিলাস-ক্ষেত্র' নামক উৎকলভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে এই পর্ব্বতের সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

অবতরণ পূর্ব্বক পুনরায় প্রচার-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময় তাঁহার শিষ্য সকল এত বিস্তৃত সংখ্যায় পরিণত হইয়াছিল যে, স্বভাবতঃ তাহারা অপরাপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে স্থানে গমন করিতেন, সেই স্থানেই শত শত লোক তাঁহার অনুগমন করিত, শত শত লোক একত্রে সমবেত হইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিত। কপিলাস পর্ব্বত হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি অরণ্যস্থিত কুম্ভীবৃক্ষের পট অর্থাৎ বল্কল পরিধান করেন, সেই জন্য সেই সময় হইতে এই ধর্ম্মসম্প্রদায় কুম্ভপাতিয়া নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কুম্ভপাতিয়ার ন্যায় এই সম্প্রদায় অলখ্ সম্প্রদায় ও মহিমা সম্প্রদায় নামে সাধারণের নিকট বিদিত। বলা বাহুল্য যে, শেষোক্ত নামদ্বয় এই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তৎপরে ধর্ম্ম সংস্থাপনোদ্দেশে মহিমা বাবাজী উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশের নানা স্থান পর্য্যটন করেন। পার্ব্বত্য প্রদেশীয় পান, শবর, পাতিয়া প্রভৃতি অসভ্য-জাতির মধ্য হইতে সহস্র সহস্র লোক বিনা বিচারে তাঁহার নিকট এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্যেরা মহানদীর তীরস্থিত, মালবেহারপুর নামক গ্রামে একটি ধুনীঘর নির্ম্মাণ করে। তিনি তথায় যাইয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল এইরূপে নিজমত-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-প্রচার ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করিয়া কপিলাস পর্ব্বতের অনূ্যন দুই ক্রোশ পশ্চিমে জোরেন্দা নামক গ্রামে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মৃত্যুকালে এক সহস্র গৃহত্যাগী উদাসীন এবং প্রায় লক্ষ গৃহীলোক তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল।

এখন আমরা দেখিব তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের তাৎপর্য্য কি? লোকে সচরাচর এই ধর্ম্মকে মহিমাধর্ম্ম ও অলখ্ ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া থাকে। মহিমার্ণব পরমেশ্বরের মহিমাসংস্থাপনোদ্দেশে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, বোধ হয় সেই জন্যই ইহার নাম মহিমাধর্ম্ম হইবে। এবং অলেখ্ অর্থাৎ অলেখ্য-শক্তি ঈশ্বরের ধর্ম্ম বলিয়া ইহার নাম অলেখ্ বা অলখ্ ধর্ম্ম হইয়া থাকিবে। অলখস্বামী ব্রহ্মতত্ব নামক গ্রন্থে স্বাজিংশৎ আজ্ঞা প্রচার করিয়া এই ধর্ম্মের মতামত সকল বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা সেই সকল আদেশ অনুবাদের সহিত পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিলাম।

১। অলেখ অনাকার পরমেশ্বরের উপাসনা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সার হয়।

২। সদ্গুরুর সেবা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন কর।

৩। অনুভবের দ্বারা অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

৪। অণিমাদি অষ্টযোগ সাধন দ্বারা আত্মাকে মুক্ত কর;

৫। নিজ শক্তি দ্বারা তপস্যা করিয়া সাত্বিক ধর্ম্ম গ্রহণ কর।

৬। পবিত্র আত্মাতে সহস্রদলান্তর্গত জ্যোতির্ব্রহ্মকে ধ্যান কর।

৭। ভক্তি পূর্ব্বক পরমাত্মার সেবা কর।

৮। তিন সন্ধ্যা নাম মন্ত্র জপ করিয়া শরীর, মন, আত্মাকে পবিত্র কর।

৯। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ধারণা প্রভৃতি সাধন কর।

১০। পরম শাস্ত্রের প্রচার এবং অভ্যাসের দ্বারা আত্মাকে তৃপ্ত কর।

১১। লোকদিগের নিকট ঈশ্বরের গুণ-কীর্ত্তন কর।

১২। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না এবং সাক্ষাৎ সত্য কহিবে।

১৩। ধৈর্য্য দ্বারা শান্তশীল হইবে।

১৪। সাধ্যানুসারে জীবের প্রতি দয়া কর।

১৫। দোষী ব্যক্তির দোষ ক্ষমা করিবে।

১৬। নিষ্কপট হৃদয়ে নিয়াম ও অহিংসা ব্রত পালন করিবে।

১৭। নিজমত রক্ষা পূর্ব্বক লোকদিগের উপকার কর।

১৮। ভাব ও প্রীতির দ্বারা সকলকে সমান দেখিয়া সমদর্শী হও।

১৯। লোভে পড়িয়া পরদ্রব্য চুরি করিও না।

২০। উপকার না দেখিলে কুসঙ্গ ও মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিবে।

২১। জাতি, গোত্র, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবে।

২২। পঙ্কিল ভাবে লোকদিগের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া নির্লিপ্ত ও উদাসভাবে অবস্থান কর।

২৩। নরনারীকে পিতা মাতা জ্ঞান করিয়া মায়া-পাশ ছেদন কর।

২৪। একেশ্বরবাদী সাধু অতিথিদিগকে যথাশক্তি সেবা করিয়া উপদেশ দান কর।

২৫। নিজের প্রশংসা ও স্বজনদিগের প্রতি নিন্দা ও উপহাস করিবে না।

২৬। পুণ্যপথ আশ্রয় করিয়া পাপকে ঘৃণা ও ত্যাগ করিবে।

২৭। নির্ব্বিকার দ্বারা বিকার পরিত্যাগ কর।

২৮। পঞ্চকোষ শরীর ও সমস্ত জড়প্রতিমার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্তা পরমেশ্বরকে আশ্রয় কর।

২৯। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি করিয়া পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত সাধু ও শাস্ত্র বাক্যের সারাংশ গ্রহণ কর।

৩০। ধর্ম্মাত্মাকে সাক্ষী মানিয়া আত্মদ্রোহ করিও না।

৩১। সর্ব্বদা আলস্য ত্যাগ করিয়া এই সম্প্রদায় বৃদ্ধি কর।

৩২। শ্রদ্ধার সহিত এই বত্রিশ আজ্ঞা পালন কর এবং লোকের হিতের নিমিত্ত ইহা প্রচার কর।

উল্লিখিত আদেশ সকল পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যাইতেছে যে, এই সম্প্রদায়স্থ লোকেরা জড়মূর্ত্তির পূজা করে না, ইহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের উপরে। ইহারা পুত্তলিকার চরণে কোনরূপেই মস্তক অবনত করিতে চাহে না, এমন কি এই সম্প্রদায়স্থ অনেক লোকে একবার দলবদ্ধ হইয়া জগন্নাথ মূর্ত্তিকে চূর্ণ করিবার জন্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। মহিমাধর্ম্ম একদিকে যেমন পৌত্তলিকতার প্রবল প্রতিরোধী, অন্যদিকে ইহা সেইরূপ জাতিভেদ স্বীকার করে না। রাজা, বেশ্যা ও রজক এই তিন শ্রেণীর লোক ভিন্ন ইহারা সকল জাতির হস্তের অন্ন সচ্ছন্দে ভোজন করিয়া থাকে। তৎপরে সদ্‌গুরুর আনুগত্য স্বীকার ও তাঁহার সেবাদ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করা যায়, ইহা মহিমাধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি প্রবল

বিশ্বাস; কারণ পূর্ব্বোল্লিখিত বত্রিশ আজ্ঞার মধ্যে দ্বিতীয় আজ্ঞাতেই ইহা পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে। সেই কারণে ইহাদিগের মধ্যে গুরুপদের বিশেষ প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকে। ঐ সকল আদেশ পাঠ করিয়া আরও জানিতে পারা যায় যে ইহাদিগের সাধন প্রণালী, নামজপ, অণিমালঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি সাধকযোগ প্রণালী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতেছে। এই সম্প্রদায় প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, এক শ্রেণী গৃহী, অপর শ্রেণী উদাসীন। গৃহীরা আবার নামাশ্রিত প্রভৃতি তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উদাসীনদিগের মধ্যেও আচারী প্রভৃতি তিন সম্প্রদায় আছে, আচারী সম্প্রদায়স্থ লোকেরা নিজে রন্ধন করিয়া খায় এবং দিবাভাগের মধ্যে তিনবার স্নান করিয়া থাকে। গৃহীরা প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া রক্তবর্ণ সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অলখ্ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করে এবং দিবাবসান সময়েও সেইরূপ সূর্য্যমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অলখ্ নাম উচ্চারণ পুরঃসর প্রণাম করিয়া থাকে। প্রথমে নামজপ সাধনে সিদ্ধ হইলে তৎপরে অন্যান্য সাধনপথ অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদিগের যোগপ্রণালী আট অঙ্গে বিভক্ত;—(১) নাম সাধন (২) যন্ত্রসাধন (৩) ছায়া সাধন (৪) অঘাড় সাধন (৫) পবন সাধন (৬) ধ্যান (৭) অনাহতের শব্দ শ্রবণ (৮) আসন সাধন। ইহাদিগের যোগের অঙ্গ যেমন আট প্রকার, সেইরূপ ইহাদিগের যোগও ধনঞ্জয়-যোগ, মৃত্যুঞ্জয় যোগ, সমাধিযোগ, প্রভৃতি আট শ্রেণীতে বিভক্ত। মহিমাধর্ম্ম প্রচারক অবধূতেরা দীক্ষার সময় দীক্ষার্থীকে প্রথমে প্রণামসাধন শিক্ষা দেয় অর্থাৎ গুরুর প্রতি প্রণাম, ঈশ্বরের প্রতি প্রণাম প্রভৃতি প্রণাম কিরূপে করিতে হয় তাহার উপদেশ দিয়া থাকে। তৎপরে জাতিভেদ ও দেবোদ্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ নিষেধ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকে, তাহার পর নামসাধন এইরূপে উত্তরোত্তর উচ্চতর অঙ্গের সাধন সকলে শিক্ষা দিতে থাকে।

উপরিউক্ত দ্বাত্রিংশৎ আদেশের মধ্যে যদিও অন্যান্য আদেশ সকলে ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ উপদেশ কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু বিংশতি আদেশের মধ্যে যে মত পরিব্যক্ত হইয়াছে আমরা তাহার সহিত কোনরূপেই একমত হইতে পারি নাই। অর্থাৎ ঐ আদেশের মধ্যে লিখিত হইয়াছে, যে, "বিনা উপকারে কুসঙ্গ ও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিবে না," তাহা হইলে এতদ্বারা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পাইতেছে যে, উপকারের সম্ভাবনা দেখিলে কুসংসর্গ ও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিবে। এরূপ অনর্থকর সুনীতি বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে আদেশ প্রদান করা যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মনিয়মের বহির্ভূত ব্যাপার তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাহউক এপ্রস্তাব সম্বন্ধে আর কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা বলিয়া আমরা ইহার উপসংহার করিতেছি। মহিমাধর্ম্মাবলম্বীদিগের সাধনার নিমিত্ত প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এক একটী টুঙ্গী অর্থাৎ সামান্য কুটীরের ন্যায় ঘর আছে। ইহারা সন্ধ্যাকালে তাহার মধ্যে সমবেত হইয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, সাধন, ভজন এবং পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীত করিয়া থাকে। ইহাদিগের সঙ্গীত সকলে অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের

স্বরূপ ও গুণ-প্রসঙ্গ এবং মধ্যে মধ্যে জড়োপাসনার বিরোধ-ব্যঞ্জক বাক্য সকলও নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এই পৌত্তলিকতাবিরোধী একেশ্বরোপাসক সম্প্রদায়ের কোন তীর্থ নাই এবং ইহারা তীর্থের মাহাত্ম্যও স্বীকার করে না। তবে ইহারা জোরেন্দা গ্রামের সমাধিকে পরম পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচনা করে, কারণ সেই স্থানে অলথ স্বামীর সমাধি হইয়াছে। কিছুদিন হইল এই সম্প্রদায়কে দিন দিন বহু বিস্তৃত হইতে দেখিয়া রাজবিদ্রোহী বিবেচনায় গভর্ণমেণ্ট নরসিংহ দাস নামক একজন অবধূতকে কটকে আনিয়া তিন মাস কাল কারারুদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া দেন। বাস্তবিক ইহারা রাজবিদ্রোহীও নহে, অথবা সমাজদ্রোহীও নহে। ইহারা শান্তচিত্তে সরল ভাবে নানাস্থানে আপনাদের মত পরিব্যক্ত করিয়া থাকে। মহিমাবাবাজীর মৃত্যুর পর হইতে অদ্যাবধি প্রায় একাদশ বৎসরের মধ্যে চৌষটি জন লোক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অবধূত বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। যদিও এই সকল প্রচারকদিগের বুদ্ধি তত মার্জ্জিত নহে; মস্তিষ্ক তত প্রসারিত নহে; ধারণাশক্তি তত উজ্জ্বল নহে, গবেষণা তত বিস্তৃত নহে এবং বিচারপদ্ধতি তত তীক্ষ্ণ নহে এবং এমন কি ইহাদিগের মধ্যেও যদিও অনেকে নিরক্ষর, তথাপি ইহাদিগের অমার্জ্জিতবুদ্ধিপ্রসূত অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন-হৃদয় নিঃসৃত উৎসাহশিখাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি না।

ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ বিস্তারের নিমিত্ত অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল হইল বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজ নামে একেশ্বরবাদীদিগের একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। ইহাঁদিগের মধ্যে সুশিক্ষিত মার্জ্জিতমনা অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, ইহাঁদিগের মধ্যে অনেক মর্য্যাদাবান্, ধনবান্ এবং সম্ভ্রমবলে বলীয়ান্ ব্যক্তি আছেন, ইহাঁদিগের মধ্যে অনেক হৃদয়োদ্দীপনকারিণীবাগ্মিতাসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, তথাচ অজ্ঞানান্ধ অসভ্য লোকসমাকীর্ণ এই মহিমাসম্প্রদায়ে এত অল্পকালের মধ্যে যে অধ্যবসায় ও উৎসাহাদির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এই পণ্ডিত ও সজ্জনপরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ধর্ম্মসমাজের ইতিহাসে এই দীর্ঘকালের মধ্যেও তাহার শতাংশের একাংশও পরিলক্ষিত হইতেছে না। যে পরিশুদ্ধপুণ্যালোক-স্রাবিনী তেজোনিঃসারিনী সুস্নিগ্ধ স্বর্গীয় আলোকশিখায় জগতের সকল অন্ধকার তিরোহিত হইবে, অধর্ম্ম বংশের বিলোপ হইবে, অজ্ঞানবিভাবরীর অবসান হইবে, কেন সেই আলোক দিন দিন ম্লানভাব ধারণ করিতেছে, কেন সেই আলোকশিখা মেঘান্তরালবর্ত্তিনী তরুণ সূর্য্যশিখাবৎ উত্তরোত্তর অস্পষ্টীকৃত ও মন্দীভূত হইয়া বিনাশদশায় নীয়মান হইতেছে? যে সূর্য্য জগতের অন্ধকার তিরোধানের জন্য, বঙ্গদেশে অভ্যুদিত হইয়াছিল; কেন সেই সূর্য্যালোক মধ্যাহ্নদশায় পদার্পণের পূর্ব্বে এই সঙ্কীর্ণ বঙ্গসীমার মধ্যেই নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়া পড়িতেছে? ভারতের অদৃষ্টে কি তবে পরিত্রাণ-মুকুট নাই? এই অধঃপতিত জাতির কি তবে আর সদগতির আশা নাই? নিশ্চয় আছে, চাই উৎসাহ এবং জীবন অধ্যবসায় এবং একপ্রাণতা।

মহিমাধর্ম্মাবলম্বীরা জাতিভেদের শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়াছে, জড়োপাসনা ও পৌত্তলি-

কতার প্রতিকূলে সতেজে দণ্ডায়মান হইয়াছে। বলিতে গেলে তাহারা ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্মমতের অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে তাহাদিগের মধ্যে দিন দিন নানা প্রকার কুসংস্কার প্রশ্রয় পাইতেছে; ব্যভিচারাদি ধর্ম্মবিগর্হিত নানাপ্রকার কুনীতি সকলও তাহাদিগের সমাজ মধ্যে অল্পে অল্পে প্রাদুর্ভূত হইতেছে এবং জ্ঞানাভাব নিবন্ধন ত্রুটি সকলও এই সম্প্রদায়ে দিন দিন সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছে। একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের প্রচারকগণ এবং বন্ধুগণ! আমি আপনাদিগকে ধর্ম্মপ্রচারের নামে এবং জগতের হিত ব্রতের নামে আহ্বান করিতেছি এবং জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনাদের দৃষ্টি কি এই পতনোন্মুখ একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের দিকে পতিত হয় না? ইহাদিগের সংস্কার এবং উন্নতির জন্য কি আপনাদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায় জাগ্রত হয় না? সুদূরবর্ত্তী ইংলণ্ড এবং আমেরিকার জন্য আপনাদের চিন্তা সকলিত হইয়া উঠে, কিন্তু যাহারা আপনাদিগের বিশুদ্ধ ধর্ম্মপথের এত দূরে অগ্রসর হইয়াছে এবং যাঁহারা আপনাদিগের প্রতিবাসীস্বরূপ, তাহাদিগকে আহ্বানের জন্য যদি আপনাদিগের হস্ত প্রসারিত না হইল, তবে কি জানি, আপনাদের প্রচার পদ্ধতির কিরূপ অর্থ!

সমাপ্ত।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

জাতীয় ভাষার আবশ্যকতা।

মানুষ কথা কয়, মানুষ শুনে। মানুষ মনের ভাব ব্যক্ত করে, মানুষ কাণ পাতিয়া শুনিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করে। মানুষের মনের ভাব যদ্দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাকেই শব্দ বলে। কতকগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ শব্দের নাম পদ। সুশৃঙ্খলাবদ্ধ পদ সমষ্টির নাম ভাষা। সুতরাং যদ্দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত হয়, তাহাই ভাষা। ভাষা ভিন্ন মানুষ মানুষকে চিনিতে বা বুঝিতে পারে না। একতার প্রথম জিনিস, পরস্পরকে জানা, বুঝা। যাহাকে জানা যায় নাই,—সে ব্যক্তি কল্পনার আঁধার-মাখা ছায়া-জগতে জীবিত, তার সহিত আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইতে চাওয়া মহাভ্রান্তি। যাহাকে জানিয়াছি, দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি,—স্থূলত তাহাকেই ভালবাসি। পরিচিত বা জানিত লোককে ভালবাসাই মানুষের স্বভাব। অর্থাৎ প্রেমের মূলে জ্ঞান। ভাষা জ্ঞান-সোপান। অতএব বুঝা যাইতেছে, ভাষাই মানুষকে আত্মীয়তার জগতে বা মিলনের জগতে টানিতেছে। যে জগতে ভাষা নাই, সে জগতে মিলন নাই, একতা নাই,—প্রেম নাই, কিছুই নাই।

এই জগত ভাষাময়। জড়ই বল আর চেতনই বল,—সকলই যেন কি একটা ভাবে বিভোর। কেহ কথা কয়, কেহ কয় না—কিন্তু সকলই ভাবে বিভোর। ফুল হাসে,

পাখী গায়, সূর্য্য জ্যোতি ঢালে, নক্ষত্র মধুর চাহনি চায়, নদী চলে, সময় বয়—এসকলই কি জানি একটা মহা ভাবে বিভোর। কেহ কেহ বলেন, চেতন ভিন্ন আর কোন কিছু মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারে না। মিথ্যা কথা। সকলই ভাবে বিভোর—সকলই আপন আপন বিশেষত্ব জগতে ঢালিতেছে। সকলই কি যেন এক অলক্ষিত গুপ্ত শক্তির মহিমা-গীতি গাইতেছে। তাই বলি, এই জগত ভাষাময়, কাব্যময়। ভাষাময়ই বল বা সঙ্গীতময়ই বল। যা খুসি। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে,—চেতন এবং অচেতন,সমস্তই আমাদিগকে নূতন নূতন রাজ্যে লইয়া যাইতেছে। ফুলটী বাগানে ফুটিয়া, পাতাটী মৃদু দোলনে দুলিয়া—কি অমৃত ঢালিল, কি করিয়া যেন প্রাণ কাড়িয়া লইল। তোমরা বলিতে পার, ওত সব জড়, প্রাণ কাড়িবার ওদের কোনই শক্তি নাই। কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সকলেরই প্রাণ কাড়িবার শক্তি আছে। সকলই কোন না কোন ভাবে, কোন না কোন রূপে প্রাণ কাড়িতেছে। প্রাণ কাড়িয়া আপন প্রাণে বাঁধিতেছে। ফুলটীকে কেন বল ত মানুষ অত দেখে,—কেন বল ত দেব-সেবায় দেয়,—কেন বল ত হৃদয়ে পরে? ফুলটী কি যেন এক মধুর কথায়, মধুর আকর্ষণে মানুষকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। তাই তাকে মানুষ এত ভালবাসে। মানুষ কণ্টকের ভয় করে না—মানুষ ফুল তুলিয়া গলে পরে। যে যাকে ভালবাসে, সে তাকে ফুল দেয়। সুসভ্য এবং অসভ্য —সকল লোক এই ফুলের নিকট আত্ম-বিক্রীত। এইরূপে দেখা যায়, জগতের সকল অণু পরমাণু, জীব জন্তু আপন ভাষায় অপরকে পরিচয় দিয়া, আপন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সকলকে প্রাণের পানে টানিতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জীব, জন্তু, জড়, অজড়, সকলই আপন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া এক মহাপ্রাণতায় সকলকে বাঁধিতেছে। কেহবা নীরবে, কেহবা সরবে, আপন তত্ত্ব জগতে ঘোষণা করিতেছে! কার ইঙ্গিতে কে জানে, সকলই হাসে, গায়, কথা কয়, ভাব ঢালে।

তবে বুঝা যাইতেছে,—ভাষা সরব, এবং নীরব। জীবের ভাষা, সরব; জড়ের ভাষা,—ফুলের ভাষা, চন্দ্র সূর্য্যের ভাষা—নীরব। ভাষার কাজ প্রাণের পরিচয় দেওয়া, প্রাণ কাড়া, প্রাণে প্রাণ বাঁধা। সে কাজ কিন্তু এই নীরব এবং সরব, উভয় ভাষার দ্বারাই সাধিত হয়। বহুদিন পর প্রণয়ী যুগলের মিলন হইয়াছে, নয়নে মাত্র দুই বিন্দু জল, মুখে কথাটি নাই;—তবু উভয়ে উভয়ের ভাষা বুঝিয়া লইতেছে; উভয়ে উভয়ের প্রাণে ডুবিতেছে। পরস্পরকে বুঝিয়া লওয়া যদি কথা,তবে উভয়ের দেখা সাক্ষাতেই বুঝা শুনা হইতেছে। এখানেও নীরব ভাষার নীরব কার্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু অনেক সময় মানুষ কথা না বলিয়া প্রাণের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। পারিলেও তাহা মানুষ সব সময় বুঝে না। এই জন্যই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষার সৃষ্টিতে মানুষের মিলনের যে একটা অতি আশ্চর্য্য জগৎ খুলিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। নীরব ভাষার শক্তি কেবল বর্ত্তমান লইয়া,সরব ভাষার শক্তি অতীত এবং ভবিষ্যতের পরপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নীরব

ভাষা দেখা সাক্ষাতে মাত্র কার্য্যকরী; কিন্তু সরব ভাষা লিপিবদ্ধ হইয়া অনন্ত কাল মানবজগতে শক্তি বিকীর্ণ করিতেছে। একটা ক্ষণস্থায়ী,—এই আছে, এই নাই;—মাদকতা,—উন্মত্ততা,—বা কেবল ভাবময়। আর একটা অনন্তকাল স্থায়ী,—ভাবের অতীত, চিন্তাময়,—জীবনময়।

ইংরাজ জাতি আজ জগতের সকলের প্রিয়। কেন বল ত?—বাহুবলে, ধন বলে, ঐশ্বর্য্য বলে? মিথ্যা কথা। ইংরাজজাতি প্রধানত ভাষার মোহিনী সঞ্জীবনী মন্ত্রে জগৎকে এক প্রাণে বাঁধিতেছে। কোথায় কোন যুগে সেক্ষপীয়র বা মিল্টন জন্মিয়াছিলেন, আজও তাঁহারা যেন জীবিত। তাঁহারা জীবিতের ন্যায় কত কথাই বলিতেছেন, কত ভাবই ঢালিতেছেন, কত মিলনের সংবাদই আনিতেছেন। অতীত জগত—বর্ত্তমান জগতে বাঁধা। বর্ত্তমান—ভবিষ্যতের করে বাঁধা। অনন্তকাল ব্যাপিয়া ঐ মধুর সঙ্গীতরব উঠিতেছে—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎকে বাঁধিতেছে। ভাষা কালের অতীত। কেবল কি তাহাই? ভাষা দেশেরও অতীত। ভাষা যাকে পায়, তাকেই মাতায়, তাকেই বাঁধে, তাকেই কাঁদায়। ইংলণ্ড আজ পৃথিবীর প্রাণের জিনিস। ইংলণ্ড আজ পৃথিবীতে একভূত। ইংরাজি ভাষা আজ দেশে দেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, মিলনের মূল মন্ত্র। ইংরাজি ভাষার গৌরব আজ সকলের মুখে কীর্ত্তিত হইতেছে। পৃথিবীকে এইরূপ একপ্রাণতার স্বর্গীয় মন্ত্রে দীক্ষা দিতেছে যে ইংরাজি ভাষা, ইহা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল? মাত্র দুটী দশটী লোকের মুখের অস্পষ্ট শব্দে নিবদ্ধ ছিল। আর আজ দেখ, পৃথিবীর আর সকল ভাষা যেন নিবিয়া যাইতেছে, ইংরাজি ভাষা নবজীবন পাইতেছে। অথবা আর সমস্ত ভাষা যেন আপন অস্তিত্ব ইহাতে মিশাইয়া কলেবর ত্যাগ করিতেছে। আজ লাটিন, গ্রীক, এবং দেবভাষা সংস্কৃতের এত অনাদর, আর দেখ আসুরিক ভাষা ইংরাজির কত আদর।

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশক। যখন যে দেশে মানুষের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখনই সেই দেশে একটা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। জড় অবস্থায় নীরব ভাষা। অসভ্য অবস্থা জড় অবস্থার একটু উপরে। সেখানেও ভাষা আছে, কিন্তু তাহা লিপিবদ্ধ নয়। বিবর্ত্তনবাদের মূলে যতদূর যাইতে চাও, যাও, দেখিবে, সর্ব্বত্রই ভাষা আছে, কিন্তু কোথাও সরব, কোথাও নীরব, এই মাত্র প্রভেদ। কোথাও মৃত, কোথাও ক্ষণস্থায়ী,—কোথাও জীবন্ত, কোথাও অনন্তকালস্থায়ী। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিতেছেন যে, জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি হইতেছে। অথবা জড় ও চেতনের মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম স্থান আছে, যাহা নির্ণয় করিতে মানুষের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়। চেতন আবার নানারূপ অবস্থা ও রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া সুসভ্য মানবদেহ ধারণ করিতেছ। সৃষ্টিতত্ত্বের এ গূঢ় রহস্যে লোকের সন্দেহ থাকে, থাকুক, কিন্তু একথায় কাহারও সন্দেহ থাকিবার উপায় নাই যে, মানুষ যতই সভ্য হয়, ততই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। অর্থাৎ ততই লোকের মনোভাব প্রকাশের সহজ উপায় আবিষ্কার হয়। কিম্বা যতদিন মানুষ জীবিত, ততদিনই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন, তৎপরই ভাষার হীনাবস্থা। প্রাচীন লাটিন, গ্রীক এবং সংস্কৃত ভাষার স্থানে যে

ইংরাজি ভাষা বৈজয়ন্তী উড়াইতেছে, ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হয় যে, প্রাচীন রোমক, গ্রীক বা হিন্দুজাতি মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। বস্তুত কথাও তাই। যে সময় হইতে পবিত্র সংস্কৃত ভাষা, লাটিন এবং গ্রীক ভাষার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে পৃথিবীর প্রাচীন গৌরব ঐ উন্নত জাতি সকলের মহাপতন হইয়াছে। সেই সময় হইতে রোম জাতির অবনতি, গ্রীক জাতির হীনাবস্থা, এবং আর্য্য-জাতির মহাপতন হইয়াছে। আর্য্য-জাতি নাই—তাই আর্য্যভাষা নাই; তাই ভারতভূমে ইংরাজির এত আদর! কোন জীবিত জাতি যে পরমুখে কথা কহিতে পারে না, এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া আর উপায় নাই।

মানুষ জীবিত না মৃত? একথার প্রমাণ কিসে পাওয়া যায়? মানুষ কথা কয় কি না কয়;—ইহাতে। নিঃশ্বাস বহে কি না বহে, এও জীবন মরণের একটা পরীক্ষার ব্যাপার বটে, কিন্তু যে জীবন মরণ শরীর সম্বন্ধীয়। মানুষ শরীর ধারণ করিয়াও মরণের কোলে পড়িয়া থাকিতে পারে। মানুষ বাঁচিয়াও মৃতের ন্যায় থাকিতে পারে। যে বীজে মানুষের উৎপত্তি হয়, সে বীজে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবিত অনেক পরমাণু থাকে; কিন্তু কথাও বলে না, নিঃশ্বাসও ফেলে না। এই জন্য তাহাদিগকে কেহ জীবিত বলে না, বুঝিলাম। শিশু যখন জরায়ু গর্ভে অল্পে অল্পে সর্ব্বাবয়ব পাইয়াছে, তখনও সে কথা বলে না, কিম্বা নিঃশ্বাস ফেলে না। বলত সে জীবিত কিনা? সকলেই বলে, জরায়ুগর্ভে শিশু জীবিত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্যতার ইতিহাসে তার নামে একটা মরণের কালির দাগ অঙ্কিত রহিয়াছে,—সে সভ্যতার জগতে আজিও জীবিত মানুষ বলিয়া পরিচিত হয় নাই। তারপর পৃথিবীতে কত কোটি কোটি অসভ্য মানুষ শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে তাহারা মৃতের ন্যায় ব্যবহৃত। পৃথিবীতে এইরূপ কত মানুষ জীবন ধারণ করিয়াও সভ্যতার জগতে বা মনুষ্যত্বের বাজারে যে মরিয়া রহিয়াছে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? অনেক মানুষ বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু জীবন ধারণের কোন স্মৃতি রাখিয়া যায় না, তাহারা মৃত অপেক্ষাও মৃত। তাহারা জীবন্মৃত। আর যাহারা মানুষ, তাহারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, কার্য্য করে। জীবন্ত মানুষের সমষ্টিতে জীবন্ত জাতির অভ্যুদয়। জীবন্ত জাতির অস্তিত্ব যেখানে, সেই স্থানেই জীবন্ত ভাষা। অথবা জীবন্ত ভাষাই জীবন্ত জাতির অস্তিত্ব ঘোষণা করে। জীবন্ত জাতির অভ্যুত্থান হইয়াছে, অথচ ভাষা জীবন্ত নাই, অথবা সেই জাতিকে একপ্রাণতায় বাঁধিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কোথাও নাই। সকল জীবন্ত জাতির সভ্যতার ইতিহাস খুলিয়া পাঠ কর,—জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, বুঝিতে পারিবে, জাতীয় অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার সৃষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। জাতীয় ভাষার উন্নতিতে জাতির উন্নতি, আবার জাতির উন্নতিতে ভাষার উন্নতি। দুই মেশামেশি, ঘেসাঘেসি। একের অবনতি যেখানে, সেখানে অপরের উন্নতি অসম্ভব। ভাষা নাই, জাতির অভ্যুত্থান

হইয়াছে,—একতা আসিয়াছে, ইহা কোথা-য়ও পাঠ করা যায় নাই। অথবা জাতি আছে, জীবন্ত মানুষ আছে, অথচ জাতীয় ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, ইহাও দেখা যায় নাই। জাতির উন্নতিতে ভাষার উন্নতি, ভাষার উন্নতিতে জাতির উন্নতি। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যাহা পৃথিবীতে আর কোথাও হয় নাই, তাহা ভারতে কেমনে সম্ভব হইবে? তাহা হওয়া অসম্ভব। ভারতে এক ভাষা যত দিন না হইবে, ততদিন ভারতে একপ্রাণতার মধুর মিলন বা জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব।

গত বৎসর জাতীয়-মহা-সমিতিতে এক-জন মহাত্মা বলিয়াছিলেন,—সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম-সংস্কার ও সমাজ সংস্কার মানুষের লক্ষ্য। তারপর যদি আর কিছু বাকী থাকে, তবে তাহা রাজনীতি-সংস্কার। আমরা বলি, সর্ব্বাগ্রে ভাষা-সংস্কার মানুষের লক্ষ্য, তারপর আর সকল সংস্কার। আগে মানুষ কথা কহিতে এবং কথা শুনিতে শিখে, তারপর অন্যান্য প্রকার উন্নতি করে। কথা বলা বা শুনার সুবিধা যার নাই, সে কেমনে উন্নতি করিবে? সব মানুষ কিছু মাটীতে পড়িয়া বড় হয় না। মানু-ষকে মানুষ করিতে হইলে—মানুষের দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে, মানুষের কথা শুনাইতে হইবে। মানুষকে মানুষ করিতে হইলে প্রাণময় জীবন্ত মানুষের প্রাণের কথা বলিতে হইবে;—কীর্ত্তিময় মানুষের মহা-কাহিনী শুনাইতে হইবে। ভাষার সাহায্য ভিন্ন ইহা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং ভাষার উন্নতি ভিন্ন মানুষের উন্নতি অসম্ভব। ব্যক্তিগত উন্নতি ভিন্ন জাতির উন্নতি অস-ম্ভব। যেখানে ভাষা নাই, সেস্থানে উন্ন-তিও নাই। ভাষা শূন্য জাতি পৃথিবীতে মরণের কোলে মহাকাল নিদ্রায় চির-নিদ্রিত!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পর মুখে কথা বলিয়া কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নাই। ইংরাজ জাতির অভ্যুত্থান একথা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে যে, যদি জাতিত্ব গঠনে চেষ্টা করিতে হয়, তবে জাতীয় ভাষার গঠনে সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিতে হইবে। এক দিন দুদিনের কথা নহে। এক শত দুশত বৎসরেরও কথা নহে। কোন জাতির উন্নতি একশত বা দুশত বৎসরে হয় নাই। সহস্র বৎসরের চেষ্টার পর সুফল ফলে। ভারতবর্ষে নানা জাতির নানা ভাষা। এই সমস্ত ভাষা মিলাইয়া এক করা বড় কঠিন ব্যাপার। তাত বটেই। সোজা হইলে সকলেইত একটা মিলন ঘটাইতে পারিত। কঠিন বলিয়াই তাহা সহজে হইতেছে না। কঠিন বলিয়াই হুজুগে বা বাল-গল্পের ক্রীড়ায় ও বাহ্য আন্দোলনে তাহা হইতেছে না। প্রকৃত উপায় অবলম্বন না করিলে তাহা হইবেও না। পৃথিবীতে যে ইংরাজি ভাষা এত পরিব্যাপ্ত হইবে, কেহ কি দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা কল্পনাও করিতে পারি-য়াছিল? কিন্তু আজ তাহা জগতে সংসা-ধিত হইয়াছে। ভারতের এক ভাষা হইবে; ইহা কল্পনা করিতেও এখন অনেকে ভীত হন। বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহারাই কিন্তু ভারতকে স্বাধীন করিবার আশার কুহকে মাতোয়ারা। যেটা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, সেটাকে সহজ মনে করেন, কিন্তু যেটা অপেক্ষাকৃত সহজ, অথচ জাতিত্ব গঠনের মূলভিত্তি, সেটাকে কল্পনার ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দেন।

ভাষার উত্তেজনা ভিন্ন কোন দেশের কোন পরিবর্ত্তন,—কোন প্রকার আমূল সংস্কার-কার্য্য সংসাধিত হয় নাই। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের কথাই বল বা ফরাশি বিপ্লবের কাহিনীই বল,এসকলই ভাষারূপ মহাশক্তির উদ্গীরণের ফল। ভল্টেয়ার, রুসো, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি অতি সামান্য সামান্য ব্যক্তির লেখনী এই ভাষার সাহায্যে পৃথিবীকে কিরূপ আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, দেখ। যেদেশে ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, সে দেশের উন্নতি হইয়াছে, শুনিয়াছ কখনও? আমরা কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে দৃষ্টান্ত পাইতেছি না।

ভারতকে একপ্রাণে বাঁধিতে ইচ্ছা থাকিলে, জাতীয় প্রাণের ভাষা সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। প্রাণের ভাষা, এ কিরূপ কথা? কথাটা এই। পৃথিবীতে দেখা যায়, দেশ কালের বিভিন্নতাতে, অবস্থাগত পার্থক্যে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্বর, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন লোকের আকৃতি এবং প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। সবই পৃথক্ পৃথক্। যে দেশের যেমন প্রাণ, সেই দেশের তেমন প্রাণের কথা। যার প্রাণে দুঃখ, সে দুঃখের কথাই বলে; যার প্রাণে সুখ, সে সুখের কথাই কয়। যার প্রাণে বীরত্ব—সে বীরত্বই প্রকাশ করে, যার প্রাণে প্রেমের কোমলতা, সে তাহাই জগতের লোককে জানায়। ভাষা প্রাণের ছায়া, তা নীরবই হউক, আর সরবই হউক। নীরব ভাষাও প্রাণের ছায়া, সরব ভাষাও প্রাণের ছায়া। যার প্রাণ যেমন,তার প্রাণের ছায়াও তেমনি। এই জন্যই দেখা যায়, পৃথিবীর নানা লোকের নানা ভাষা। আমার ভাষা তুমি বুঝ না, তোমার ভাষা আমি বুঝি না। তোমাকে আমি চিনি না, তুমিও আমাকে বুঝ না। আমি যা বলি তুমি তা অন্যরূপ বুঝ। আমি বলি, তোমাকে ভালবাসার কথা, তুমি বুঝ, আমি শত্রুতার ফন্দি বিস্তার করিতেছি! প্রাণের কথা একেবারে অন্যেকে খুলিয়া বুঝাইতে পারে, পৃথিবীতে আজও ভাষার তেমন শক্তি জন্মে নাই। সেই জন্যই ভাষাকে অনেক সময়েই অসম্পূর্ণ বলি, তবে যত টুকু মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারা সম্ভব, তাহা কিন্তু এই ভাষাই পারে। প্রাণের সব কথা ভাষা প্রকাশ করিতে পারে না বটে, কিন্তু কতক ত পারে। এই এই জন্যই ভাষার মহিমা কীর্ত্তন করি। ভাষা নানা জাতির নানারূপ। নানা জাতি, নানা রূপ। একরূপ ভাষা জগতের বিধান নয়—প্রকৃতি বা আকৃতিও জগতের সমস্ত জাতির একরূপ নয়। ধর্ম্ম সকলের এক নয়, ভাষাও এক নয়। তবে মোটামুটি ধরিতে গেলে, এক এক দেশের এক একটা মিলনের ঠাঁই পাওয়া যায়,—এক ধর্ম্ম বা এক ভাষার অর্থ ইহাই। সকলই পৃথক্ বটে, কিন্তু মিলনেরও ত ঠাঁই আছে। আছে বলিয়াই বলি, ইংরাজ জাতির যেমন ইংরাজি ভাষা, ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির তেমনই সংস্কৃত ভাষা ছিল। যে সংস্কৃত ভাষা এক সময়ে এক-প্রাণতায় আর্য্যাবর্ত্তের সকল নর-নারীকে বাঁধিয়াছিল, সেই দেশে নাকি ভাষার একতা আজ অসম্ভব! রামায়ণ, মহা-ভারতের কাহিনীতে ভারতের কাহার প্রাণ মোহিত নয়? কালীদাস, ভবভূতির লেখায় কার প্রাণ সরস হয় না? বেদ বেদান্তের স্বর্গীয় তত্ত্ব পাঠেই বা কাহার হৃদয় আনন্দিত হয় না? অধিকাংশ লোকে-

রই হয়। কারণ এই, অধিকাংশ লোকেরই প্রাণের কথার একটা মিলনের মন্ত্র যেন ঐ সকলে কীর্ত্তিত হইয়াছে;—অবস্থাগত, সমাজগত, দেশগত বা ধর্ম্মগত এক-ভাবে ভারতভূমির নর-নারীর মিলনের একটা জমাট ঠাঁই আছে। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে গান্ধার ও আরব সাগর, পূর্ব্বে বঙ্গ উপসাগর ও মগ-মুল্লুক,—ইহার মধ্য-ভাগের অবস্থা অনেকটা একরূপ। এক আর্য্যজাতির শোণিতযোগে ভারতের অধিকাংশ মিশ্রজাতির উৎপত্তি হই-য়াছে। এক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা এই দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম। এক হিন্দু সমাজের বক্ষে এক আচার প্রাণালীতে সকলে লালিত, পালিত ও দীক্ষিত। এক সংস্কৃত ভাষা, সক-লের মূল ভাষা। এক ইতিহাস, এক কাব্য, এক শাস্ত্র, একতন্ত্র সকলের উপদেষ্টা। এইত অধিকাংশ লোকের কথা বলা হইল। মুস-লমান সম্প্রদায়কে বাদ দিয়াই এ কথা বলি-লাম। রাজনীতির ধুয়া ছাড়িয়া দিলেও, ভারতবর্ষে হিন্দুর প্রাণ হিন্দুর প্রাণে মিলাইবার এই সকল উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এসকল সত্ত্বেও মিলন হইবে না কেন, আমরা কিছুই বুঝি না। মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত কি সূত্রে মিলিবে, সে কথাও সংক্ষেপে বলি।

বিদেশ হইতে আসিয়াও এখন মুসলমান সম্প্রদায় ভারতের জলবায়ুতে জীবিত থাকিয়া থাকিয়া আর্য্যজাতির কতকটা ধাতু প্রাপ্ত হইয়াছে। নানা রূপে আর্য্যজাতির অনু-প্রাণনে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক পরি-বর্ত্তন হইয়াছে। যে জাতি যখন প্রবল হয়, সেই জাতির সংঘর্ষণে দুর্ব্বল জাতির পৃথক অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়। (Survival of the Fittest) মতের দ্বারা, প্রমা-ণীকৃত হইয়াছে যে, অনেক দুর্ব্বল জাতি প্রবলতর জাতির সংঘর্ষণে পড়িয়া কালের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। আর্য্যজাতি আবার যদি মস্তক উত্তোলন করিতে সক্ষম হয়, আর্য্যজাতির সংঘর্ষণে মুসলমান জাতির পৃথক্ অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। এখনই এ কথার কতক আভাস পাওয়া যাইতেছে। ক্রমেই হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাব জন্মিতেছে। হিন্দুর ভাষা, হিন্দুর আচার-প্রণালী অনেক মুসল-মানকে দীক্ষিত করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বে মুসলমান রাজা ছিল বলিয়া এই একীকরণ একটু মন্দীভূত ছিল। এখন হিন্দু মুসল-মান এক অবস্থায় উপনীত। হিন্দুর ভাষা হইতে মুসলমানের ভাষা বা ধর্ম্ম আর সহস্র বৎসর পৃথক থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। মুসলমান ও হিন্দু এক ভাষায় কথা বলিয়া একসময়ে এক প্রাণে যে আবদ্ধ হইবে, এখ-নই তাহার কতক আভাস পাওয়া যাইতেছে।

এই জাতীয় ভাষা কিরূপ হইবে, ইহাতে লোকের সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা ঠিক কথা, এদেশের উপযোগী হওয়া চাই। ইংরাজী ভাষা বীরত্বব্যঞ্জক, সংস্কৃত ভাষা প্রেমব্যঞ্জক,—সঙ্গীতময়, ধর্ম্মময়, মধু-ময়। ভারতে যে ভাষা কালে প্রাণের ভাষা হইবে, অর্থাৎ প্রাণ-বিনিময়ের মূল মন্ত্র হইবে, সে ভাষাকেও সঙ্গীতাত্মক মধুর হইতে হইবে। সংস্কৃত ভাষা হইতে খুব পৃথক হইলে কখনই তাহা ভারতের ভাষা হইবে না। বাঙ্গলা ভাষা যেরূপে গঠিত হইতেছে, নানা কারণে এই ভাষাকেই ভারতের একপ্রাণতার ভাষা বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে। এই ভাষা সংস্কৃতের ন্যায় মধুর; এই ভাষা সর্ব্বতোভাবে ভারতের উপযোগী। কেন,

উপযোগী, সেকথা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়। পূর্ব্বে আমরা এই বিষয়ের কতক আলোচনা করিয়াছি, ভবিষ্যতে পৃথক প্রবন্ধে আবার করিব। বাঙ্গালা ভাষা এখন সজীব ভাষা। বাঙ্গালা ভাষা যে কালে ভারতের ভাষা হইবে, "Survival of the fittest" মতের দ্বারা তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত যে দেশের প্রাচীন ভাষা সেই দেশে বাঙ্গালা ভাষা যে কালে একপ্রাণতার মূল সোপান হইবে, একথায় আমাদের মনে সন্দেহ নাই। হিন্দি, উড়িয়া বা আসামী ভাষা এ সকলই একরূপ বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ। বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণের অধিকাংশ মিল আছে। সামান্য সামান্য অমিলে কিছু আসিয়া যায় না। হিন্দি ভাষা যে কালে ভারতের ভাষা হইবে না, তাহার কারণ, এই ভাষার উৎকর্ষ বা উন্নতি নাই। বাঙ্গালা ভাষাই এখন ভারতের জীবিত ভাষা—এই ভাষারই উন্নতি হইতেছে। এই ভাষা ভারতের নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় কালে ভারতকে সার্ব্বভৌম রশ্মিজালে ঘিরিবে, আশা আছে। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক।

আমাদের নিকট কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, ভারতের প্রকৃত মহাপুরুষ কাহারা? আমরা বলিব, যাঁহারা ভারতে ভাষার সংস্কার এবং উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কেহ যদি বলেন, কাহাদের নাম জগতে স্থায়ী হইবে? আমরা এক কথায় বলিব—যে সকল দীন দরিদ্র গ্রন্থকার অনাহারের ক্লেশ ও নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা মস্তকে বহন করিয়াও এই প্রাণের ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে ব্যস্ত করিতেছেন, তাঁহারাই এদেশের প্রকৃত মহাপুরুষ; তাঁহাদের নামই জগতে থাকিবে। সমাজ-সংস্কার বা রাজনীতির সংস্কারের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহাদের নাম আজ আছে, আর পাঁচ বৎসর পর থাকিবে না। কিন্তু যাঁহারা জাতীয় গঠনের মূলভিত্তিতে চূণ সুরখি ঢালিতেছেন, অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভে তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইতেছে। আজ তাঁহারা অজানিত, লুক্কায়িত অন্ধকারে বসিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যাইতেছেন, তাহাই এদেশের ভাবী ভাষার মূল বীজ। আজ তাঁহারা অপদস্ত, কিন্তু সময়ে তাহাদের গৌরবে এদেশ গৌরবান্বিত হইবে।

আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য, ভারতে ভাষার সংস্কার করা। ইহাই একমাত্র সঞ্জীবনী শক্তি। যাহার যে শক্তি থাকে, এই মহাব্যাপারে ঢালিয়া দেও। এই মহাযজ্ঞে ভারতকে আহ্বান কর—নচেৎ উন্নতি, মিলন,—অসম্ভব,—স্বপ্নের কাহিনী।

প্রাণের কথা ব্যক্ত করিতে না পারিলে মিলন অসম্ভব। প্রাণের ভাষা ভিন্ন প্রাণের কথার প্রকাশ হয় না। কোথায় সেই ভাষা পাই, যাহার সাহায্যে প্রাণকে খুলিয়া দেখাইতে পারি? এখনও বাঙ্গালা ভাষা অসম্পূর্ণ। আমরা এক কথা বলি, লোকে অন্য কথা বুঝে। ইংরাজি পরের ভাষা—তাতে প্রাণের কোন গূঢ় ভাবই বলা যায় না, বলা সম্ভব নয়। উহাকে স্বদেশের করিয়া লইতে পারিলে হয় কিনা, জানিনা; কিন্তু তাহা অসম্ভব। প্রাণের কথা কোন্ ভাষায় তবে ব্যক্ত করি? কোন্ কথা লোকে বুঝে? কোন্ ভাবে লোক মজে?—কিছুই ঠিক নাই। তবে কে যেন একটা স্বপ্নের স্বরে বলিতেছে, এই বাঙ্গালা ভাষাই প্রাণের সুখসংবাদ—মধুর হইতেও মধুর, হৃদয়ে হৃদয়ে যেন কি

মধুর স্বর ঢালিতেছে। এই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি এখনও লোকের আদর নাই, তাহা জানি। এখনও ভারতের অসংখ্য জাতি ইহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তাহাও জানি। জানি, পরমুখাপেক্ষী, ইংরাজির নকল-নবিস অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ইহার প্রতি অনাস্থাবান। কিন্তু যখন কতিপয় উৎসাহী গ্রন্থকার এবং এইরূপ উৎসাহদাতা সভাসমিতির একান্ত একাগ্রতা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের প্রতি তাকাই, তখন হৃদয় আশায় মাতোয়ারা হয়। বাঙ্গালী জাতি বুদ্ধি বিদ্যায় ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি। এই জাতির প্রতিভা-প্রসূত কীর্ত্তিকলাপ যে ভারতের সমগ্র জাতির উপর যশ-পতাকা উড়াইতে সমর্থ হইবে, ইহাতে নিরাশার কথা নাই। বাহু বলে নহে, ঐশ্বর্য্য বলে নহে, কিন্তু প্রতিভা বলে এই জাতি সকলের শ্রেষ্ঠ। এই সময় হইতে সকলে যদি স্বদেশের হিতব্রত গ্রহণ করিয়া ভাষা সংস্কাররূপ মহাযজ্ঞে জীবন উৎসর্গ করেন, কালে দেশের একতার মূল দৃঢ়ীভূত হইবে। মহামতি স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হই। বিধাতার কৃপায় কালে মহা সুফল ফলিবে। জাতীয় ভাষার উন্নতিকল্পে, বঙ্গবাসি, প্রাণ, মন, উৎসর্গ কর। জাতীয় ভাষার উন্নতি না হইলে জাতীয় মিলন বা একতা অসম্ভব। জাতির মিলন ভিন্ন জাতির উন্নতি অসম্ভব।*

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (১৯শ)

(মহাপ্রকাশ।)

পরমাত্মা অপরিসীম চিচ্ছরূপ ; জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্রাংশ চিৎকণ ; অপরিমিত বৃহৎ চিৎবস্তুর সহিত জীবরূপী ক্ষুদ্র চিৎকণ নিত্যযোগে যুক্ত ; কিছুতেই উভয়ের সম্বন্ধ বিযুক্ত করিতে পারা যায় না। একটী অনন্ত, মহান্ অপরিবর্ত্তনীয়, গভীর চিদ্ঘন ; অপরটী ক্ষুদ্র, বদ্ধ, যৎসামান্য চিদংশ। একটী আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত। পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রকৃতিগত যথার্থ স্বত্ব এক হইলেও জীবের ঔপাধিক ব্যবহার ক্রিয়ার এত বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে আর পরমাত্মার সহিত এক প্রকৃতি বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। আবার জীবাত্মার প্রকৃতি পরমাত্মার প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্য ভেদভাব রহিয়াছে, যাহা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। বৈষ্ণবাচার্য্য পূজ্যপাদ জীবগোস্বামী মহাশয় ইহা "অচিন্তনীয় ভেদাভেদ জ্ঞান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক এই অচিন্তনীয় ভেদাভেদ জ্ঞানেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মূল নিহিত রহিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। ভ্রমর বা মৌমাছি মধুপানের জন্য ব্যাকুল হইয়া পুষ্পান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ সুন্দর একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্প দেখিতে পাইয়া তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করত তদুপরি উপবিষ্ট হইল এবং এদিক ওদিক বেড়াইয়া

* এই প্রবন্ধটি সিকদার বাগান বান্ধবপুস্তকালয়ের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনকালে পঠিত হইয়াছিল।

তাহার পাঁপড়িগুলি ভেদ করিয়া ভিতরের মধুভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হইয়া মধুপানে বিভোর হইয়া পড়িল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রমরটী স্থির ভাবে মধুপান করিতে পারে নাই; ততক্ষণ সে আপনাকে গোলাপ-স্থিত মধু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করিতেছিল। কিন্তু যখন মধুকোষের মধ্যে যাইয়া তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নীরবে মধুপান করিতে লাগিল, তখন তাঁহার নিকট কি বাহ্য জগৎ অথবা কি সেই মধুভাণ্ডার, ইহার কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-জ্ঞান থাকে না। সে তখন সকলই মধুময় বলিয়া জানিতে থাকে; অথচ আত্ম-বোধের ও মধুবোধের এক অচিন্তনীয় ভেদজ্ঞান ও বুঝিতে পারে। জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। জীব স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে পারিলে এইরূপ দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সাধকের প্রাণের মধ্যে যখন সেই রসস্বরূপের অমৃতরস পানের জন্য সুপ্রবল তৃষ্ণার সঞ্চার হয়; তখন সে ব্যাকুল ভাবে সেই নিত্যসুন্দর পরম কুসুমের অনুসন্ধান করিতে থাকে, এবং যখন সৌভাগ্যক্রমে তাহা লব্ধ হয়; তখন আর জগতে দ্বৈত জ্ঞান বা স্থূল ভেদ জ্ঞান থাকে না; সকলই তন্ময় হইয়া যায়, এবং সাধক সেই নিরুপম সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া গিয়া নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া কেবল 'ত্বংহি' ত্বংহি' দেখিতে থাকে; এমন কি আপনি পর্য্যন্তও তখন 'ত্বংহি' হইয়া যায়! হইবারইতো কথা। জীব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর, ইহাই জানিতে পারিবে। জীবের মূলে কোন্ শক্তি? কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। তাহা কি? ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছা। পৃথিবীর কুটিল পথের বিভিন্ন দিকে দুইটী নরনারীর আত্মা ছুটিতেছিল; ইচ্ছারূপিণীর ইচ্ছায় তাহা-দের পরস্পরে সাক্ষাৎকার হইল। সেই ইচ্ছা—আবার উভয়ের হৃদয়ে অনুরাগ রূপে পরিণত হইল। সেই পবিত্র ইচ্ছাই আবার পিতৃতেজে, মাতৃ শোণিতে কার্য্য করিয়া জ্রণরূপে পরিণত হইল। তাহাই অবলম্বন করিয়া 'আমির' উৎপত্তি হইল। এই "আমি" তেই আবার কতকগুলি শক্তি সমা-বেশ হইল। কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় "আমির" সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইল। আমি যদি আমার স্বরূপজ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছাকে কার্য্য করিতে দিতে পারি-তাম, অর্থাৎ আমার শক্তি পরিচালনের ক্ষমতা পাইবার পূর্ব্বে সেই মহতী ইচ্ছা যেরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, সেইরূপে করিতে দিতে পারিতাম, আমার কর্ত্তৃত্বভার বা অহঙ্কার দ্বারা বাধা না জন্মাইতাম, তাহা হইলে আমার স্বরূপ বোধের অভাব হইয়া বিড়ম্বনা হইত না; এবং দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত ভাব দেখা আমার পক্ষে কঠিন হইত না। কিন্তু আমি কি করি-য়াছি? আমার কতকগুলি পার্থিব সুবিধার জন্য নিজের অহঙ্কারকে পরিচালনা করিয়া একটী কল্পিত মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি; নিজের সুখদুঃখ লইয়া অজ্ঞান ভাবে সেই জগতে বাস করিতেছি। কাজেই আমার স্বরূপ জ্ঞান বুঝিবার উপায় নাই। 'আমি' তো আর সেই আমার মূলাধারা কুলকুণ্ড-লিনীর জগতে বাস করি না; আমার কল্পিত জগৎই আমার সর্ব্বস্ব। শাস্ত্র-কারেরা এই কল্পিত মিথ্যা জগৎকেই, মায়া, অবিদ্যা বা 'সংসার' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কথাটী সুস্পষ্ট করিয়া বলি-বার জন্য আর একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্।

গুটীপোকা আপন মুখ-বিনির্গত লালা দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে আপনিই জড়বৎ আবদ্ধ হইয়া পড়ে; দৈবশক্তিতে আবার তাহা কাটিয়া সুন্দর প্রজাপতির আকার ধারণ পূর্ব্বক প্রমুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে থাকে। জীবও সেইরূপ বাসনা পরিচালিত হইয়া স্বকল্পিত সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ হওত আপন স্বরূপ-ভাব বিস্মৃত হইয়া যায়; কিন্তু যখন ভগবৎ কৃপায় সৎসঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ঘটনা হয়, তখনই সে ঐ পিঞ্জর কাটিয়া আপন স্বরূপাবস্থা লাভ করত প্রমুক্ত চিদাকাশে উড়িয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। এই স্বরূপাবস্থা লাভ হইলে সকলই ব্রহ্মময় দর্শন হয় এবং দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত বা অভিন্নতা উপলব্ধি হয়। সাধকের সাধনার গভীরতা ও ঘনীভূততার পরিমাণ অনুসারে এই ভাব অল্পকাল, বহুকাল বা চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। শুনিতে পাই, শুক নারদাদির এই ভাব জীবনব্যাপী ছিল; ঈশা, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণে তটস্থ ভাবে থাকিত, অন্যান্য সাধকে অল্পকাল মাত্র থাকিয়া অন্তর্হিত হয় এবং অস্মদাদিতে ইহার উদ্রেকই হয় না। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের 'মামেব শরণং ব্রজ' প্রভৃতি উক্তি; বাইবেলে 'I and my father are one' এবং চরিতামৃতে 'আমিসেই' 'আমি সেই' প্রভৃতি কথা এই একই ভাব সম্ভূত।

গৌরের মহাপ্রকাশ বুঝিবার উদ্দেশে আমরা এত কথা বলিলাম। এই তত্ত্ব না বুঝাতেই ধর্ম্মজগতে অবতারবাদ, মধ্যবর্ত্তিতা, মহাপুরুষবাদ প্রভৃতি ধর্ম্মের বিরোধীভাব সকল প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং পাইতেছে। গৌরের মহাপ্রকাশ হইতেই তদীয় ভক্তগণ তাঁহার পূর্ণত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তাহারই বিষময় ফল স্বরূপ আমরা এই পরমপবিত্র ভগবদ্ভক্তকে আজ ভগবানের পবিত্র আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তিনি মর্ত্ত্যজীবনে থাকিলে ইহা কখনই হইতে দিতেন না।

'মহাপ্রকাশ' অর্থে যেদিন গৌরচন্দ্র মহাভাবে বিভোর হইয়া জীবাত্মার স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাকে 'সাতপ্রহরিয়া' ভাবও বলে; অর্থাৎ ঐ দিন তিনি বেলা এক প্রহরের সময় হইতে সমস্ত দিন ও সমস্ত রজনী ভগবদ্ভাবে নিমগ্ন ছিলেন এবং ঐ অবস্থায় আপনাকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন ভাবিয়া নানা অবতার ভাব প্রদর্শন করত ভক্তমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

"এবে শুন চৈতন্যের মহাপরকাশ;
যহি সর্ব্ব বৈষ্ণবের সিদ্ধি অভিলাষ।
সাতপ্রহরিয়া ভাব লোকে খ্যাতি যার;
যহি প্রভু হইলেন সর্ব্ব অবতার।"

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

গ্রাম্য সন্ধ্যা।

দিগন্তে ডুবিল রবি
বসুধা কনক ছবি
বিষাদেতে ছায়াময়ী, মিলায় মিলায়।
পূরবে গগণ কোণে,
করুণা ব্যথিত মনে,
নীরবেতে সন্ধ্যা-তারা মুখ পানে চায়।

আঁধারে ছাইল ধরা,
প্রকৃতি নিস্তব্ধ পারা,
দূরে শুধু শোনা যায় ঝিল্লির স্বনন।
হলটী লইয়া কাঁধে
অতি শ্রান্ত মৃদু পদে
ধীরে ধীরে গৃহে ফিরে কৃষক সুজন।

প্রশান্ত নিস্তব্ধ সব,
শুধু শুধু টুন্ টুন্ রব,
মেষ-গলঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় দূরে;
কুটীরে কৃষক দারা
দীপ হাতে লয়ে তারা।
তুলসী তলায় আসি সন্ধ্যা দেয় ধীরে।
নিস্তব্ধ বনানী কায়া
আঁধারেরে সঁপি দিয়া
জলধি জলেতে যদি ডুবিল তপন:
ব্যথিত কম্পিত প্রাণী.
গৃহে ফিরে যায় পাখী,
বিলাপ কাকলী পূর্ণ করিয়া গগন।
ক্রমে ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে.
আলোকে নিষিক্ত করে,
মেঘের আড়াল হ'তে চাঁদ উঠে হেসে!
একে একে, ফোটে তারা,
প্রেম নিমন্ত্রিতা তারা—
চাঁদেরে ঘেরিয়া সুখে সভা ক'রে বসে।

শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী।

আমি ও আমার।

মনুষ্য জীবন পাঠ করিয়া আমরা যত দূর উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি, বোধ হয় আর কোন বিষয় পাঠে ততদূর উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। জীবনচরিত প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমটী মহাত্মাগণের জীবনচরিত, দ্বিতীয়টী দুরাত্মাগণের জীবনচরিত। শিখিবার বিষয় উভয় শ্রেণীতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে স্থূল দৃষ্টিতে অনেক সময়ে পাপের জয়, পাপের সুখ, ও পাপের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তরলমতি যুবকগণ দুরাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া কখন কখন পাপাসক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু মহাত্মাদিগের জীবনী পাঠ করিলে প্রীতি, ভক্তি, সাহস, উৎসাহ, অধ্যবসায়, লোকহিতৈষণা ও দেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণ রাশির শিক্ষা হইয়া থাকে। আমি তাই একদা মনুষ্য-জীবনী পাঠে প্রবৃত্ত হইলাম। একে একে অনেকের চরিত খুলিলাম, কিন্তু কিছুতে তৃপ্তি হইল না, দুই চারি পৃষ্ঠার অধিক পড়িতে পারিলাম না। এইরূপে বিরক্ত হইয়া অবশেষে নিজের জীবন পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। কেননা আত্মানুরাগ মনুষ্যের ভিতর অতিশয় প্রবল, কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। যে কারণে মহাত্মাদিগের জীবনী পাঠে বিরক্ত হইলাম, এখানেও সেই কারণ বর্ত্তমান। এ বিরক্তির কারণ আর কিছুই নহে, কেবল পুনরুক্তি দোষ। একটী শব্দের বারম্বার ব্যবহার সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক প্রত্যেকের জীবনে আদি, মধ্য এবং ইহাই শেষ, ইহাই সকল মূল মন্ত্র; বলিতে কি, ইহাই মনুষ্যকে জীবিত রাখিয়াছে। যেখানে যাও, সেই খানে এই শব্দ শুনিতে পাইবে। যুবা, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সকলেই দিবা নিশি এই শব্দের কোলাহল করিতেছে। কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে, আমরা কেহই অপরের মুখে এই শব্দ শুনিতে ভালবাসি না। অথচ শয়নে স্বপনে, জীবনে, মরণে সতত এই শব্দ জপ করিতেছি। ইহারই জন্য ধন, মান, এমন কি, ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছি এবং

ইহার দ্বারা নিজ নিজ ইতিহাস পূর্ণ করিতেছি। এই শব্দ আমাদের উন্নতি পথের প্রতিবন্ধক এবং আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। এই শব্দটীর নাম **আমি বা আমার।**

এই আমি বা আমার জ্ঞান হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় এবং অহঙ্কারই বিনাশের মূল। তবে কি ইহাকে হৃদয়ে পোষণ করা আমাদের কর্ত্তব্য? না তাহা কখনই নহে। কিন্তু ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? ইহা যে আমাদের অস্থি, মজ্জা, পেশী ও শোনিতের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। এখন জিজ্ঞাস্য যে, যে করুণাময় পরমেশ্বর, জননীর জঠরস্থ ভ্রূণের অবস্থা হইতে আমাদিগের উপর তাঁহার অপার করুণা বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তিনি কি আমাদের বিনাশের জন্য অথবা উন্নতির অবরোধের জন্য এই আমি বা আমার জ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন? বিশ্বাসী প্রাণান্তেও একথা বলিতে পারিবে না। অবিশ্বাসীরা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারেন।

এ শব্দের যথার্থরূপ ব্যবহার আছে, সেইরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে না পারিয়াই আমরা অনেক সময় বিপদে পড়িয়া থাকি। যে সকল বস্তু আমার সে গুলিকে আমার বলিবার ক্ষতি কি? এক্ষণে দেখা যাউক, কোনগুলি আমার। তাহাই যথার্থ আমার, যাহা পূর্ব্বে আমার ছিল, এক্ষণে আমার আছে এবং পরেও আমার থাকিবে—যাহা ইহজীবনে আমার থাকিবে এবং পর জীবনে আমার সঙ্গের সঙ্গি হইবে। কিন্তু এরূপ সামগ্রী কোথায়? পিতা মাতা বল, স্ত্রী পুত্র বল, ভ্রাতা ভগ্নী বল, আত্মীয় স্বজন বল, সুখ সম্পদ বল, আর জ্ঞান মান বল, কাহাকেইত এইরূপে আমার বলিতে পারি না। যদি পৃথিবীতে কিছুই আমার না থাকে, তবে এ শব্দের জ্ঞান কেন? এ বিড়ম্বনা কেন? মঙ্গলময় ঈশ্বর এ অনিষ্টের বীজ আমার ভিতর রোপণ করিলেন কেন?

আমার এক বস্তু আছে, যখনই আমি তাহা চিনিতে পারিব, তখনই মনুষ্যভাব ঘুচিয়া আমার দেবভাব প্রাপ্তি হইবে। তখন আমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইবে এবং আমি দিব্যজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইব। তখন আমার স্বর্গ ও নবজীবন লাভ হইবে: পাপ অসম্ভব হইবে; ভয় ভাবনা একেবারে তিরোহিত হইবে। সেই পরম পদার্থ ঈশ্বর, তিনিই যথার্থ আমার। ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যত, তিন কালের ইতিনি **আমার**। যখন সেই দেবদেব পরমদেব জগতের ঈশ্বরকে আমার ঈশ্বর বলিতে পারিব, তখনই আমি ধন্য হইব। যিনি তাঁহাকে **আমার** বলিয়া চিনিবেন, তিনিই ধন্য হইবেন। বিশ্বাসী যখন সকল ছাড়িয়া সেই এক ঈশ্বরকে আমার ঈশ্বর বলিতে পারিবেন, কেবল মুখের কথা নহে, কিন্তু যখন হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে **"আমার" "আমার"** ধ্বনি উচ্চারিত হইবে, তখন সেই কৃপাময় তাঁহাকে অনন্ত ধনে ধনী করিবেন। তখন তিনি বলিবেন, বৎস, তুমি আমার জন্য সকল ছাড়িয়াছ, তুমি এখন যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। এই লও আমার যাহা কিছু সকলই তুমি লও, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। বিশ্বাসী তখন দেখিবেন, পৃথিবী ও স্বর্গে

সকলই তাঁহার হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারীকা সকলই তাঁহার, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলই তাঁহার, বৃক্ষ, লতা, পত্র পল্লব, ফুল, পুষ্প, সকলই তাঁহার; মনুষ্য-মণ্ডলী সকলই তাঁহার। বুদ্ধদেব, চৈতন্য, মহম্মদ, নানক, ঈষাও মুষা, যোগী ও ঋষি সকলই তাঁহার। সাধু অসাধু, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, সকলই তাঁহার। তখন তাঁহার ক্ষুদ্র আমিত্ব ঊর্দ্ধে ও নিম্নে, দক্ষিণে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তখন তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ-হিল্লোল সততই খেলা করিয়া বেড়াইবে।

এইরূপে ক্ষুদ্র মনুষ্যের ভিতর যখন সমস্ত জগত প্রবেশ করিবে, তখনই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে। হৃদয়ের ভিতর সর্ব্বদা যদি সেই প্রেমময় পবিত্রস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকেন, তাহা হইলে পাপা-চরণ আর কখনই সম্ভব হইবে না, আমার জীবন-ইতিহাসে যদি কেবল "আমার ঈশ্বর" এই দুইটী শব্দ লিখিত থাকে, এই দুই কথা ভিন্ন যদি আর কোন কথা লিখিত না থাকে, তাহা হইলে আমি কিছুমাত্র ক্ষতি বিবেচনা করিব না। মহাত্মা যিশু যে বলিয়াছিলেন "আমি ও আমার ঈশ্বর এক"—যে কথার উপর নির্ভর করিয়া খ্রীষ্ট সম্প্রদায় তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার প্রমাণ করিতে অগ্রসর হন, সে কথা অহঙ্কারের কথা নহে, নম্রতারই কথা। যিশুখ্রীষ্ট যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার "আমিত্ব" হারাইয়া-ছিলেন। তখন তিনি ঈশ্বর ভিন্ন নিজের অস্তিত্ব দেখিতে পান নাই। এই সময়ে তাঁহার ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা। (৮ম)

আমরা দ্বিতীয় ও পঞ্চম প্রস্তাবে নব-দ্বীপবাসী নৈয়ায়িক-শিরোমণি সুপ্রসিদ্ধ জগদীশ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি। জগদীশ রঘুনাথ শিরো-মণির চিন্তামণি-দীধিতির চিন্তামণিদীধিতি-প্রকাশিকা প্রণয়ন করেন। তৎপ্রণীত টীকা জাগদীশী টীকা (জাঃ টীঃ) নামে সুপ্রসিদ্ধ। অনুমান-দীধিতিটিপ্পনী, তর্ক, টিপ্পনী সামান্যাভাব-টিপ্পনী, ব্যাপ্ত্যনুগমটিপ্পনী, সিংহব্যাঘ্রটিপ্পনী, পক্ষতাটিপ্পনী, উপাধিবাদ টিপ্পনী প্রাগুক্ত চিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশিকা-রই অন্তর্গত। ব্যাপ্ত্যনুমানদীধিতি টিপ্পনীতে অনুমিতি, ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিংহব্যাঘ্রী, পূর্ব্বপক্ষ, ব্যাধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, সিদ্ধান্তলক্ষণ, অবচ্ছেদক নিরুক্তি, বিশেষ নিরুক্তি বা ব্যাপ্তি, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়, অতএব চতুষ্টয়ী, তর্ক, ব্যাপ্ত্যনুগম, সামান্যলক্ষণা, সামান্যা-ভাব, পক্ষতা, পরামর্শ, কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী, অন্বয়ব্যতিরেকী, বাধ, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষ, অনুপসংহারী, সাধারণ, অবয়ব, হেত্বাভাস, সব্যভিচারী প্রভৃতি বহু পরিচ্ছেদ আছে। জগদীশের টীকা নৈয়ায়িক সমাজে

অতি প্রসিদ্ধ। জগদীশ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। জগদীশ অনুমান-দীধিতিটিপ্পনীতে লিখিয়াছেন যে, প্রাচ্য (পূর্ব্বদেশীয়) পণ্ডিতগণের অনুচিত ব্যাখ্যা দ্বারা চিন্তামণি-দীধিতি কলুষীকৃত দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি দীধিতির টিপ্পনী রচনায় প্রবৃত্ত হন।

প্রাচ্যৈরনুচিতবিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতোঽপি অধুনা।
দীধিতি যুত মণিরেষ শ্রীজগদীশ প্রকাশিতঃ স্ফুরতু॥

১৭২১ শকের লিখিত একখানি অনুমান দীধিতিটিপ্পনী পাওয়া গিয়াছে।

শকে চন্দ্রনেত্রাগবিধুমিত আদিত্যতনয়ে১৭২১
নভস্যীয়ে সপ্তাহনি চ স্মরনাথং হৃদিবহন্।
দশম্যাং শুক্লায়াং কুসুর-কমলানাথ ইমকং
প্রযত্নেনালেখীন্নিজপরিপাঠনায়েতি পুস্তঃ॥

এতদ্ভিন্ন জগদীশ লীলাবতীদীধিতিটিপ্পনী, তর্কামৃত ও সর্ব্বশক্তিপ্রকাশিকা রচনা করেন। মিথিলাদেশীয় বল্লভন্যায়াচার্য্য ন্যায়লীলাবতী ও গুণকিরণাবলী নামে দুই খানি ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ন্যায় লীলাবতীতে দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের গুণাদি ও ঈশ্বরের স্বরূপাদি নিরূপিত হইয়াছে। এই বৈশেষিক দর্শন বিষয়ক ন্যায়লীলাবতীর* রঘুনাথ শিরোমণি প্রণীত দীধিতির টীকাই লীলাবতীদীধিতিটিপ্পনী নামে জগদীশ রচনা করেন। এই গ্রন্থে জগদীশ লিখিয়াছেন—

কণভক্ষমুনেঃ পক্ষরক্ষাবিন্যস্তবাসনা।
বচাংসি জগদীশস্য চিন্তয়ন্তু বিচক্ষণাঃ॥

জগদীশের প্রিয় ছাত্র নবদ্বীপের রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ শব্দশক্তিপ্রকাশিকা-প্রবোধিনী নাম্নী জগদীশের সুপ্রসিদ্ধ বাদার্থ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

গুরুমিব গুরুমিহ নত্বা অদ্ভুতশক্তিপ্রকাশেষু।
শ্রীরামভদ্রকৃতী কুরুতে টীকাংমুদে সুধিয়ঃ॥

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও ভুবনচন্দ্র বশাক কর্ত্তৃক কলিকাতায় প্রকাশিত হইয়াছে। জগদীশের তর্কামৃত বৈশেষিক দর্শন বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। ইহার দুই খানি টীকা আছে। (১) তর্কামৃতচষক গঙ্গারামজাড়ি কৃত, (২) তর্কামৃততরঙ্গিনী মুকুন্দ ভট্ট বিরচিত। গঙ্গারাম নীলকণ্ঠের শিষ্য ও নারায়ণের পুত্র। গঙ্গারাম তর্কামৃতচষক তাৎপর্য্যটীকা নামে স্বরচিত চষকের টীকার টীকা রচনা করেন বলিয়া সংস্কৃতবিৎ হল সাহেব† নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চষকস্থবর্ণস্পর্শং দিনকরকর-কৃতপরামর্শঃ।
জগদীশমদনকল্পং পিবতু তর্কামৃতং তদাকল্পং॥

তর্কামৃতের দ্বিতীয় টীকাকার মুকুন্দ ভট্টের পিতার নাম অনন্ত ভট্ট।

* ন্যায়লীলাবতীর অনেক খানি টীকা আছে। (১) মিথিলাবাসী তত্ত্বচিন্তামণি প্রণেতা গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রণীত 'ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ' (২) রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায়লীলাবতী প্রকাশদীধিতি নামক প্রাগুক্ত টীকার টীকা, (৩) বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের ন্যায়লীলাবতী-প্রকাশদীধিতি-বিবেক দ্বিতীয় গ্রন্থের টীকা (৪) ভগীরথ কৃত 'ন্যায়লীলাবতী ভাবপ্রকাশ' (৫) শঙ্কর কৃত ন্যায়লীলাবতী কণ্ঠাভরণ, (৬) 'ন্যায়লীলাবতীবিভূতি,' এবং (৭) মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রণীত লীলাবতী-রহস্য, লীলাবতীপ্রকাশ-রহস্য, ও লীলাবতী দীধিতি-রহস্য। মথুরানাথ বল্লভন্যায়াচার্য্যের গুণকিরণাবলীর ও 'রহস্য' রচনা করেন। তিনি বল্লভ, বর্দ্ধমান ও রঘুনাথ, এই তিন জনের কৃত গ্রন্থেরই টীকা রচনা করেন। তৎপ্রণীত টীকার সাধারণ নাম রহস্য।

(নব্যভারত, পঞ্চমখণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।)

† Dr. F. E. Hall's Index to Indian Philosophy, p. 76.

নবদ্বীপের পণ্ডিত হরমোহন চূড়ামণি ১৭৮৫ শকে "সামান্যলক্ষণা-ব্যাখ্যা" নামে জগদীশ প্রণীত চিন্তামণিদীধিতিপ্রকাশিকার অনুমানখণ্ডের অন্তর্গত সামান্যলক্ষণাধ্যায়ের টীকা রচনা করেন। হরমোহন শ্রীরাম-শিরোমণির পুত্র বলিয়া গ্রন্থারম্ভে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীরামমিব মত্তাতঃ শ্রীরামং পুরুষোত্তমং।
শিরোমণিতয়াখ্যাতং বন্দেহহমতিযত্নতঃ।
সামান্যলক্ষণাব্যাখ্যা জগদীশেন যা কৃতা।
তাংটিপ্পনীং খ্রিয়া যুক্তস্তনুতে হরমোহনঃ॥

* * * *

রম্যাং শ্রীহরমোহনদ্বিজ ইহচ্ছাত্রেচ্ছয়োবেত্যহং
শাকে বাণ-বসুদধীন্দুবিমিতেঽহ্নঃ পুস্তকং নির্ম্মমে॥

জগদীশকৃত তর্কামৃত অনেকবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে এম, এ, পরীক্ষার্থী-গণের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহার প্রথমে 'আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্রব্যপ্রমাণ, দ্বিবিধ দ্রব্যনাশ,চতুর্ব্বিংশতি প্রকার গুণ,গুণ ও কর্ম্মের উৎপত্তি প্রক্রিয়া কথন, ভ্রমাত্মক জ্ঞান, অনুমান, হেত্বাভাস ও উপমান নিরূপণ,শব্দপ্রমাণ, শাব্দবোধপ্রক্রিয়া, কারক ও বিভক্তি প্রভৃতির অর্থ, আখ্যাত ও কৃৎ-প্রত্যয়ের অর্থ, এব প্রভৃতির অর্থ যথাক্রমে বর্ণিত ও নিরূপিত হইয়াছে।

অপর এক জগদীশ সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তচূড়ামণি শূলপানির রচিত শ্রাদ্ধবিবেকের শ্রাদ্ধ-বিবেকভাবার্থদীপ নামে ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন।

শ্রীমতা জগদীশেন স্মৃতিতত্ত্বং বিজানতা।
শূলহস্ত-কৃতগ্রন্থে ক্রিয়তে কৌশলং কিয়ৎ॥

সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট* প্রণীত কাব্যপ্রকাশের টীকা বঙ্গদেশীয় অনেকানেক পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত হয়, তন্মধ্যে জগদীশ তর্কপঞ্চানন বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশরহস্য-প্রকাশ' নবদ্বীপের পণ্ডিত হরিনাথ তর্ক-সিদ্ধান্তের নিকট বিদ্যমান আছে। এই পুস্তক ১৫৭৯ শকের মাঘ মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে রবিবারে তর্কপঞ্চাননের শিষ্য ন্যায়লঙ্কার অধ্যাপনার্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া পরিসমাপ্ত করেন।

শাকে রন্ধ্রাদ্রিবাণ-ক্ষিতি-পরিগণিতে মাঘ-মাসে নবম্যাং
পক্ষে চৈবাবলক্ষে গ্রহপতি দিবসে জীবযুগ্-যুগ্মলগ্নে।
ন্যায়ালঙ্কার-ধীরো নিজগুরুরচিতং পুস্তমে-তৎ সমস্তং
স্বীয়ং স্বীয়াঙ্গনস্থো ব্যলিখদনলসোঽধ্যাপনার্থং সুখেন॥

জগদীশ তর্কপঞ্চানন মহাদেবকে নমস্কার পুরঃসর এইরূপে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।—

সম্প্রতি স্বমতিপ্রীত্যৈ শ্রীজগদীশো দ্বিজো ধীমান্।
কাব্যপ্রকাশসূক্তৌ সরস-রহস্যং প্রকাশয়তি॥

জগদীশ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি আর একখানি কাব্যপ্রকাশ-রহস্যপ্রকাশ রচনা করেন। কাব্যপ্রকাশের আরো কতকগুলি টীকা আছে—কাব্যপ্রকাশ নিদর্শন, কাব্যামৃত তরঙ্গিনী, মহেশ্বর ন্যায়া-লঙ্কার কৃত কাব্যপ্রকাশাদর্শ বা ভাবার্থচিন্তা-মণি, রামকৃষ্ণের কাব্যপ্রকাশ-ভাবার্থ,

* কাশ্মীরদেশে খ্রাষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মম্মট ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কথিত আছে, নৈষধচরিত প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক শ্রীহর্ষ তাঁহার ভাগিনেয় ছিলেন।

শ্রীবৎস শর্ম্মার সারবোধিনী, ভাস্কর ও গদাধর চক্রবর্ত্তীর রচিত কাব্যপ্রকাশ টীকা, পরমানন্দ চক্রবর্ত্তীর কাব্যপ্রকাশবিস্তারিকা, নাগেশ ভট্টের কাব্যপ্রদীপ, বৈদ্যনাথের কাব্যপ্রকাশপ্রভা, ও জয়রামের কাব্যপ্রকাশ তিলক। নরহরি ভট্ট প্রণীত একখানি কাব্যপ্রকাশটীকা আছে। গ্রন্থারম্ভেই তদীয় আত্মপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিভুবনগিরিতে বাৎসগোত্রজ রামেশ্বর ভট্ট নামে জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। নরসিংহ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। নরসিংহের পুত্রের নাম মল্লিনাথ। এই মল্লিনাথই* কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি মহাকবি প্রণীত কাব্যসমূহের টীকা রচক কি না, বলিতে পারি না।

তস্মাদচিন্ত্যমহিমা মহনীয়কীর্ত্তিঃ
শ্রীমল্লিনাথ ইতি মান্যগুণো বভূব যঃ।
সোমযাগবিধিনা কলিখণ্ডনাভি
রদ্বৈতসিদ্ধমিব সত্যযুগং চকার ॥

নারায়ণ ও নরহরি নামে মল্লিনাথের দুই পুত্র জন্মে। কনিষ্ঠ নরহরি সরস্বতীতীর্থ নাম ধারণ পুরঃসর সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। সন্ন্যাসী নরহরির কাশীতে অবস্থান কালে কাব্যপ্রকাশের প্রাগুক্ত টীকা প্রণয়ন করেন।

কাশ্যাং সরস্বতীতীর্থযতিনা তেন রচ্যতে।
টীকা কাব্যপ্রকাশস্য বালচিত্তানুরঞ্জিনী ॥

*ঐতিহাসিক রহস্যের প্রথমভাগে শ্রীরামদাস সেন, অধ্যাপক উইলসনের মতানুসারে লিখিয়াছেন যে, প্রায় ৪০০ বৎসর অতীত হইল মল্লিনাথ সুরি দক্ষিণাবর্ত্ত নাথের অতি দুষ্প্রাপ্য টীকা অবলম্বনে কালিদাসের কাব্যসমূহের টীকা রচনা করেন। সংস্কৃতজ্ঞ অফ্রেট সাহেব অনুমান করেন যে, মল্লিনাথ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

এই কাব্যপ্রকাশের টীকা রচয়িতা নরহরি, 'শ্রবণভূষণ' নামে বিদগ্ধমুখমণ্ডন কাব্যের টীকাকার বল্লাল-নন্দন নরহরি ভট্ট হইতে পৃথক ব্যক্তি সন্দেহ নাই।

যঃসাহিত্যসুধেন্দুনরহরির্বল্লালনন্দন স্তনুতে।
স শ্রবণভূষণাখ্যাং বিদগ্ধমুখমণ্ডন ব্যাখ্যাং ॥

দ্বারন্ধাগ্রামনিবাসী রামরামের পৌত্র ও সিদ্ধেশ্বরের পুত্র গোপাল দাস সেন কবিরাজ ১৬৯৭ শকে চিকিৎসা বিষয়ে যোগামৃত নামে সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে দশসহস্রাধিক শ্লোক আছে। ১৭২৩ শকে অন্যান্য টীকাকারগণের দুরূহ টীকা দর্শনে সুবোধিনী নামে ইহার একখানি সহজ টীকা রচনা করেন।

তাতঃ সিদ্ধেশ্বরো যস্য রামরামঃ পিতামহঃ।
তেনেয়ং লিখিতাটীকা গোপালেন সুবোধিনী ॥

শাকে রামাঙ্কতর্ক ক্ষিতি পরিগণিতে মাসি শুক্রেহবলক্ষে
পক্ষে, নত্বা মুরারে পদযুগকমলং সর্ব্বকামৈঃকসিদ্ধিঃ।

* * * * *

গ্রন্থং যোগামৃতাখ্যং ব্যরচয়দধুনা বৈদ্য গোপালদাসঃ।

সেনভূমিসমাজস্থ-দ্বারন্ধাগ্রামবাসিনঃ।
গোপালস্য প্রযত্নেন গ্রন্থোহয়মজনি ক্রতঃ ॥

শ্রাদ্ধ বিষয়ক পিতৃপদ্ধতি ও যজ্ঞ প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ গোপালাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত।

ধ্যাত্বা নন্দীশ্বরং দেবং নত্বা পিতৃপদদ্বয়ং।
গোপালো বালতোষায় বিলিখেৎ পিতৃপদ্ধতিঃ ॥

বোধ হয় প্রক্রিয়া-কৌমুদী প্রণেতা পরমহংস গোপালাচার্য্য, এই গোপালাচার্য্য হইতে পৃথক ব্যক্তি। এই প্রক্রিয়া-কৌমুদী

ব্যাকরণে কৃৎপ্রত্যয়াদি প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বৈয়াকরণ গোপালাচার্য্য রামচন্দ্র আচার্য্যের শিষ্য। ১৬২৩ সংবতের লিখিত একখানি প্রক্রিয়া-কৌমুদী কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে সংরক্ষিত হইতেছে।*

নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণির কৃতিমান্ পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌম পদার্থখণ্ডন টিপ্পনী রচনা করেন। ইহা রঘুনাথের পদার্থখণ্ডন নামে বৈশেষিকদর্শনের ব্যাখ্যা পুস্তক। রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত পদার্থখণ্ডনের আর একখানি ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে। এই রঘুদেব বিরচিত কলাদসূত্রব্যাখ্যান, শিরোমণির অখ্যাতবাদের টিপ্পনী, অনুমিতি-পরামর্শবিচার, সামগ্রী বাদ বিচার, প্রতিযোগী-জ্ঞান হেতুত্বখণ্ডন, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক প্রত্যয়াসত্তি নিরূপণ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য-বোধবিচার, নিরুক্তিপ্রকাশ, ঈশ্বরবাদ, গূঢ়ার্থতত্ত্বদীপিকা বা রঘুদেবী নামে গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির ভাষ্য বর্ত্তমান আছে। রামভদ্র সার্ব্বভৌম পদার্থখণ্ডনের টিপ্পনীতে এইরূপে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।—

তাতস্য তর্ক-সরসীরুহ-কাননেষু
চূড়ামণে দিনমণে শ্চরণে প্রণম্য।
শ্রীরামভদ্রকৃতী কৃতিনাং হিতায়
লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুকমাতনোতি ॥

রামভদ্র পূর্ব্বোক্ত পদার্থখণ্ডনটিপ্পনী ভিন্ন সমাসবাদ নামে বাদার্থ গ্রন্থ ও উদয়নাচার্য্য কৃত কিরণাবলীর গুণরহস্য নামক ভাষ্য এবং কুসুমাঞ্জলিকারিকার ব্যাখ্যা* প্রণয়ন করেন। জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননা† প্রণীত আরও একখানি সমাসবাদ আছে। রামভদ্রের ভ্রাতা রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রঘুনাথ শিরোমণির গুণপ্রকাশবিবৃতির টীকা প্রণয়ন করেন।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

---

* সুবিখ্যাত রামানুজপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীনিবাস দাস প্রক্রীয়াভূষণ নামে একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন। ইনি বেঙ্কটাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন।

* রামভদ্র সার্ব্বভৌমের টীকা ভিন্ন কুসুমাঞ্জলির আরও নয়খানি টীকা আছে। (১) বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের কুসুমাঞ্জলিকারিকা-প্রকাশ, (২) রুচিদত্ত মিশ্রকৃত কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ-মকরন্দ, (৩) হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত কুসুমাঞ্জলিকারিকা ব্যাখ্যা, (৪) বৈদ্যনাথ মিশ্রের কুসুমাঞ্জলি-টীকা, (৫) নারায়ণতীর্থ যতীর কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা, (৬) গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ রচিত গুণানন্দী, (৭) ত্রিলোচন ন্যায়পঞ্চাননকৃত কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা, (৮) রুদ্র ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যা, (৯) অজ্ঞাতনামা লেখক প্রণীত কুসুমাঞ্জলি বৃত্তি।

† ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। জয়রাম এতভিন্ন পক্ষধর মিশ্রের চিন্তামণি-আলোক ও রঘুনাথ শিরোমণির চিন্তামণি দীধিতির টীকা করেন। তিনি শিরোমণির আখ্যাতবাদদীধিতির ব্যাখ্যা সুধা নামক টিপ্পনীতে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন।

ন্যায়পঞ্চাননঃ শ্রীমান্ জয়রামঃ সমাসতঃ।
আখ্যাতবাদব্যাখ্যানং আতনোতি মনোরমং ॥

তৎপ্রণীত হেত্বাভাস দীধিতি টিপ্পনী, সামান্য লক্ষণাদীধিতি টিপ্পনী দীধিতি ব্যাখ্যা শব্দালোকবিবেক, উপদেশ বিশেষ বোধস্থলীয় বিচার, অন্যথা খ্যাতিতত্ত্ব, ন্যায়মালা নামে মহর্ষি গৌতমের চতুর্বিধ প্রমাণের বিচার, নানার্থবাদটিপ্পনী, গুণপ্রকাশ দীধিতি টিপ্পনী ও পদার্থমণিমালা নামক বৈশেষিকদর্শন গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

(নব্যভারত ৫ম খণ্ড, নবম সংখ্যা।

আশীর্ব্বাদ।

দুটী লগ্ন হৃদয়ের সন্ধি বিদারিয়া,
অলস মিলন পথে যুগ্ম আলিঙ্গনে,
যে প্রাণের জ্যোতি-কণা বাহির হইয়া,
গেছিল অদৃষ্ট পথে—এসেছে ভুবনে।
নিরখিয়া শশী যথা নাচে পারাবার,
প্রেমের প্রয়াগতীরে, নিরখি কুমারে
উল্লাসে রোমাঞ্চ তনু গঙ্গা যমুনার!
চারিচোকে বহে স্নেহ অবিরাম ধারে,
মরতায় অমরতা, সুখের সন্তান,
রমতির কি-যেন-কি দেখায় বদনে,
হাঁসি দেখে প্রাণ শেখে হইতে মহান্,
সৌন্দর্য্যে লুটায় চিত্ত বিভুর চরণে,
জননী করিলি শিশু! সখীরে আমার,
স্নেহপানে উর্ব্বরতা লভিবে সংসার।

শিশু সুন্দর।

শিশু কবিতার কবি তুই দয়াময়!
গাথায় পীযূষ এত নাহিক কোথায়,
করুণার পূর্ণ বর্ষা এ সুখ আলয়,
তরলিত হাসে ভাষে, জগৎ ভাসায়,
শিশুরে বুকেতে ধরি জননীর মনে
যে স্নেহের উর্ম্মিমালা হয় উছলিত,
স্পর্শে তার ফোটে ফুল, নন্দন কাননে
স্পর্শে তার মন্দাকিনী সদা পুলকিত।
শিশু কি সংসার মাঝে কুসুম নির্ম্মল
স্পর্শিতে যা পড়ে স্বর্গ জগতে নতিয়া।
শিশু হ(ও)য়া দেবের কি তপস্যার ফল
পূততায় রাখিবারে হৃদয়ে ধরিয়া?
হৃদয় মরুর মাঝে শিশুময় প্রাণ
বিকৃতই যদি হয় কেন তবে দান!!

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

হলায়ুধ।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৌষ মাসের নব্যভারতে, বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা নামক *প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের "সেনরাজগণ" নামক পুস্তিকার লিখনানুসারে হলায়ুধকে আদিশূরের আনীত পঞ্চ বিপ্রের অন্যতম বাৎসগোত্রজ ছান্দড়ের বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতির পরিচয় প্রদান কালে, হলায়ুধকে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়াছেন। তাঁহার এই মত ভ্রমাত্মক কি না, বলিতে পারি না।"

ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, আমাদিগের বাক্য যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা ত্রৈলোক্য বাবু স্বীকার করিতেছেন না। স্বীকার করিলে তিনি কখনই মিত্র মহাশয়ের মত ভ্রমাত্মক "কি না" এই কথা লিখিতেন না। এ জন্যই হলায়ুধ সম্বন্ধে আমাদিগকে পুনর্ব্বার কিছু লিখিতে হইতেছে।

---

* ২৭এ অগ্রহায়ণ, সোমবার, কোন বন্ধুর নবকুমার জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত।

আমরা "সেন রাজগণ" পুস্তিকায় লিখিয়াছি যে, দ্বিতীয় লক্ষ্মণের মন্ত্রী হলায়ুধ "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, বাৎস গোত্রে (অর্থাৎ ছান্দড়ের বংশে) ধনঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উজ্জলা নাম্নী রমণী তাঁহার গৃহিণী ছিলেন। সেই গৃহিণী হইতে ধনঞ্জয়ের ঈশাণ, হলায়ুধ ও পশুপতি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঈশাণ ব্রাহ্মণদিগের "আহ্নিক পদ্ধতি" হলায়ুধ,—'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' ও পশুপতি 'পশুপতি পদ্ধতি' নামক শ্রাদ্ধাদি কৃত্য প্রস্তুত করেন। শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেননৃপতি তাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।"

হলায়ুধের এইরূপ পরিচয় যে আমরা ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়াছি, তাহা সেনরাজগণ পুস্তিকায় প্রকাশ করা গিয়াছে; তথাপি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থের সেই অংশ এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

বংশো বাৎস্য মুনের্যনেরিব সদাচারস্য বিশ্রামভূঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষধনঞ্জয়ঃ সমজনি জ্যায়ান পরজ্যোতি ষঃ॥
যস্মিন্ জুহ্বতি জাতবেদসি হবি র্বোমাঙ্কণ ব্যাপিভিঃ।
ধূমৈর্ধূম্রপিতমন্দুসিদ্ধসরিতো বৃন্দারকৈঃ পীয়তে॥ ৫॥
বাঞ্ছাতিক্রম সম্ভবেঽপি জ্যোতি র্জটালান্ মণীন্
ছিত্বা যস্ত জগত্রয়স্য মহসো জাগর্ত্তি কোষঃকুশঃ।
আপোভসা বিলজ্য শৈলসদৃশঃ প্রাগ্‌ঘার দ্বিপান
দূরোদ্ধণ্ডিত যজ্ঞযূপ বৃষভোৎকর্ষণ হর্ষোহ ভবৎ॥ ৬॥
অন্তঃ প্রমোদশবলীকৃত পক্ষ সূচিস্যূতাশ্রুমৌক্তিকভরালসলোচনাভিঃ।
গীতাং পুরঃ সুরবধূভিব মুব্যকীর্ত্তিম্
আস্থানসীমনি সুরাধিপতিঃ শৃণোতি॥ ৭॥
গোষ্ঠীষু দৈবতমমলমতি ধৈর্য্যসম্পদাংবসতিঃ।
প্রকৃতিরিব পরমপুংস স্তস্যাভূদুজ্জলা গৃহিণী॥ ৮॥
বভূব তস্যাঃ প্রকৃতের্ম্মহানিব
শ্রেয়ো বিলাসায়তনং হলায়ুধঃ।
যৎকীর্ত্তিরন্তো নিধিবীচিদণ্ড-
দোলাধিরোহব্যসনং বিভর্ত্তি॥ ৯॥
লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদগুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতেরাবৃত্তাসদৃশী
নিজস্ত বয়সঃ প্রাপ্তা মহামাত্যতা।
শব্দব্রহ্ম করোদরামলকবন্তো গোত্তরাক্রিয়ে
ত্যক্তি প্রার্থয়িতব্যমস্ত কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকম্॥ ১০॥
যেনাসদীক্ষিতং ন সিন্ধু লহরীধৌতাঞ্চলায়াঃ ক্ষিতৌ
যস্যাজ্ঞাতমভূন্ন সপ্তভুবনে নানাবিধং বাঙ্ময়ম্।
দেবঃ স ত্রিজগন্নমস্য মহিমা শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতিস্তেনে
যস্য মনীষিতাধিক পুরস্কারোত্তরাং সম্পদম্॥ ১১॥
বাল্যে খ্যাপিতরাজ পণ্ডিত পদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জল
চ্ছাত্রোৎসক্তি মহামহত্তমপদং দত্তা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবন শেষ যোগ্য মখিলক্ষ্মাপাল নারায়ণঃ—

শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব নৃপতি ধর্ম্মাধিকারং
দদৌ ॥ ১২ ॥

*   *   *   *

*   *   *   *

ভ্রাতা পদ্ধতিমগ্রতঃ পশুপতিঃ শ্রাদ্ধাদি-
কৃত্যেবাধা
দীশানঃ কৃতবান্ দ্বিজাহ্নিকবিধৌ
জ্যেষ্ঠোঽপরঃ পদ্ধতিম্ ।
তেনাস্মিন্নমুনা ফলস্তুতিপরাঃ প্রস্তুত্য
নানা স্মৃতীঃ—
সন্ধ্যাদিদ্বিজকর্ম্মমন্ত্রবচসাং ব্যাখ্যা পরং
খ্যাপিতা ॥ ২৪ ॥

অর্থাৎ "সদাচারের বিশ্রামভূমি বাৎস্যমুনির বংশে ধর্ম্মাধ্যক্ষ—ধনঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশেষ বিজ্ঞশীল ছিলেন। আশাতিরিক্ত ধন থাকা স্বত্বেও ইনি জ্যোতির্জাল জড়িত মণি সমূহ ত্যাগ করিয়া কুশকেই কোষ করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয় তাঁহার পূর্ব্বাভিমুখস্থ দ্বারে নিবদ্ধ গজ সমূহ ত্যাগ করিয়া যজ্ঞযূপনিবদ্ধ বৃষ সমূহের গর্ব্বিতাচরণে হর্ষোৎফুল্ল হইতেন। সুরবধূগণ তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দেবরাজের সভায় গান করিত। পরম পুরুষের প্রকৃতির ন্যায় তাঁহার গৃহিণী উজ্জ্বলা ছিলেন। জনসমাজে ইনিও দেবতার ন্যায় নির্ম্মল বুদ্ধি, ধৈর্য্য, সম্পদের আশ্রয় স্থান স্বরূপ ছিলেন। প্রকৃতি হইতে যেমন মহান, সেইরূপ তাঁহার গৃহিণী হইতে ধনঞ্জয়ের পুত্র হলায়ুধ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা লক্ষ্মণের যৌবনে তিনি মহামাত্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুল, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, ধনসম্পদ হলায়ুধের সংসারে প্রার্থনা করিবার কিছু ছিল না। পৃথিবীতে যাঁহার অজ্ঞেয় কিছু ছিল না, সপ্তভুবনের নানাবিধ পদার্থ যাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, সেই রাজা লক্ষ্মণ, হলায়ুধকে প্রার্থনাধিক বস্ত্রালঙ্কারাদি পুরস্কার ও প্রচুর ধন সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব নৃপতি তাঁহাকে বাল্যকালে রাজপণ্ডিত, যৌবনারম্ভে চন্দ্রবিম্ববৎ উজ্জ্বলছত্র (ধবল ছত্র) দ্বারা বর্দ্ধিত মহাতেজঃ পুঞ্জ মন্ত্রীর পদ এবং বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।

*   *   *   *

তাঁহার (হলায়ুধের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি শ্রাদ্ধাধিকৃত্য প্রস্তুত করেন। (ইহা অদ্যাপি "পশুপতি পদ্ধতি" নামে খ্যাত) তাঁহার অগ্রজ ঈশান ব্রাহ্মণদিগের আহ্নিক পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। ইনি কেবল সন্ধ্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেন।

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, হলায়ুধ স্বয়ং এইরূপে আত্ম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়াও কি কেহ পণ্ডিতপ্রবর মিত্র মহোদয়ের লেখা ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার করিবেন না। বাৎসগোত্রজ ধনঞ্জয়ের পুত্র হলায়ুধ যে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশজ হইতে পারে না, বোধ হয় একটী পাঁচ বৎসরের হিন্দু বালকও ইহা জানেন।

বোধ হয় পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আমরা ভারতী নামক বিখ্যাত সাময়িক পত্রে পুরাতন তত্ত্বালোচনা ও কোন কোন প্রাচীন কিম্বা ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছি—১২৯০ সালের আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের ভারতী একত্র হইয়া প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় আমরা হলায়ুধ শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধে দেখান গিয়াছিল যে, ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত

এতে এই হলায়ুধকে নিপুর পুত্র ও ভট্ট-নারায়ণের পৌত্র বলা হইয়াছে। আবার মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রকাশিত বেণী-সংহার নাটকের ভূমিকায় সুবিখ্যাত ঠাকুর বংশের যে বংশ বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতেও হলায়ুধকে রামরূপের পুত্র ও সুরেন্দ্রের পৌত্র লিখা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বোধ হয় এই সকল ভ্রম মূলক সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বাৎসগোত্রজ হলায়ুধকে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশধর লিখিয়াছেন। আমাদিগের সেই প্রবন্ধটীকে লক্ষ্য করিয়া ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দের ২৪ নভেম্বর তারিখ সুবিখ্যাত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় Reis and Rayyet পত্রিকায় নিম্ন লিখিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী প্রকাশ করেন :—

A LEARNED BLUNDER.

A very good periodical is the *Bharati* Edited by Babu Dwijendra Nath Tagore. There is always a freshness and originality in the views that find expression in its pages. In the region of prose literature, it has chalked out an independent path of criticism, doing real service to Bengali literature by discrediting many an idol of blind popular worship. Du ring about the seven years of its existence, in antiquities alone it has given to the world a mass of information of both interest and value. In the department of modern history it has corrected many a superstition of English origin and vindicated with reason and justice many a character weighted down with unthinking calumny. The last double number is replete with matters of interest. The short article on *Halyaudha* corrects the popular error which owing its origin in the untutored vanity of a reputable Calcutta family labouring from of old under an unfortunate social ban, and since endorsed by no less a scholar than Dr. Rajendra Lall Mittra—of making the Lord Chancellor of Bengali's last Hindu King a descendent of Bhattanarayan. The bard of Veni Sanhar has always been known as the founder of the Banerjea clan in Bengal. About thirty years ago, when the late Babu Prosonno Kumar Tagore intrigued with the leaders of Brahamonocracy to re-enter the pale of caste, he proclaimed the descent of the Tagores from the same Bhattanarayan. So far so good. But one step leads to another until the retired Sudder Vakeel put forth a whole geneological tree of high family from the first settlement of the present Rarhi Brahmans in Bengal. Not content with Bhattanarayan for progenitor he would have a Succession of great names in his ancestry. Perhaps a poetical origin was not quite after his professional heart. He longed to connect his race with triumphs in jurisprudence. Jimut Vahan is rather too obscure a character in Indian Literature, but Raghunandana was a genuine Bengalee. We do not know whether the Baboo everlooked into the family history of the author of the 28 *Tatwas* to find out any relation between him and the Tagores. He certainly claimed the great legist Halayauda for one of his early ancestors, and this great name has found its way into all the numerous publications of and in behalf of the Tagore family. It has been cited accordingly by writers here and abroad intending to glorify them. That is in the usual way of friends and hirelings. In an evil hour Dr. Rajendra Lall Mittra too lent himself to the business. He had no idea of the danger, the unregenerate, however learned, rise meet with in dabbling with the minutioe of twice-born existence. Perhaps he thought he was as good as a Brahmana when the great Bhatta Muller had invested with the sacred cord, the German

Sanskritist having blunderd into the belief that the Kayastha Doctor was a hereditary Brahman Pundit. The very passage in which the Doctor speaks of Halayauda as a descendent of Bhattanarayan contains matters for at once refuting the assumption, if he could but see it. Here is what the Doctor says—"His (Laksmana Sen's) prime minister and Lord Chancellor was Halayauda, son of Dhananjaya, of the Vatsya race, a Brahmin of great learning and a descendent of Bhattanarayna, the author of Veni Sanhar." A Brahmin child of five years, knows that a descendent of Bhattanarayan can not be of any other than *Shandilya* race. A Brahman of the Vatsya race cannot, in the nature of things, claim descent from Bhattanarayana. A Brahmin writer could never have been guilty of such a blunder. All this happens simply because Dr. Rajendra Lall Mitra for all his learning and reputation or learning, has not passed through the regenerating ordeal. As one of the once-born, the question of gotra (*race* as he wrongly translates it) becomes a stumbling block to him. Foreigners would scarcely understand the ludicrousness of the blunder. The assertion of Halayauda of the Vatsya race being a descendant of Bhattanarayana would be tantamount to saying—"Nava Krishna Das is a Kulin Brahmin who performed for the peace of his Soul a journey to Mecca."

৫ বৎসরের হিন্দু বালক পর্য্যন্ত যাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারে, সংস্কৃতে এম, এ, উপাধিধারী একজন ব্রাহ্মণ যুবক তাহা "ভ্রমাত্মক কি না, ইহা বলিতে পারিলেন না" ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে। ত্রৈলোক্য বাবু আমাদের একজন বন্ধু, তাই এত কথা বলিলাম।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

পুঃ। ত্রৈলোক্য বাবু বলিয়াছেন যে আমরা "হলায়ুধকে আদিশূরানীত পঞ্চ বিপ্রের অন্যতম ছান্দড়ের বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

কিন্তু "সেন রাজগণ" পুস্তিকায় আমরা ভ্রম ক্রমেও ছান্দড়কে আদিশূরানীত পঞ্চ বিপ্রের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করি নাই। আমাদের মতে ছান্দড়ের পিতা সুধানিধি আদিশূরের সময় বাঙ্গালায় আগমন করেন। এই সুধানিধির দুই পুত্র—ছান্দড় ও ধরাধর। ছান্দড় হইতে বাৎস-গোত্রজ সমস্ত রাঢ়ী ব্রাহ্মন ও ধরাধর হইতে বাৎস গোত্রজ সমস্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। হলায়ুধ রাঢ়ীয় বলিয়াই আমরা তাঁহাকে ছান্দড়ের সন্তান বলিয়াছি।

শ্রীঃ—সিংহ।

বিরহ সঙ্গীত।

১

কেদারা,—কাওয়ালি।

মিছে কেন কাঁদি আর হলাহল তুলিয়ে।
সুখ গেছে, সাধ গেছে, যাক্ দুখ চলিয়ে!
প্রেমে আশা নাহি আর,
যাতনা ব্যবসা তার।
মিছে ভেবে ভালবাসা, মরি শুধু জ্বলিয়ে।

২

জয়জয়ন্তি,—আড়া।

দূরে যা,দূরে যা তোরা, কিছু নাহি বুঝিবার।
কার মুখ-পানে চাব, চাহিতে পারিনে আর।
যে ছিল প্রাণের আশা,
সেই হ'লো প্রাণ-নাশা।
মিছে পর-ভালবাসা, কেবল পিপাসা সার!

৩

খাম্বাজ,—মধ্যমান।

এই কি ঘটিল শেষে, কপাল-ফলে?
অমিয়া দাঁড়াল বিষে, পিরীতি-ছলে!
সে কথা কি মন-রাখা?
সে হাসি কি মন-ডাকা?
অভিমানে কত চাপি নয়ন-জলে!

৪

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ,—কাওয়ালি।

কারে কই, কি যাতনা সই, মরমে।
ফেটে যেন যায় বুক, কোথায় লুকাই মুখ!
গুমরি গুমরি মরি সরমে।
ভাবি, হেন কোন যাদু, নাহি কি ধরায়,
জীবনের এ পাতাটা উবে যাতে যায়!
ভুলে হোক যাতে হোক, আমারে বুঝায়,
ভেবেছিনু পর-কথা, নিজ কথা ভরমে!

৫

খট্,—একতালা।

এতন যাতনা হবে, আগে কে জানিত বল?
কথা শেষে ব্যথা হবে,হাসি হবে আঁখিজল।
সুখ হবে দূর স্মৃতি,
দুখ হবে প্রাণ-গীতি,
আশা হবে মৃগ তৃষা, মরণ হবে মঙ্গল,
আগে কে জানিত বল?

৬

বাঁরোয়া,—কাওয়ালি।

প্রেম যদি হয়েছে ভুলে, বুঝেও কেন যায়
না ভোলা?
পরের পানে চেয়ে চেয়ে, চোখ গেছে হইয়ে
খোলা!
পরের গান গেয়ে, গেয়ে
প্রাণ গেছে আঁধারে ছেয়ে,
বুঝেশুঝেও তবু কেন পরের বাঁধন যায় না
খোলা?

৭

আলাইয়া,—আড়া।

কি ঔষধে মন বাঁধে, বলরে শপথ তোর।
মুছে যায় স্মৃতি ক্ষত,ঘুচে যায় আশা ঘোর!
অপমান, অবহেলা,
যন্ত্রণা, কল্পনা-খেলা,
অশ্রুজল, দীর্ঘশ্বাস, কি কুহকে হয় ভোর?

৮

ঝিঁঝিট,—কাওয়ালি।

তবু, তারে—দেখিতে পরাণ কাঁদে!—
এমন যে ক'রে গেছে, হা-হুতাশে, অপবাদে।
চোখে চোখে সদা রেখে,
চোখে চোখে সদা থেকে,
মনেতে পড়ে না ভাল, তবু তার মুখ-চাঁদে
দেখিতে পরাণ কাঁদে!

৯

ভৈরবী,—আড়া।

ভেবেছি,কেঁদেছি কত,ভুলিতে পেরেছিকই?
এখনো যে ক্ষত দাগে, জাগে সে গরল-মই।
এখনো বাসনা করে,
সমুখে সে এসে পড়ে!
চরণে ধরিয়া বলি, ত্যজ না ত্যজ না, সই!

১০

ঝিঁঝিঁট,—যৎ।

বাঁচিতে পারি না আর,হয়ে তার আশা-হীন!
যুগসম বোধ হয়, সে বিনে, এ প্রতিদিন!
পলে পলে হৃদি বাঁধি,
মরণের পায়ে কাঁদি।
আশার এ শূন্য বাসা,হবে নাকি শূন্য লীন?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। রশিনারা।—ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস; ৺ কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। ১২৭৬ সালে প্রথম এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়,—অনেক দিন হইল তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। কালীকৃষ্ণ বাবুর পরলোক গমনের পর এ পুস্তক আর কেহ প্রকাশ করে নাই। সম্প্রতি তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবন্ধু সান্ন্যাল মহাশয় এই পুস্তকখানি পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক দিনের পুস্তক হইলেও, ইহার ভাষা অতি সুন্দর। গ্রন্থকারের উপন্যাস লিখিবার বেশ শক্তি ছিল;—তিনি জীবিত থাকিলে আরো কত ভাল পুস্তক হয়ত আমরা পাইতাম। কিন্তু দুরন্ত কালের তাহা সহিল না। এ পুস্তকখানি একটী লুপ্ত জীবনের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ সকলের ঘরে রাখিলে মৃত গ্রন্থকারের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অর্থ সামান্য জিনিস, কিন্তু কৃতজ্ঞতা এক স্বর্গীয় পদার্থ। এই সামান্য জিনিসের বিনিময়ে একটা মহত্ব উপার্জ্জন, অতি সুন্দর কথা। আশা করি, এ পুস্তকখানি সকলেই আদর করিয়া পাঠ করিবেন।

২। মোহম্মদের জীবন চরিত।—তিন ভাগ, বিধান যন্ত্র হইতে প্রকাশিত—মূল্য ৩৷০। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই। না থাকিলেও তাঁহাকে আমরা জানি। মোহম্মদ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালীর মধ্যে আর কাহারও আছে কি না, আমরা জানি না। গ্রন্থকার এই মহাত্মার কীর্ত্তিকলাপের আলোচনাতে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। মূল ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী। মোহম্মদের এই জীবনচরিতখানি যেরূপ বিস্তৃত, পরিশুদ্ধ, আড়ম্বরশূন্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত, আশা করি, সকল সমাজে এই পুস্তকখানি বিশেষ আদর পাইবে। গ্রন্থকার মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

৩। বিজ্ঞানকুসুম।—শ্রীসূর্য্যকুমার অধিকারী, বি, এ, প্রণীত। মূল্য ১৲। এই পুস্তকে পঞ্চভূত, আকাশ, বিপুল ব্রহ্মাণ্ড, ধূমকেতু ও উল্কাপাত, মৃণ্ময়ী, সূর্য্য, সূর্য্য ও সময়, আহার ও সৌরভ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। সূর্য্য বাবু একজন কৃতবিদ্য, বিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি যখন যাহা লেখেন, গভীর গবেষণার পর লেখেন। এই জন্যই তাঁহার লেখার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বড়ই অপ্রতিভ হন। সূর্য্য নামক প্রবন্ধ যখন নব্যভারতে প্রকাশিত হয়, তখন সময় নামক পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সূর্য্য ও সময়' নামক প্রতিবাদ প্রবন্ধে সূর্য্য বাবু তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার পর 'সময়' নীরব হন, আর কথাটী বলেন না। এই বিজ্ঞান-কুসুমে সূর্য্য বাবু যে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, এ সকলটীতেই তাঁহার গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞান-কুসুমের ন্যায় সুন্দর পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। ডিটেক্‌টিভ্‌ পুলিশ।—শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৵০ মাত্র। এই পুস্তকখানি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। যে ডাক্তার বাবুটীর জীবনের কাহিনী ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে আমরা জানি। মানুষের হৃদয় কতদূর নীচগামী হইতে পারে, এই পুস্তকে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত চিত্রিত হইয়াছে। ভাষা অতি সরল, অতি পরিপাটী। মানুষের জীবনের অন্ধকারময় অংশ পাঠেও মানুষের যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইতে পারে, এই জন্য আমরা এই পুস্তক খানি সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৫। চিন্তা।—গীতিকাব্য, শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য ১৲। ঈশান বাবু সাহিত্য জগতে অপরিচিত নন। ইঁহার কল্পনা-প্রসূত অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা ইতিপূর্ব্বে উচ্চদরের সাময়িক পত্রিকা সকলে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল তাহা নয়, ইনি চিন্তা ভিন্ন আরো কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ঈশান বাবুর গীতি কবিতা আমরা খুব আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি। তাঁহাকে কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে আমরা এখনও কোন মতামত দিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু একথা বলিতেই হইবে, চিন্তার গভীরতা এবং ভাষার উচ্ছ্বাসে ঈশান বাবু কোন বঙ্গকবি অপেক্ষা নীচে নহেন। ঈশান বাবুর কবিতার এখনও তত আদর হয় নাই, ইহার একমাত্র কারণ, মিষ্টত্বের অভাব। যেমন চিন্তা, যেমন উচ্ছ্বাস, তেমন যদি মিষ্টত্ব থাকিত, তাহা হইলে ঈশান বাবুর কবিতা খুব আদর পাইত। কিন্তু বর্ত্তমান আদর অনাদরে কিছু আসিয়া যায় না। কালে ঈশানবাবুকে লোকে বুঝিতে পারিবে, কালে তাঁহার কবিতার খুব আদর হইবে।

৬। কল্যাণমঞ্জুষা বা ন্যায়প্রকাশ।—শ্রীস্বামি ইন্দ্রচন্দ্রেন নিষ্পন্নঃ। স্বামী ইন্দ্রচন্দ্রের জীবন প্রহেলিকা-ময়, অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ। যে ঘটনায় ইহার পূর্ব্ব জীবনগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, তাহাতে জগতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মের বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তির নিকট ইনি পরাস্ত হইয়াছেন, ইহার পূর্ব্ব জীবন স্বপ্নের কাহিনী হইয়া গিয়াছে; এখন ইনি একজন স্বদেশ-বৎসল, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি। কল্যাণমঞ্জুষা তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার উপযুক্ত পরিচয়। যে বিষয়টী লইয়া স্বামী প্রথম উপস্থিত হইয়াছেন, এ বিষয়টী অতি কঠিন। কিন্তু দৃষ্টান্ত প্রভৃতি দ্বারা এই কঠিন বিষয়টীকেও সহজ করিয়া তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থাপন্ন লোকের নিকট আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইলাম। আশা আছে, কালে তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার আরো উপকার হইবে। বিধাতা তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন। তাঁহার কৃপা পাইলে দুর্ব্বল সবল হয়, অজ্ঞান জ্ঞান পায়, মূক কথা কয়। কল্যাণমঞ্জুষা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

৭। গোবর্দ্ধন লীলা।—শ্রীগদাধর শর্ম্মা প্রণীত। আমরা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তিনি যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাঁহার লিপি-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ইহার উল্লেখ না করিয়া আমরা বিরত হইতে পারিলাম না। পুস্তকখানির ভাষা উপন্যাসের ন্যায় মধুর ও ভাবপূর্ণ।

৮। শান্তিমঠ।—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কোন্ গ্রন্থ কোন্ স্থলে শেষ করা উচিত, তাহা গ্রন্থকারই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল রূপে বিবেচনা করিতে পারেন। বঙ্কিম বাবু যে স্থানে তাঁহার কপালকুণ্ডলা শেষ করা উচিত বোধ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই তিনি তাহার শেষ দাঁড়ি অঙ্কিত করিয়াছেন। আর শিবনাথ বাবুও উপযুক্ত স্থানেই মেজবউর উপসংহার করিয়াছেন। কিন্তু নূতন লেখকগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এজন্যই কপালকুণ্ডলার উপসংহারের ন্যায় মেজবউর উপসংহার স্বরূপ শান্তিমঠ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় দামোদর বাবুর ন্যায় দেবেন্দ্র বাবুও অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। উভয়েই সম-অপরাধী, তবে ইতর বিশেষ এই যে, নবকুমারের নির্ম্মল চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া ও কপালকুণ্ডলার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া দামোদর বাবু নিরস্ত হইলেন, কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু তাহা করেন নাই। তিনি মানে মানে শান্তিমঠ সমাপন করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, কিন্তু দুই একটী স্থানে তিনি সাম্প্রদায়িক গোড়ামির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ইহা আমাদিগের প্রীতিকর বোধ হইল না। সাম্য ও উদারতা যাঁহাদের মূল মন্ত্র, এইরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও গোড়ামি সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৯। অক্ষয়চরিত।—শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৶০ আনা। বঙ্গ সাহিত্যের পিতৃস্বরূপ অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাত্মা অক্ষয় কুমারের জীবনচরিত দেখিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত পুস্তক খানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু পাঠান্তে অন্তঃকরণে যুগপৎ দুঃখ ও ক্ষোভের সঞ্চার হইল। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া জীবনচরিত লেখা উচিত, গ্রন্থকার সেই প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, বরং তাহার বিপরীত রীতি অবলম্বন করিয়া পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র বিকশিত হয় নাই, প্রত্যুত সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে। তৎপরে গ্রন্থের মধ্যে এতগুলি ত্রুটি আছে যে, তাহার বিস্তারিত সমালোচনা বিশেষ স্থানসাপেক্ষ; কিন্তু আমরা তাহার সকলগুলির উল্লেখ না করিয়া কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ের কথা বলিতেছি। প্রথম অপ্রাসঙ্গিক দোষ:—অক্ষয় বাবুর জন্মের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার তিন পুরুষের বংশবৃত্তান্ত বর্ণন করা, তিনি গৌর মোহন আঢ্যের স্কুলে পড়িতেন বলিয়া গৌর মোহন আঢ্যের পুত্রাদি ক্রমে বংশাবলী কীর্ত্তন করা, অক্ষয় বাবু আমিষ ভক্ষণের বিরুদ্ধে লিখেন এবং পুনরায় আমিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া তদুপলক্ষে প্রভাকরে মুদ্রিত কবিতাকে উদ্ধৃত করিয়া ৩৮ পৃষ্ঠা পুস্তকের দুই পৃষ্ঠারও অধিক পূর্ণ করা ইত্যাদি বিষয় অপ্রাসঙ্গিক দোষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তৎপরে অক্ষয় বাবুকে পড়িতে সাহায্য করেন বলিয়া তাঁহার ভ্রাতা হরমোহন দত্তের এক খানি প্রতিকৃতি এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। এ বিষয়টী যে কেবল অপ্রাসঙ্গিক, তাহা নয়, কিন্তু যার পর নাই অনাবশ্যক। এই ভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর,

আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি লোকদিগেরও এক এক খানি ছবি এই পুস্তকে দেওয়া উচিত ছিল ; কারণ ইহাঁরা প্রত্যেকে অক্ষয় বাবুকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপরে পুস্তকের মধ্যে ভাষাগত ও রচনাগত দোষ যৎপরোনাস্তি দৃষ্ট হয়। "প্রবন্ধ নির্ব্বাচিনী" "স্থলোলিত" 'দত্তজর' প্রভৃতি শব্দ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ দ্বারা ভাষাকে বিকলাঙ্গ করা হইয়াছে। অথচ গ্রন্থকার পুস্তকের প্রথমে একখানি শুদ্ধিপত্রও দিয়াছেন, কিন্তু এ সকল প্রকাণ্ড ভুল তাঁহার সম্মুখে পড়ে নাই। পুস্তকের ৯, ১১, ৪৪, প্রভৃতি পৃষ্ঠায় কতকগুলি রচনাগত ভুল দৃষ্ট হয়। পুস্তকের আবরণ পৃষ্ঠা পড়িয়া দেখা যায়, গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বে আরও ২।৩ খানি পুস্তক লিখিয়াছেন, এত গুলি পুস্তক লিখিয়াও আজ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের ভাষা যদি এত বড় বড় ভুলের হস্ত হইতে রক্ষা না পায়, তবে ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে কি আশা করা যাইতে পারে ? অক্ষয় কুমারের অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যবলে তত্ত্ববোধিনীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাঁহার যুক্তি ও তর্ক দ্বারা দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বেদের অভ্রান্ততাবিষয়ক ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ মত তিরোহিত হয়, এ সকল বিষয় সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ও চিরবিদিত। কিন্তু গ্রন্থকারের লেখায় বোধ হয় যে, যেন 'পেপার কমিটি' নামক সমিতি দ্বারাই 'তত্ত্ববোধিনীর' শ্রীবৃদ্ধি. তারপর দেবেন্দ্র বাবু বেদের অভ্রান্ততা মানিতেন না, ইহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপাচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মানিতেন, অক্ষয় বাবু প্রথমাবধিই প্রার্থনায় অবিশ্বাস করিতেন, তিনি রোগ আরামের জন্য পুত্তলিকার চরণে প্রণাম করিতেন, এ সকল কথা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসবিরুদ্ধ ও একান্ত সত্যবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি। গ্রন্থে আরো বহুল দোষ লক্ষিত হয়, কিন্তু সে সকল বলিবার আর সময় নাই। এই গ্রন্থ প্রচারে অক্ষয় বাবুর জীবনকে গৌরবান্বিত করা হয় নাই, কিন্তু অপদস্থ করা হইয়াছে। বাবু মহেন্দ্র নাথ রায়ের লিখিত পুস্তকখানি ইহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন। তাহা পাঠ করিলে মহাত্মা অক্ষয় কুমারের মহত্ত্ব ও প্রতিভার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় এরূপ একজন মহৎ লোকের জীবনীকে এরূপ ছবিতে অঙ্কিত করা গ্রন্থকারের উচিত হয় নাই এবং বঙ্গসমাজ সে চিত্র দেখিতেও ইচ্ছা করে না। মহৎ লোকের জীবনকে মহিমান্বিত করাই যদি জীবনচরিত প্রচারের উদ্দেশ্য হয়, তবে আশা করি, গ্রন্থকার এ পুস্তকের প্রচার একেবারেই বন্ধ করিবেন।

১১। —মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা লর্ড মেটকাফের সংক্ষিপ্ত-জীবনী। —শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত. মূল্য দুই টাকা। আমরা এই পুস্তক খানা নিতান্ত আগ্রহের সহিত আদ্যপান্ত পাঠ করিয়াছি; পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। মেটকাফ প্রকৃত পক্ষে মহাত্মা ছিলেন। চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন যে, " ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত লর্ড রিপণ এবং জষ্টিস ফিয়ার ভিন্ন অন্য কেহ মেটকাফের ন্যায় দেশের সমগ্র লোকের প্রদত্ত অভিনন্দন লাভ করেন নাই।" ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা। নীচাশয়, মূঢ়মতি ও স্বার্থপর শাসনকর্ত্তাগণ

তাহাদের ন্যায় নরাধমদিগের নিকট হইতে অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু দেব প্রকৃতি সম্পন্ন উদারমতি শাসন কর্ত্তাদিগের প্রতি সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়-উৎস হইতে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সুবিমল ধারা নিঃসৃত হইয়া প্রধাবিত হইতে থাকে। ওয়ারণ হেষ্টিংশের ন্যায় শাসনকর্ত্তাকে বোধ হয় দেবীসিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। আর ইডেন সাহেবকে একজন বাঙ্গালী পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিয়াছিল। কিন্তু রিপণের জন্য সমস্ত ভারতবাসী অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে বিরত হয় নাই কেন? রিপণ দেব প্রকৃতি সম্পন্ন; তিনি সেই প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভারত শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাই আজও ভারতবাসী তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে। আমরা মেটকাফকে দর্শন করি নাই, কিন্তু তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিয়া বোধ হয়, যে উপকরণে রিপণ নির্ম্মিত, বিধাতা সেই উপকরণে মেটকাফকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই জীবনচরিত পাঠ করিলে মেটকাফের দেবোপম প্রকৃতি আমাদের স্মৃতি-পথারূঢ় হইয়া থাকে।

আমরা এইরূপ আর একজন মেটকাফকে চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিয়াছি। শুনিয়াছি যে, ইনি মহাত্মা মেটকাফের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ত্রিপুরায় মেজিষ্ট্রেট ও জজের কার্য্য করিয়া প্রায় ২৫ পঁচিশ বৎসর হইল বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। আজও ত্রিপুরাবাসী তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি ত্রিপুরাবাসীর হৃদয়ে উচ্চ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। পাঠক, বঙ্গ দেশের পূর্ব্ব প্রান্তে যে একটী দেশী স্বাধীন রাজ্য দেখিতে পাইতেছ, ইহা কেবল মেটকাফের কৃপা। নচেৎ দীর্ঘকাল পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্য ব্রিটানিয়ার লোহিত রেখায় রঞ্জিত হইত। উপযুক্ত পিতৃব্যের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র। মেটকাফ বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সহিত কাগজে, কলমে লড়াই করিয়া ত্রিপুরারাজ্যটী রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

নিজাম পরিবার লর্ড মেটকাফের নিকট যেরূপ ঋণী, ত্রিপুরার রাজ পরিবার ভ্রাতুষ্পুত্র মেটকাফের নিকট সেই রূপ ঋণী। যদি ইঁহারা কখন মেটকাফের নাম ভুলিয়া যান, তাহা হইলে ইঁহাদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ লোক জগতে আর কেহ নাই। মহাত্মা মেটকাফের সমস্ত গুণ গরিমা লিপিবদ্ধ করিবার আমাদের অবকাশ নাই। ভরসা করি, পাঠকগণ তাহার জন্য ক্ষমা করিবেন। আমাদের অভিলাষ যে, প্রত্যেক বঙ্গবাসী মেটকাফের জীবনচরিত একবার পাঠ করেন। ইহার মূল্য দুই টাকা মাত্র। আমরা জানি যে, অনেক বাঙ্গালী একখানা পুস্তকের মূল্য দুই টাকা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইবেন। কিন্তু যাঁহারা তিন টাকা ব্যয় করিয়া একখান বাঙ্গলা উপন্যাস খরিদ করিতে পারেন, কিম্বা তদপেক্ষা অধিক মূল্য দ্বারা এক বোতল মদিরা ক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা এক দিনের জন্য দুই টাকা জলে পড়িয়া গেল, ইহা বিবেচনা করিয়াও লর্ড মেটকাফের একখান জীবনচরিত ক্রয় করিতে পারেন। যাঁহার কৃপায় আজ দেশময় পুস্তক পরিকার ছড়াছড়ি হইয়াছে, কোন্ ব্যক্তি একবার সেই মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ না করিয়া থাকিতে পারেন?

১১। জাগো মা আমার।—শ্রীবিজয়

সান্যাল প্রণীত মূল্য ।৵০। জাতীয় সমিতি উপলক্ষে বিরচিত। একজন কবি বলিয়াছেন—

"লতা পাতা ফুল জল হাসিলে কি হয় ?
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব না হাসিলে সব ব্যর্থ।"

আমরাও বলি, জাতীয় মহাযজ্ঞে আর সকল লোক যোগ দিলে কি হয়, যদি লেখক-শ্রেণী তাহাতে যোগ না দেয় তবে সব ব্যর্থ। লেখকগণ ভিন্ন কোন কীর্ত্তিকে স্থায়ী করিতে কেহ সমর্থ নয়। এই জন্যই সদনুষ্ঠানে গ্রন্থকারগণের, সম্পাদকগণের সাহায্য পাইবার জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সর্ব্বাগ্রে লোকেরা যত্ন করে। আমাদের দেশে গ্রন্থকার বা সম্পাদকগণের এখনও তত আদর হয় নাই বটে, কিন্তু তবুও মনে হয়, গ্রন্থকারগণের যাহাতে সহানুভূতি নাই, সে কাজ ব্যর্থ। জাতীয় মহাসমিতি—জাতির একটা গৌরবের জিনিস সেই দিন হইবে, সে দিন সমস্ত গ্রন্থকার ইহার উন্নতির জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করিবেন। সম্পাদকগণের অনেকে ইহার প্রতি সুপ্রসন্ন, কিন্তু গ্রন্থকারগণের তত নাম শুনা যায় না। তাঁহাদের সহানুভূতি পাইবার জন্য কেহ বড় একটা চেষ্টাও করে না। আমাদের বিবেচনায় এ কাজটা সঙ্গত নয়। যাহা হউক, দুই একজন গ্রন্থকার জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে লেখনী ধরিতেছেন, দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। "জাগো মা আমার" পুস্তকের গ্রন্থকার ইহার মধ্যে একজন। ইঁহার চেষ্টা, উদ্যম এবং সদিচ্ছার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কেবল তাহাই নয়। গ্রন্থকার এক-স্থানে লিখিয়াছেন,—

"জননীর পূজা" এ যজ্ঞে সার,
"আত্ম বলিদান" দক্ষিণা ইহার
এ যজ্ঞের নেতা ভারতের প্রজা।"

কি সুন্দর কথা, কি সুন্দর ভাব। কিন্তু এ সুন্দর কথার সঙ্গে সত্যের যেন একটু বিবাদ আছে। আত্ম বলিদান, এ যজ্ঞের দক্ষিণা হইলে নিশ্চয় এ মহাসমিতি ভারতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিবে। এ পর্য্যন্ত কিন্তু আত্ম বলিদানের পরিবর্ত্তে আত্ম-প্রতিষ্ঠার পরিচয়ই অধিক পাওয়া যাইতেছে। যাহাদিগকে ভারতের প্রজা বলা যায়, তাহারা আজও মহানিদ্রায় নিদ্রিত। গ্রন্থকার বুঝিয়াছেন, তাহাদিগকে না জাগাইলে, তাহাদিগকে আত্ম বলিদান মন্ত্র না শিখাইলে, মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তাই তাঁহার লেখনী ধারণ। বিজয় বাবুর গভীর স্বদেশভক্তির পরিচয় পাইলাম। কিন্তু সত্যের সহিত যে একটু বিবাদ, তাহা থাকিয়াই যাইল।

কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে অনুরোধ উপরোধে যে ভাল কবিতা লেখা যায় না, এটা কিছু নূতন কথা নয়। কিন্তু বিজয় বাবুর এই পুস্তকে অতি সুন্দর কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। একটী নমুনা দি;—

"রবি অস্তাচলে গেল,
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এল,
মনোহর বেশে কিবা ধরাসতী সাজিল;
বহিছে সাঁঝের বায়
বিহগ মধুর গায়
শান্তির সমুদ্র মাঝে কোলাহল ডুবিল।"

শেষ পদে অতি উচ্চদরের কবিত্ব ফুটিয়াছে। বিজয় বাবু স্বদেশবৎসল ভাবুক ব্যক্তি, তাই তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে স্বদেশ ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিধাতা বিজয় বাবুকে দীর্ঘজীবী করুন।

১২। গীতরত্নাবলী।—দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক রচিত এবং সঙ্কলিত;

মূল্য ।৵০। শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা এক জন পরিচিত ব্যক্তি। ইঁহার রচিত "ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা,' 'কেশব-চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ এদেশে খুব আদৃত হইয়াছে। কিন্তু ইঁহার প্রতিভা সঙ্গীতে যেরূপ বিকশিত হইয়াছে, এমন আর কিছুতে নয়। ইনি একজন ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি,—উপাসনার সময় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গান রচনা করিয়া গাইতে পারেন। এই জন্যই ইনি ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ পরিচিত। গীত-রত্নাবলীতে ইঁহার অনেকগুলি মিষ্ট গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১৩। ভুল।— অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত; মূল্য ।৵০ আনা। অক্ষয় বাবু এখন একজন পরিচিত কবি। অনেক সম্পাদকই ইঁহার লেখার প্রশংসা করিয়াছেন; আমরাও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি। নূতন কথা বলিবার বড় একটা কিছুই নাই। এই "ভুলে"যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, নব্যভারতে তাহার কয়েকটী প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা রীতি-বিরুদ্ধ মনে করি। অক্ষয় বাবু সেজন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। অন্যান্য যে সমস্ত কবিতা আছে, সেগুলিতে মোটের উপর অক্ষয়বাবুর পূর্ব্বসম্মান অপ্রতিহত প্রভাবে বজায় রাখিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, অক্ষয় বাবু দিন দিন কিছু অস্পষ্ট-ভাব-যোজনার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন। অল্প কথায় গভীর ভাব লিপিবদ্ধ করা লেখকের একটা মহৎ শক্তি, সন্দেহ নাই; কিন্তু মনের ভাব যদি বুঝাই না গেল, তবে আর কি হইল! অক্ষয় বাবুর পুস্তকের নাম নির্ব্বাচনে এই অস্পষ্টতার প্রথম পরিচয়। পুস্তকের নাম "ভুল" হইল কেন, আমরা বুঝিতে পারি নাই। এসম্বন্ধে উৎসর্গে দুই একটী কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয়। এই অস্পষ্টতার পরিচয় অনেক কবিতায়ও পাওয়া যায়,—দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

"ফুলে"—"আঁখি তার—প্রভাত নলিন;
বসোরার গোলাপ, কপোল,
দেহ তার—শিরীষ-কুসুম;
নব পুষ্প তার সে নিচোল।
মন তার? ব'লো না আমারে,
ঢাক চিতা ঢাক ফুল-হারে।"

"আর"—"একটী ক'য়ো না কথা আর,
একটী চুম্বন শুধু দাও।
কথা ভাল বুঝিতে পারি না,
নীরবে চলিয়া তুমি যাও।

প্রণয়ের আশ্বাস বচন,
সে কেবল মেয়েদের খেলা!
খোলা আঁখি, রবে কে চাহিয়া
শূন্যপানে আর সন্ধ্যাবেলা?

আমাদের পক্ষে কবির মনের ভাব টানিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইয়াছে।

মন্দ বলিলাম বলিয়া প্রশংসার যে কিছু নাই, তাহা নয়। কোন কোন প্রাচীন সম্পাদক অক্ষয় বাবুকে অনুকরণ দোষে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন। অনুকরণ থাকিবে না, কোন কবিতায় অন্য কবিদের ছায়া থাকিবে না, এরূপ আশা করাই অন্যায়। অক্ষয় বাবুতে অনুকরণ-প্রিয়তা যে নাই, তাহা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া আসল জিনিস যাহা আছে, তাহার অনাদর হওয়া উচিত নয়। দুটী চারিটি নমুনা না দিলে অবিচার হয়;—

১। "সৌন্দর্য্য।"

যাওরে সৌন্দর্য্য, যাওরে ডুবিয়া
প্রেমের সাগর পরে!

জগতের লোকে তোমা ল'য়ে যেন
ছেলে-খেলা নাকি করে।
উদার যুবক, তোমারে না করে,
গানের বিষয় তার ;
গর্ব্বিতা বালিকা, তোমার নামেতে
না যেন বিকোয় আর !

২। "এই পথ দিয়ে গেছে" – কবিতার শেষাংশ—

এই পথ দিয়ে গেছে, ব'সে গেছে নদীকূলে,
গেঁথে গেছে ফুলমালা, প'রে যেতে গেছে ভুলে !
এই পথ দিয়ে গেছে, কেঁদে গেছে তরু-ছায় ;
এখনো যে বিন্দু-অশ্রু, শিশিরে মিশেনি হায় !
কোথায় যেতেছে চ'লে, কে মোরে বলিয়া দেয়?
এ অশ্রুকে মুছে যাবে, এ মালাকে তুলে নেয় ?
কি তার মনের কথা, আমি ত বুঝিনে কিছু !
ফেলে গেছে তার সুখ ? আমি যে র'য়েছি পিছু

৩। "আয় ঘুম আয়।"

বাঁধ মোরে বাহুডোরে, এ জগত থাক ন'রে
ভ্রান্ত আমি, জগত-রেথায়।
বড় শ্রান্ত চেয়ে চেয়ে, বড় শ্রান্ত গেয়ে গেয়ে
সুখে, দুখে, প্রেমে কল্পনায়।
বুকে মাথা রাখ্ ভুলে, অকূলে দেখারে কূলে !
ঢাক্ স্নেহ-ছায়, আয় ঘুম, আয় !

এ সকল কবিতায় কবির যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আরো অনেক সুন্দর কবিতা আছে।

কবি যেন প্রাণে কি নিরাশার স্বপ্ন অনুভব করিয়াছেন। তাই উৎসর্গে তিনি লিখিয়াছেন—

—"অচেনা জগত-বুকে, অবরুদ্ধ সুখে দুখে
কত ভুল করিয়াছি, কত ভুলে ভুলিয়া !
না ল'য়ে কিছুরি তত্ত্ব, আপনার ভাবে মত্ত,
ফেলেছি কটিকামত, না জানি কি তুলিয়া !
কবি, এও কি হ'য়েছে ভুল, এত ভুলে ভুলিয়া !

পুস্তকের শেষে লিখিয়াছেন—

এতদিনে বুঝিলাম,—যখন কি হবে বুঝে !
অনন্তের মাঝে আমি ছুটিতেছি অন্ত খুঁজে !
যেখানে অনন্ত স্তব্ধ, খুঁজিয়াছি সেথা শব্দ,
যেথানে অনন্ত স্বপ্ন, খুঁজিতেছি সেথা কাজ !
নাহি সুখ, নাহি শ্রান্তি, খুঁজিতেছি সেথা ভ্রান্তি।
চড়িতেছি স্মৃতি-ভেলা, অনন্ত খেলার মাঝ !
—এত দিনে বুঝিলাম, কি হবে বুঝিয়া আজ ?

লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে মনুষ্যের যে অবস্থা হয়, অক্ষয় বাবুর সে অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। তিনি পথ অন্বেষণ করিতেছেন মাত্র, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নাই। আমাদের আশা আছে, লক্ষ্য ঠিক করিতে পারিলে তিনি কাব্যজগতে অমর হইতে পারিবেন।

কবি এখন প্রেমের অন্বেষণ করিতেছেন, বলেন—

কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি-সে তুমি দূরে !
গান ত হইল শেষ, কোথা তুমি স্বর-রেস ?
সুখ দুখ হ'লো শেষ, হ'লো শেষ কালে ঘুরে।

এই প্রেমের আস্বাদন যদি একবার পান, তবে এই লেখা আরো মধুর হইবে, আরো সরস হইবে।

একথা গুলি বলিবার আমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে। কবির কনকাঞ্জলীতে যেরূপ উচ্চদরের কবিত্বের পরিচয় পাইয়াছিলাম, ইহাতে তেমন পাই নাই। হয় কবি পরিবর্ত্তিত, নয় আমরা পরিবর্ত্তিত। কে পরিবর্ত্তিত, তাহার বিচার আমরা করিতে সাহসী নই।

আর একটা কথা। কবির ছায়া কবিতাটী লইয়া শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত বিবাদ চলিতেছে। এরূপ বিবাদ বড়ই নিন্দার কথা। আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। কে অপরাধী, আমরা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। আমরা উভয় কবিরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করি, উভয়কেই শ্রদ্ধা করি, উভয়কেই শক্তিশালী বলিয়া মনে করি। সামান্য একটী বিষয় লইয়া ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমরা উভয়কেই বিনীতভাবে অনুরোধ করি, উভয়ই নিরস্ত হউন।

"ভুল" সম্বন্ধে যাহা বলিবার আমরা বলিয়াছি। অক্ষয় বাবুকে বিধাতা যথেষ্ট শক্তি দিয়াছেন, এই শক্তির অপব্যবহার না হইলে তিনি এদেশে এক বিভাগের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবেন। বিধাতা অক্ষয় বাবুর সহায় হউন।

ইংরাজ-শাসনে বঙ্গসাহিত্য।

(২য় প্রস্তাব।)

উপরোক্ত কবিওয়ালাদিগের সমকালে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে ভারত-প্রবাসী কতিপয় ইংরাজ মহাপুরুষের অনুগ্রহে বঙ্গভাষার বিলক্ষণ পুষ্টিসাধন হইয়াছিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ জাতি ভারত-রাজ্য শাসনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলে, এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করা ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তৎকালে হাল্‌হেড্ সাহেব এদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ;— বিশেষ যত্ন ও শ্রম সহকারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথম এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গভাষায় এক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলার ছাপার অক্ষর সৃষ্ট হয় নাই। তৎকালে চার্লস্ উইল্‌কিন্স সাহেব এদেশে অবস্থান করিতেন। তিনি বিলক্ষণ অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত প্রভৃতি এদেশের নানা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই স্বহস্তে এক শাট বাঙ্গালা অক্ষর ক্ষোদিত করেন। ঐ অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হাল্‌হেড্ সাহেবের সেই ব্যাকরণ খানি হুগলীতে মুদ্রিত হয়। এক্ষণে যে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র দেশের এক জাগ্রত মহাশক্তি, উক্ত প্রাতঃস্মরণীয় চার্লস উইলকিন্স সাহেব তাহার মূল। আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, ঐ সময় হাল্‌হেড্ ও উইল্‌কিন্স ভিন্ন ফরষ্টার, কেরি, মার্শমান, কোল্‌ব্রুক, জোন্স, প্রভৃতি কয়েক জন ইংরাজ মহোদয় বিশেষ যত্ন সহকারে সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার আলোচনা করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে, যে সমস্ত বিধি ইংরাজীতে সংগৃহীত হয়, ফরষ্টার সাহেব সেই গুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনিই বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম অভিধান প্রস্তুত করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরি, মার্শমান, উয়ার্ড প্রভৃতি মিশনরীগণ এদেশে আসিয়া শ্রীরামপুরে অবস্থান করেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা যদিও তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তদুপলক্ষে তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গভাষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন হয়। তাঁহারা এই সময়ে কয়েকটী বঙ্গ-বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন এবং জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধন করাইয়া, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ, পরে কাশীদাসী মহাভারত মুদ্রিত ও স্বল্পমূল্যে প্রচারিত করেন। তৎকালে লর্ড ওয়েলেস্‌লী ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বিলাতী সিবিল কর্ম্মচারীগণকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে ১৮০০ অব্দে "ফোর্টউইলিয়ম" নামক বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এই উপলক্ষে কতক-গুলি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিত হয়। কেরি সাহেব এই সময় একখানি ব্যাকরণ ও একখানি অভিধান প্রস্তুত করেন। রামরাম বসু ১৮০১ অব্দে "প্রতাপাদিত্য চরিত"

ও পর বৎসর "লিপিমালার" রচনা করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রাজীবলোচনের "কৃষ্ণচন্দ্রচরিত," এবং ১৮১৩ অব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "প্রবোধ চন্দ্রিকা" ও "রাজাবলী" মুদ্রিত হয়। উল্লিখিত পুস্তকগুলি গদ্যে রচিত। ইহাদের মধ্যে ভাষার লালিত্য ও গুণ গৌরবে "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থপ্রণেতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জন্মস্থান উৎকল দেশ। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। "প্রতা-পাদিত্য চরিত" ও "কৃষ্ণচন্দ্রচরিত" যেরূপ জঘন্য বাঙ্গালায় লিখিত, "প্রবোধচন্দ্রি-কার" ভাষা সর্ব্বত্র সেরূপ নহে, সত্য বটে, কিন্তু ইহার কোন কোন স্থলের রচনা এরূপ উৎকট ও অপকৃষ্ট যে, অনায়াসে তাহার অর্থগ্রহ হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়," "উৎকট সাধু ভাষার" উদাহরণ স্বরূপ, "প্রবোধচন্দ্রিকা" হইতে যে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমিও সেই অংশটী উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইলাম। "কোকিল কলালাপ বাচাল যে মলয়াচলা নিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণা-চ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" ইহার অপেক্ষা হিব্রু ও গ্রীক্ ভাষা আমার নিকট সুখ-পাঠ্য ও সহজ-বোধ্য। বাস্তবিক গ্রন্থের অনেক স্থান এইরূপ সুদীর্ঘ সমাস-সম্বদ্ধ ও শব্দা-ড়ম্বরপূর্ণ, আবার কোন কোন স্থলের রচনা যারপর নাই শিথিল ও গ্রাম্যতাদোষে কল-ঙ্কিত। ইহার জন্য আমরা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে দোষ দিতে পারি না। কারণ, তিনি যে সময়ের লোক ও যে প্রণালীতে শিক্ষিত, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত সরল বাঙ্গালা আশা করা এক প্রকার দুরাশামাত্র। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় স্ব-প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের" এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, "আজিও সংস্কৃত পরম প্রবীণ মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে একপাত বাঙ্গালা লিখিতে দিলে তাঁহারা প্রায় ঐরূপ বাঙ্গালাই লিখিয়া বসিবেন। অদ্যাপি তাঁহাদের অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, কঠিন জটিল ও দুর্ব্বোধ রচনাতেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয়। আমাদের শুনা আছে যে, এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গা-লায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—একি হয়েছে!—এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা হয়েছে!—এ যে অনায়াসে বোঝা যায়!!!"

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদ রায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রগণের ব্যবহারার্থ বিদ্যাপতি প্রণীত সংস্কৃত "পুরুষ-পরীক্ষার" যে বাঙ্গালা অনুবাদ করেন, তাহা অপেক্ষা-কৃত প্রাঞ্জল ও শ্রুতি-সুখকর হইয়াছে। একটু নমুনা দেখুন——

"জয়ন্তী নগরীতে শীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ যোগ্যতাতে ধন উপার্জ্জন করিয়া, নীতিজ্ঞ ও বহু পুত্র-যুক্ত হইয়া সুখেতে কালযাপন করেন। এক রাত্রিতে রাজা খট্টাতে শয়ন করিতে-ছেন, এমন সময়ে কোন স্ত্রীর রোদনের শব্দ শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া, ঐ শব্দানুসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে

নগরপ্রান্তে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, নবযুবতী, নানা-ভরণ-ভূষিতা আর উত্তম বস্ত্র পরিধানা, এমন কোন এক স্ত্রীকে দেখিলেন।" ইত্যাদি।

এইরূপে গদ্য রচনা প্রণালী বঙ্গ-ভাষায় প্রবর্ত্তিত হইল। উড়ে এবং সাহেব মিলিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যের সৃষ্টি করিল। ইহাতে আমাদের গৌরব করিবার কিছুই নাই। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু পাইয়াছি, সে সমস্তই বিদেশীয়ের অনুগ্রহে। আমাদের প্রথম গদ্য-লেখক বিদেশী; প্রথম ব্যাকরণ ও অভিধান লেখক বিদেশী; বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টিকর্ত্তা বিদেশী; এবং বঙ্গ-ভাষার সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" শ্রীরামপুরের খৃষ্টীয় মিসনরীগণ কর্ত্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে হইতে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। আজি যে বঙ্গ-সাহিত্যের অক্ষয় গৌরব-স্তম্ভ বঙ্কিমচন্দ্র, এবং যে ভাষায় সম্পাদিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের গ্রাহক সংখ্যা নূন্যাধিক বিংশতি সহস্র, সেই সাহিত্যের জন্মদাতা বিদেশী। বঙ্গভাষার উন্নতি-দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেই ইঁহাদের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ থাকি-বেন।

এদিকে দেশ মধ্যে ইংরাজ প্রভাব দিন দিন যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, লোকের মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ততই বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। শান্তিদেবী সুসময় দেখিয়া পুনরায় এই পরিত্যক্ত লীলাভূমে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইলেন। লোক জ্ঞানালোচনার অবসর পাইল। এই পরিবর্ত্তন সময়ে কয়েকজন বিশেষ ক্ষমতাশালী মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃ ভাষায় মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। এই মহা পুরুষের সবিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে ইঁহাকে কে না জানেন? ইনি "স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ।" তাঁহার প্রণীত ও অনুবাদিত অনেক পুস্তক ও পুস্তিকা আছে। সে গুলি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারপূর্ণ। তন্মধ্যে "পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী" "বেদান্তের অনুবাদ," "কঠো-পনিষদ,"বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ,""মাণ্ডু-ক্যোপনিষদ, "পথ্যপ্রদান" প্রভৃতি, উল্লেখ-যোগ্য। তিনি "কৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।" তিনি সহমরণ প্রথার প্রতিকূলে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া "চন্দ্রিকা" নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এখানি আজিও জীবিত আছে; কিন্তু বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন চলৎশক্তি রহিত ও অন্ধ-প্রায় হইয়া এক্ষণে বালক "দৈনিকের" শরণাপন্ন হইয়াছে। এইরূপে রামমোহন রায় ও তাঁহার প্রতিপক্ষ পৌত্তলিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের দ্বারা বিশুদ্ধভাবে গদ্য রচনা-প্রণালী বঙ্গভাষায় প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল। নিম্নে রামমোহন রায়ের গদ্য রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্থানাভাব ও সময়াভাব প্রযুক্ত তাহা হইতে বিরত রহিলাম। এই মহাপুরুষের যে আর একটী অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার বিষয় কিছুই উল্লেখ করি নাই। তিনি অতি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার গীতাবলী সর্ব্বজন-সমাদৃত ও সর্ব্বত্র-গীত হয়। বিশ্বপতি বিশ্বে-শ্বরের অনন্ত, অনির্ব্বচনীয়, নিরাকার স্বরূপ

অতি উজ্জলরূপে এই সমস্ত গীতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিলে পাষাণ-হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়; কঠোর নাস্তিকেরও অন্তঃকরণ ঈশ্বরাভিমুখে ধাবিত হয়; এবং নিতান্ত বিষয়াসক্ত,সংসার-সেবকগণের চিত্তও উদাসীন ভাব ধারণ করে। ঐ সকল সঙ্গীতে প্রগাঢ়ভাব, গাম্ভীর্য্য ও অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার যে অসার, জীবন যে অনিত্য, মায়া ও মমতা যে বৃথা এবং ভগবানের প্রতি প্রীতিই যে মানবের নির্ম্মল ও নিত্য সুখের কারণ, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীত সকল হইতে এই সমস্ত উপদেশ লাভ করা যায়। যত দিন বঙ্গ ভাষা থাকিবে, যতদিন ধর্ম্মসঙ্গীতের সমাদর থাকিবে, মহামতি রামমোহন ততদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। ইংরাজ মহাকবি শেলি লিখিয়াছেন,—

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts.",

এ কথা সত্য হইলে, রামমোহন রায়ের গীতাবলি বঙ্গসাহিত্যে আজিও তুলনা রহিত। নিম্নে তাহার ৪টী সঙ্গীত উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

(১)

সাহানা—ধামাল।

ভয় করিলে যাঁরে, না থাকে অন্যের ভয়;
যাঁহারে করিলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয়।
জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়;
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এত ভাল নয়॥

(২)

ভৈরবী—আড়া ঠেকা।

মনে স্থির করিয়াছ,চিরদিন কি সুখে যাবে?
জীবন, যৌবন, ধন, মান রবে সমভাবে॥
এই আশা-তরুতলে, বসি আছ কুতুহলে,
বিষয় করিয়া কোলে,জাননা ত্যজিতে হবে॥
ওরে মন শুন সার, দিবা অন্তে অন্ধকার,
সুখান্তে দুঃখের ভার, বহিতে হবে—
অতএব অবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ,
ব্রহ্মে কর সমাধান, নির্ম্মল আনন্দ পাবে॥

(৩)

বেহাগ—আড়া।

মন একি ভ্রান্তি তোমার!
আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার?
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে,
তুমি কেবা, আন কাকে,—একি চমৎকার॥
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান ক'রে,
ইহতিষ্ঠ বল তাঁরে, একি অবিচার—
একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তাঁরে দিয়া কর স্তব—এ বিশ্ব যাঁহার॥

(৪)

রামকেলি—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর!
অন্যে বাক্যকবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর॥
যার প্রতি যত মায়া,কিবা পুত্র, কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর॥
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন—নাড়ী ক্ষীণ—হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ, অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর॥

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"ডাক্তার-ব্যবসায়ী কলিকাতার একজন দুর্দ্ধর্ষ নাস্তিক আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন তিনি এই গান শুনিলেন, তখন তাঁহার আত্মার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত একেবারে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।" ধন্য রামমোহন! ধন্য তোমার সঙ্গীত রচনার ক্ষমতা।

রঘুনন্দন গোস্বামী এই সময়ের লোক। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তিনি "রামরসায়ণ" কাব্যের রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বাল্মীকি-বর্ণিত "রামায়ণের" সপ্তকাণ্ড সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই কাব্য খানির কলেবর অতি প্রকাণ্ড—প্রায় দুই খানি কীর্ত্তিবাসী রামায়ণের সমান। প্রতি সর্গের শিরোভাগে গোস্বামী মহাশয়ের স্বকৃত একটী করিয়া সুন্দর সংস্কৃত কবিতা আছে। এই মহাকাব্যে কবি চরিত্র-বর্ণনা, রচনা-নৈপুণ্য ও কবিত্ব শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আদিরস গণনায় গোস্বামী মহাশয় অতি সাবধান ছিলেন। নিম্নে "বর্ষা বর্ণনা" হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"অবিরল ধাইতেছে প্রবল পবন।
বিষয়েতে যেন অতি বিষয়ীর মন॥
নব জলধর দলে ঢাকিল অম্বর।
তমোগুণে যেন পাপীজনের অন্তর॥
তড়িৎ প্রকাশ পায় নব জলধরে।
শ্মশান-বৈরাগ্য যেন বিষয়ী-অন্তরে॥
গুণ নাহি, তবু ইন্দ্র-ধনু বক্র হয়।
স্বভাবতঃ বক্র দেখ খলের হৃদয়॥
অবিরত মেঘ করে সলিল বর্ষণ।
ভক্তিরস দান করে যথা ভক্তজন॥
তার মাঝে কভু জল শিলা বৃষ্টি করে।
জ্ঞান উপদেশ যেন ভক্তি কথান্তরে॥
বৃষ্টি ধারে ব্যথা নাহি পায় গিরিগণ।
দুর্জ্জন-বচনে যেন সুজনের মন॥
পত্রভরে-বৃক্ষ সব লোটায় ভূতলে।
সাধু যেন অবিরত প্রণত সকলে॥
গড়ায়ে পড়িছে জল সদা পত্র-আগে।
সাধু-নেত্র যেন নারায়ণ-অনুরাগে॥
কুটজ, কেতকী, জাতি হইল প্রকাশ।
ভাবাবেশে যেন ভক্ত-বদনেতে হাস॥
তৃণেতে ঢাকিল ভূমি, পথ হৈল গুপ্ত।
কলিকালে যেন হয় বেদ-মন্ত্র লুপ্ত॥
নাহি দেখি উচ্চ নীচ—ঢাকিল জীবনে।
নিজ হিতাহিত যেন মোহ-আবরণে॥
বহুমুখে ধায় সব তটিনী সাগরে।
নানাবিধ শ্রুতি যেন পরম ঈশ্বরে॥"

ইত্যাদি।

বাস্তবিক কবি যেরূপ সুকৌশল-সম্পন্ন, সেইরূপ ভক্তিমান।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী বংশবাটী গ্রামে শ্রীধর কবিরত্ন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কথকতা-ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু সংখ্যক সঙ্গীত আছে। সে গুলি যারপর নাই সরল, সুমধুর ও সুভাব-সঙ্গত। পাঠ বা শ্রবণ মাত্র মন মোহিত হয়। নিম্নে কয়েকটী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল।—

(১)

ভৈরবী—মধ্যমান।

ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥

(২)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরমে মরম-যাতনা ভালবাসার অযতনে।
একা যে একাজে মজে বাজের অধিক বাজে প্রাণে॥
যেজন পীরিতে নাচায়, সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ সব যারে চায়, সে যদি না বাঁচায় প্রাণে॥

(৩)

সিন্ধু---আড়াঠেকা।

যাবত জীবন রবে কা'রে ভালবাসিব না।
ভালবেসে এই হ'ল, ভালবাসার কি লাঞ্ছনা॥
আমি ভালবাসি যারে, সে কভু ভাবে না মোরে,
তবে কেন তারি তরে, নিয়ত পাই এ যন্ত্রণা॥
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভালবাসেনা

(৪)

খাম্বাজ---মধ্যমান।

আমার মন-যন্ত্রণা কভু শুনাওনা তায়।
শুনিলে আমার দুঃখ সে পাছে বেদনা পায়॥
না বাসে না বাসে ভাল,
সুখে থাকে সেই ভাল,
তাহারি মঙ্গলে মঙ্গল শুনিলে প্রাণ যুড়ায়॥

নবদ্বীপাধিপতি গিরীশচন্দ্র রায়ের সভায় কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী বাস করিতেন। তিনি অতিশয় সুরসিক ও উপস্থিত বক্তা ছিলেন। সেই জন্য মহারাজ তাঁহাকে "রস সাগর" উপাধি প্রদান করেন। তিনি সংস্কৃত, হিন্দী, পারসী, ও বাঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ দ্রুত-রচনা শক্তি ছিল। প্রশ্ন করিয়া প্রশ্নকারীকে উত্তরের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতে হইত না। তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। যাহা জানিতেন, কার্য্যকালে তাহা আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিতেন। কিন্তু এই স্থলে ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না যে, রসসাগর নানা ভাষা ও বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেও তাদৃশ কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। এইরূপ দ্রুত-রচনায় যে দোষ ঘটে, তাঁহার রচনায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কবিত্বশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পায় নাই। ফরমাইসে কবিত্ব-সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক বিনষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটী সমস্যা-পূরণ উদ্ধৃত হইল—

১ম

প্রশ্ন—রমণীর গর্ব্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।
পূরণ—লক্ষী নারায়ণ এক চক্র পাত্রে থুয়ে,
তাড়ন করয়ে লোক হুতাশন দিয়ে॥
তৃণ কাষ্ঠ পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল।
রমণীর গর্ব্ভে পতি ভয়ে লুকাইল। *

২য়

প্রশ্ন—গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।
পূরণ—মহারাজ রাজধানী নগর বাহির,
বারোয়ারী মা কেটে হলেন চৌচির।
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির,
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।

৩য়

প্রশ্ন—নিশিতে প্রকাশ পদ্ম, কুমুদিনী দিনে।
পূরণ—জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা পালো মনে।
চক্রান্ত করিল চক্রী চন্দ্র আচ্ছাদনে॥
আকাশেতে কাল নিশি উভয়ে না জানে
নিশিতে প্রকাশ পদ্ম, কুমুদিনী দিনে।

কথকতা, পাঁচালী, কীর্ত্তন, যাত্রাদি দ্বারা যে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট পুষ্টি-সাধন ও মধুরতা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এস্থলে তাহাদের স্বতন্ত্র পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। তবে এই সম্প্রদায়ের একজনের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। তাঁহার নাম দাশরথি রায়। দাশুরায়ের পাঁচালী দেশ-বিখ্যাত। কি ভদ্র, কি ইতর—কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত—কি পুরুষ, কি রমণী—সর্ব্বসাধারণেই দাশ-

* লক্ষী—তণ্ডুল, নারায়ণ—জল।

রথি রায়ের নাম ও তাঁহার প্রণীত দুই একটী গানও অবগত আছেন। তিনি পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করিয়া অনেক "পালা" রচনা করিয়া গিয়াছেন। আবার, বহুসংখ্যক "পালা" তাঁহার স্ব-কপোল-কল্পিত। এই সকল কবিতার স্থানে স্থানে অতি উচ্চদরের কবিত্ব শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার রচনার অনেক স্থল এতদূর জঘন্য ও অশ্লীল যে, সেগুলি বয়স্যবর্গের সমক্ষে পাঠ করা দূরে থাকুক, নিভৃতে আপনা আপনি পড়িতে লজ্জা বোধ হয়। তাঁহার সঙ্গীত সকল যেরূপ সরল ও সুললিত, সেইরূপ মনোহর ও স্বভাব-সঙ্গত। এগুলিতে বিবিধ রসের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটী গীত উদ্ধৃত হইল।

(১)

সুরট—ঝাঁপতাল।

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি!
ওহে ভক্তিপ্রিয়!
আমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দা-গোপ-নারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী
আমার ধর ধর জনার্দ্দন, পাপ-ভার-গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি।
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরি, মন-ধেনুকে বশ করি,
তুষ্ট হৃদি-গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি॥
আমার প্রেমরূপ যমুনা-কূলে,
আশা-বংশীবট-মূলে,
স্ব-দাস ভেবে সদয় ভাবে সতত কর বসতি।
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী থাকি ব্রজ-ধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার
দাস হবে হে দাশরথি॥

(২)

ধনী! আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার, বিশেষ গুণ সে জানে॥
চারি যুগে মম আয়োজন হয়, একত্রেতে চূর্ণকরি, সমুদয়,
গঙ্গাধর চূর্ণ আমারি আলয়, কেবা তুল্য মম গুণে।
ওহে ব্রজাঙ্গনা কি কর কৌতুক, আমারি সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুঃখ, ভ্রমণ করি এ ভুবনে।

(৩)

খাম্বাজ—একতালা।

আর কি সময়, নাহি রসময়, বাজাতে মোহন বাঁশি।
তোমারি জন্যেতে, অরণ্যে আসিতে, সতত অভিলাষী॥
সতত গুরুজনার নিকটেতে রই,
বাঁশি শুনে প্রাণে ব্যাকুলিতা হই;
এ কথা ফুটিয়ে কাহারে বা কই, প্রতিবাসী প্রতিবাসী॥
কে বলে সরল বাঁশী তোমারি,
তবে কেন লয় মন প্রাণ হরি,
ছাড়না ছলনা কপট শ্রীহরি, শ্রীমতী তোমার দাসী॥

এই সময়ে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যে কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। একদল ইংরাজী সাহিত্য ও অপরদল সংস্কৃতসাহিত্য হইতে অনুবাদ ও ভাব সঙ্কলন করিয়া যে কত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। এই স্থলে উভয়দলের দুই চারিজন প্রধান প্রধান লেখকের বিষয়

সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। ইংরাজী-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আর কি পরিচয় দিব? ইহাঁদের সঙ্কলিত, বিরচিত ও অনুবাদিত প্রবন্ধ সকল একত্র করিলে একটী ছোট রকমের পুস্তকালয় হইয়া দাঁড়ায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত "বিদ্যাকল্পদ্রুম" এবং মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বঙ্গভাষার মহামূল্য সম্পত্তি;—বঙ্গভাষার দুইখানি Encyclopedia. সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প, বস্তু ও প্রাণি-তত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহুল শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সকল এই উভয় সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইত। বিশেষতঃ "বিবিধার্থ-সংগ্রহে" মধ্যে মধ্যে সুন্দর প্রতিকৃতি থাকিত। প্রস্তাব সকলের ভাষা অতিশয় জটিল ও দুর্বোধ হইলেও, সেগুলিতে সম্পাদকদ্বয়ের অগাধ বিদ্যা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গভীর গবেষণার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন; আর মিত্র মহাশয় জীবিত থাকিয়াও এক্ষণে মাতৃভাষার উপর বীতরাগ হইয়া উঠিয়াছেন।

এই স্থলে বাবু নীলমণি বসাকের পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। তিনি এই সময়েরই লোক। তাঁহার "পারস্যোপন্যাস ও "নবনারী' নামক পুস্তকদ্বয় যারপর নাই সরল গদ্যে লিখিত হইয়াছে। এই দুই খানি গ্রন্থ আজিও অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন। যখন গদ্য রচনায় লোকে সুদীর্ঘ সমাস সমন্বিত শব্দাড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন, সে সময় তিনি সরল অথচ সাধু ভাষায় মনের সকল ভাব অবাধে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। "পারোস্যোপন্যাসের" স্থানে স্থানে সুললিত ও সুমধুর কবিতা আছে। তাঁহার "নবনারীতে" এদেশীয়, প্রাচীন ও আধুনিক সময়ের নয় জন প্রাতঃস্মরণীয় মহিলার জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা এক খানি সুন্দর স্ত্রী পাঠ্য পুস্তক।

সংস্কৃত কলেজের ভূষণ স্বরূপ মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় দুই খানি মাত্র কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে "রস-তরঙ্গিণী" ও একবিংশ বৎসর বয়সে "বাসবদত্তার" রচনা করেন। "রস-তরঙ্গিণী" কতকগুলি আদিরস ঘটিত সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার পদ্যানুবাদ মাত্র। এই ক্ষুদ্র কাব্য খানির রচনা "বাসবদত্তার" রচনা অপেক্ষা সরল ও সুমধুর। অনুবাদ যার পর নাই মনোহর হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কাব্যের অধিকাংশ স্থল এতদূর অশ্লীল, যে কোন ক্রমেই পাঠ করা যায় না। তর্কালঙ্কার মহাশয় যে কিরূপ উৎকৃষ্ট অনুবাদক ছিলেন, নিম্নে একটী মূল কবিতা ও তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইতেছি।

মূল—ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা
কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ।

অনুবাদ—

নয়ন কেবল; নীল উত্পল,
মুখ শতদল দিয়া গড়িল।
কুন্দে দন্ত পাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল॥
শরীর সকল, চম্পকের দল,
দিয়া অবিকল; বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে, ওলো কি কারণে,
পাষাণে তোমার মন গঠিল॥

উজ্জয়িনীর অধিপতি ভুবন-বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন বররুচির ভাগিনেয় সুবন্ধু সংস্কৃত ভাষায় বাসবদত্তা নামে যে মনোহর গদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, মদনমোহন তাহারই উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া স্বীয় কাব্যের রচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাতে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত গজগতি, দ্রুতগতি, দিগক্ষরা, অনুষ্টুপ প্রভৃতি ছন্দে অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ভারতচন্দ্র প্রণীত অন্নদা মঙ্গলের পূর্ব্বে বাসবদত্তা প্রকাশিত হইলে, ইহার সৌরভ চারিদিক আমোদিত করিত, সন্দেহ নাই। ইহার কোন কোন স্থল যার পর নাই অশ্লীল। এই কাব্যে কবি অসাধারণ কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বালক বালিকাগণের প্রথম পাঠ্য পুস্তকের একান্ত অসদ্ভাব দেখিয়া, মদনমোহন তিন ভাগ "শিশুশিক্ষা" রচনা করেন। ইহার পূর্ব্বে প্রথম শিক্ষার্থীগণের পাঠোপযোগী এরূপ মনোহর পুস্তক আর লিখিত হয় নাই। বাস্তবিক এগুলি অতি উপাদেয় হইয়াছে। "পাখী সব করে রব" প্রভৃতি প্রভাত-বর্ণনা বিষয়ক যে একটী কবিতা আছে, তাহা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই কণ্ঠস্থ। ইহা প্রসাদগুণের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহার কোন কোন স্থানের বর্ণনায় প্রকৃত কবিত্বের অঙ্গ-হানি হইয়াছে। তিনি "সর্ব্ব-শুভকরী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত করেন। উহাতে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ তিনি গদ্যে রচনা করেন। "সেরূপ ওজস্বিনী বাঙ্গালা রচনা তৎপূর্ব্বে আর কখনই প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি ঐ প্রস্তাব কখনই ওরূপ লিখিতে পারিতাম না।"

তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় কাদম্বরী ও রাসেলাস নামক পুস্তকদ্বয়ের অনুবাদক। বাণভট্ট বিরচিত সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্য-কাব্য "কাদম্বরী" হইতে প্রথম খানি এবং ইংরাজ লেখক-কুল-ভূষণ জনসন প্রণীত "রাসেলাস" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে দ্বিতীয় পুস্তক এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গভাষায় লিখিত অধিকাংশ মৌলিক গ্রন্থ গুণ-গৌরবে ইহাদের সমকক্ষ নহে। বিশেষতঃ "কাদম্বরীর বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধুর্য্য ও অর্থের গাম্ভীর্য্যে প্রগাঢ়"। গ্রন্থের যে কোন স্থল একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, আর সহজে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। গ্রন্থখানি সংস্কৃত কাদম্বরীর অবিকল অনুবাদ নহে।

এক্ষণে আমরা সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহার বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি পুরাতন ও নূতন সাহিত্যের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন বলিয়া, এই স্থানে তাঁহার বিষয় আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছি। তিনি প্রবোধ-প্রভাকর, হিত-প্রভাকর, বোধেন্দু-বিকাশ এবং ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের জীবনী রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। তিনি "প্রভাকর" নামে মাসিক পত্র এবং "সংবাদ-প্রভাকর" "সাধুরঞ্জন" ও "পাষণ্ড-পীড়ন" নামক আর তিন খানি পত্রের সম্পাদক ছিলেন। মাসিক প্রভাকরের অধিকাংশ বিবিধ পদ্য রচনায় পরিপূর্ণ থাকিত। মনোমোহন বসু,

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালার বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য-শিষ্য। তাঁহারা এই প্রভাকরেই প্রথমে লেখনী চালনা করেন। সংবাদপ্রভাকর আজিও প্রত্যহ প্রকাশিত হইতেছে। সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পত্রের বর্ত্তমান সম্পাদক। শেষোক্ত দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রের পরিচয় তাহাদের নিজ নিজ নামেই ব্যক্ত রহিয়াছে। গুপ্ত কবির এই পাষণ্ড-পীড়নের সহিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদিত "রসরাজ" পত্রের কিছু দিন ধরিয়া "কবিতা-যুদ্ধ" চলিয়াছিল। এই উপলক্ষে উভয় পত্রে এরূপ অশ্লীল কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ সকল বাহির হইত যে, সহজ অবস্থায় কোন মনুষ্যই সে গুলি পাঠ করিতে পারে না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ভাস্কর" নামক আর একখানি পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার গদ্য-রচনার ক্ষমতা বিলক্ষণ ছিল। খর্ব্ব-কায় বলিয়া তিনি সাধারণের নিকট "গুড় গুড়ে" ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত।

অল্প দিন হইল, বঙ্কিমবাবু গুপ্ত-কবির বিবিধ সমালোচনা করিয়া কবিবরের কবিতাবলীর প্রথম ভাগ সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার ন্যায় সংক্ষিপ্ত অথচ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সমালোচন বঙ্গভাষায় আর আছে কি না, আমি জানি না। আমরা সেই সমালোচনার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিরূপ কবি।

"প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহু কষ্টে পিসিমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে এ "কেলা কা ফুল।" রাগে সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলই মোচা ভুলিয়া "কেলা কা ফুল" বলিতে শিখিয়াছি।

এক দিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথি লক্ষ বীচি-বিক্ষেপশালিনী——মৃদুপবন-হিল্লোলে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্র-করমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদী-বক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্র-রশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজী কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজীর সঙ্গে এ ভাগীরথির ত কিছুই মিলে না। কালিদাস, ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময় গঙ্গা-বক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে॥

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা

বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেইরূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হৌকৃসুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি।

* * * * *

মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া, তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এসব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা। * * * যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি? ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসের রসিক—সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষ পার্ব্বণে পিটা-পুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্য-রস টুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদা ফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বরগুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রু বিন্দু শ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দেও—তিনি চালের দরটী কষিয়া দেখিয়া, তাহার ভিতর একটু রস পান।

মনের চেলে মন ভেঙ্গেছে,
ভাঙ্গা মন আর গড়েনা কো॥

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন-গোড়ায় বসাইয়া, খাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটি কাব্য-রস বাহির করেন।

"বধুর মধুর খনি মুখ শতদল,
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল॥"

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাজীর ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্য রস পান। তপ্সে মাছে মৎস্য ভাব ছাড়া তপস্বী

ভাব দেখেন। পাঁটায় বোকা-গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী ;—প্রেমের আধার, প্রাণের পুলার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার;—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। * * তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময়, যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য যুবতীগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়তঃ সেই নীহার-শীতল স্বচ্ছ সলিল-ধৌত কষিত-কান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিবেন, "দেখ দেখি, কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়া বাড়ি কর কেন!" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া বলিবে, "ধন্য স্বামী পুত্র-সেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য।" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাঁধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী ননদের মুণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটুম্ব-ভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বরগুপ্ত Satirist. ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষ-প্রসূত। * * ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গে কিছু মাত্র বিদ্বেষ নাই—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সম্মুখে পড়ে, তাঁহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন——কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনান্ট গভর্ণর, কৌন্সিলের মেম্বরগণ হইতে মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা, কেহ ছাড়া নাই। * * যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,—

"বিড়ালাক্ষী, বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে"

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।
নসী, জশী, ক্ষেমী, বামী,রামী, শামী গুল্কী॥

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitator দের কাণ ধরিয়া টানা টানি--

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনে শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালী ঘাস।
যেন, রাঙ্গা আম্‌লা, তুলে মাম্‌লা,
গামলা ভাঙ্গে না।
আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব,
ঘুসি খেলে বাঁচ্‌ব না॥

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন—

যখন আস্‌বে শমন, করবে দমন,
কি বোলে তার বুঝাইবে।
বুঝি, হুট্‌ ব'লে বুট্‌ পায়ে দিয়ে,
চুরুট্‌ ফুঁকে স্বর্গে যাবে॥

এক কথায় সাহেবদের নৃত্য গীত—

গুড়্‌ গুড়্‌ গুম্‌ গুম্‌ লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥

* * ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালি

গালাজ করিতেন। মেকির উপর তাঁহার যথার্থ রাগ ছিল। * * অনেক সময়ে ঈশ্বরগুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধ-সম্ভূত।* * * *

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তা তেমনই আর এক প্রধান দোষ। শব্দ-চ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়।"*

এই অবসরে আমি একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাই। অতঃপর যাঁহারা সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তকাবলীর অনুবাদ করিয়াছেন, বালকগণের শিক্ষার্থ বিবিধ বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় কিছুই বলিতে পারিব না। তাঁহাদের সংখ্যা বহু। স্বতন্ত্র রূপে প্রত্যেকের বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে, সভার সময়ে কুলাইয়া উঠিবে না, এবং বিলক্ষণ আশঙ্কা হয়, পাছে, প্রবন্ধ কলেবর অযথা স্ফীত হইয়া, সভাসীন মহোদয়গণের ধৈর্য্য-চ্যুতি ও বিরক্তি উৎপাদন করে। ইঁহাদের দ্বারা বঙ্গভাষার যে কতদুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইঁহারা সকলেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ভাজন।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম হইতে, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যতদূর সম্ভব, একটী ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত প্রবন্ধ হস্তে, আপনাদের সমক্ষে অগ্রসর হইতে সাহস করিয়াছি। ভরসা করি, আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীহেমনাথ মিত্র।

* প্রবন্ধ পাঠকালে উদ্ধৃতাংশের কোন কোন স্থল পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (২০শ)

(মহাপ্রকাশ।)

মহাপ্রকাশের কথা বলিবার পূর্ব্বে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষদিগের জীবনে এই একটী চমৎকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও সময়ে সময়ে মহাভাবে বিভোর হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন বোধ করিয়া ভগবদুক্তিতে কত ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পাছে তদীয় শিষ্যগণের বা অপরের তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মে, সেজন্য বহু সময়ে তাঁহারা বাক্যে, উপদেশে, ব্যবহারে ও জীবনে আপনাদের মানবভাব দেখাইতে ক্রটী করেন নাই। অন্য মহাপুরুষদিগের কথা এখানে বলিব না; গৌরের সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ করিবার উপায় নাই। একথা কেহ বলিতে পারিবে না যে, তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, বা এমন সকল কথা বলিয়াছেন, যাহা দ্ব্যর্থ বা অস্পষ্টার্থ। আপনার মানবত্ব বিষয়ে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে ভুরি ভুরি উপদেশ

দিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে সে সকল উক্তির অনেক কথা উদ্ধৃত করা গিয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে একটী কথা বলিব। তাঁহার মহাভাবের অবস্থায় তিনি যে কথন কথন আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া কথা বলিতেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই ঐ আশ্চর্য্য অবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা সময়ান্তরে করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সাধনের এক অবস্থায় উহা যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিবার সময় তিনি সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৌরচন্দ্র বলিতেছেন ;—

অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার ;
সম্ভোগে মাদন,বিরহে মোহন নাম তার।
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ,
উদ্‌ঘূর্ণা ; চিত্রজল্প, বিরহে দুই ভেদ।
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম ;
ভ্রমর গীতা দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ।
উদ্‌ঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদি নাম ;
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান।"
চৈঃ চঃ অন্তঃ ২৩ পৃঃ।

বিরহাবস্থায় মোহন নামে মহাভাবের দশা হয় ; তাহারই প্রকাশ বিশেষের নাম উদ্‌ঘূর্ণা। উদ্‌ঘূর্ণা অবস্থায় আবার দিব্যোন্মাদি মহাভাব জন্মে, তখন বিরহের ভিতরেও ঈশ্বর স্ফূর্ত্তি হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের বোধ হইতে থাকে। পাঠক মহাশয়! ইহার পরেও কি আর গৌরচরিতে কলঙ্কারোপ করিবেন? আর আপনারা, যাঁহারা তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন, আপনারা কি বলিবেন? লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপনার ঈশ্বরস্বরূপ গোপন করিতেন, এ কথা কি আর বলিবার পথ আছে?

প্রাতঃকালে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবাসের আলয়ে উপবিষ্ট, ভক্তমণ্ডলী অল্পে অল্পে আসিয়া উপনীত হইল ; গৌরের ইঙ্গিতে উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অন্য দিনের ন্যায় গৌরচন্দ্র দাস্যভাবে নাচিতে আরম্ভ করিলেন ; ক্রমে ভাবপ্রকাশ আরম্ভ হইয়া ক্রমে পূর্ণ মাত্রায় ঐশ্চর্য্যময় মহাভাবে পরিণত হইল। অন্য দিন নাচিতে নাচিতে ঈশ্বরভাবে বিভোর হইয়া তিনি বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিতেন এবং ক্ষণকাল পরে ভাব অপগত হইলে যেন না জানিয়া বসিয়াছিলেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া অপ্রতিভ হইতেন। আজ আর ক্ষণকালের কথা নহে, সাতটী প্রহরের জন্য গৌরহরি নরহরি ভাবে মগ্ন হইয়া বিষ্ণুখট্টা অধিকার করিয়া বসিলেন। পাঠক মহাশয়, আকাশের চাঁদে গ্রহণ লাগা দেখিয়াছেন ; প্রথম রাহু স্পর্শ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত গ্রহণের স্থিতি এক প্রহর দশ দণ্ডের অধিক প্রায়ই দেখা যায় না ; কিন্তু আজ হৃদয়াকাশে গৌরচন্দ্রে যে গ্রহণ লাগিল, তাহার স্থিতি সাত প্রহর। আকাশের চাঁদের গ্রহণে রাহুশক্তি চন্দ্র স্পর্শ করে; এখানে হরিশক্তি গৌরচন্দ্রকে গ্রাস করিল। খাটের উপরে বসিয়া গৌরের আদেশ হইল 'আমার অভিষেক গীত গাও!' ভক্তগণ অমনি অভিষেক সঙ্গীত গায়িতে লাগিলেন,আর বিশ্বম্ভর মাথা ঢুলাইতে লাগিলেন। ভক্তমণ্ডলী মনে করিলেন যে, গৌরের জলাভিষিক্ত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। তখন একশত আট কলস গঙ্গাজল আনাইয়া তাহাতে চন্দন, কর্পূর ও চতুঃসোম সংপৃক্ত করতঃ বৈদিক স্নানের পুরুষসূক্ত উচ্চারণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তদীয় মস্তকোপরি

ঢালিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের যে সকল দাস দাসীগণ গঙ্গার ঘাট হইতে জল বহিয়া আনিতেছিল, তাহাদের মধ্যে দুঃখী নামে একটী স্ত্রীলোক ছিল; সুরসিক গৌরচন্দ্র তাহার ভক্তিভাবে জল আনা দেখিয়া তাহার নাম বদলাইয়া "সুখী" নাম রাখিলেন;—

'জল আ'নে এক ভাগ্যবতী দুঃখী নাম;
আপনি ঠাকুর দেখি বলে আন! আন!
আপনি ঠাকুর তার ভক্তি যোগ দেখি;
দুঃখী নাম ঘুচাইয়া থুইলেন সুখী।"

চৈঃ ভাঃ।

স্নানান্তে ভক্তদল অঙ্গ সংস্কার ও গৌর-দেহে চন্দন মাল্য পরাইয়া ও পট্টবস্ত্র পরি-ধান করাইয়া বিষ্ণুখট্টা সজ্জিত করতঃ তদুপরি উপবেশন করাইলেন; নিত্যানন্দ তাঁহার শিরোপরি ছত্র ধরিলেন, কেহ চামর ঢুলাইতে লাগিল, এবং আর সকলে ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ করিলেন। কিছু-ক্ষণ পরে দেখা গেল গৌরের চরণতলে রাশী-কৃত পুষ্প মাল্য, ধূপ, দীপ, চন্দন, কুঙ্কুম, আবির প্রভৃতি স্তুপাকারে সঞ্জীকৃত হইয়াছে, চারিদিকে স্তবপাঠ হইতেছে ও শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতির বাদ্যধ্বনিতে অঙ্গন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একে মনসা, তাতে ধুনার গন্ধ; আর কি রক্ষা আছে; একে ভক্তিমুগ্ধ ভক্ত-দল, তাতে আবার সে দিন গৌরের পক্ষ হইতে বাধা পড়িতেছে না। পড়িবেই বা কেমন করে? যে বাধা দিবে, সেতো আর তাহাতে নাই। কিন্তু ভক্তদল! তোমরা ইহার দ্বারা কি করিলে কিছু বুঝিতে পারিলে না; অবশ্য তোমাদের যাহা বিশ্বাস মনের আবেগে তাহা করিয়াছ, ইহাতে বাহিরের লোকের কথা কহিবার পথ নাই। কিন্তু পৃথিবী শুদ্ধ লোক তো আর ভিতরের কথা বুঝিবে না।

ভক্তগণ এইরূপ মহাধুমধামের সহিত গৌরাঙ্গ পূজা করিতেছেন; ষোড়শোপচারে, কেহ পঞ্চোপচারে, কেহ কেহ নানা উপচারে পূজার আয়োজন করিতেছেন; ইহার মধ্যে বিভোর গৌরচন্দ্র দক্ষিণ হস্ত পাতিয়া বলি-লেন 'কিছু দাও' খাই।' অমনি যাহার যাহা ইচ্ছা হইল, তিনি তাহা হাতে দিতে লাগিলেন। কেহ নারিকেল, রম্ভা প্রভৃতি ফল, কেহ দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর ও নবনীত, কেহ সন্দেশ, মিঠাই, ও পক্কান্ন প্রভৃতি যাহা যাহা অভিলাষ, তাহা খাওয়াইতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, গৌরাঙ্গ সে দিনে না কি দুই শত লোকের আহারীয় দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন:—

"দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়;
আর কি আছয়ে আন বোলয়ে সদায়।
বিবিধ সামগ্রী খায় শর্করা মিশ্রিত;
মুদ্গ নারিকেল খায় শস্যের সহিত।
কদলক চিপীটক ভর্জ্জিত তণ্ডুল;
আর বার আন বলে খাইয়া বহুল।
ব্যবহারে দুই শত জনের আহার;
নিমেষে খাইয়া বলে কি আছয়ে আর?"

চৈঃ ভাঃ।

ভোজনলীলা সাঙ্গ হইলে আর এক অদ্ভুত লীলা আরম্ভ হইল। সমবেত ভক্ত-মণ্ডলীর এক এক জনকে ডাকিয়া আবিষ্ট গৌরচন্দ্র তাঁহার অতীত জীবনের বৃত্তান্ত ও মনের গোপনীয় কথা বলিতে লাগি-লেন। প্রথমেই তিনি শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন "কেমন হে পণ্ডিত! তোমার কি মনে পড়ে? যেদিন দেবানন্দের টোলে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলে; প্রেম-রসময়

ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া তুমি বিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে পড়িয়াছিলে, দেবানন্দের অজ্ঞ পড়ুয়াগণ বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করত ধরাধরি করিয়া তোমাকে বাহির দুয়ারে টানিয়া ফেলিয়া দিলে, দেবানন্দ দেখিয়া শুনিয়াও কিছু বলিল না। তুমি মনে বড় দুঃখ পাইয়া নিজালয়ে আসিয়া ভাগবতের পাঠ চাহিতে লাগিলে; তখন আমি বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া তোমার চিত্তে আবির্ভূত হয়তঃ ভাগবতের নিগূঢ় অর্থ বুঝাইয়া তোমাকে কাঁদাইয়াছিলাম কি না?" শ্রীবাস এই কথা হৃদয়ে অনুভব করত কাঁদিয়া বিহ্বল হইয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে গঙ্গাদাসকে ডাকিয়া বলিলেন "কি গঙ্গাদাস! সে রাত্রির কথা কি মনে নাই? রাজভয়ে ত্রস্ত হইয়া তুমি সপরিবারে গঙ্গা পার হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলে, কিন্তু ঘাটে নৌকা না দেখিয়া যবনে পরিবার স্পর্শ করিবে ভয়ে তুমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাইতেছিলে; তখন খেয়ারীরূপে নৌকা আনিয়া তোমাকে কে পার করিয়াছিল, তা জান?"

অদ্বৈতাদি সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল। এইরূপে গৌরের ভাব বিভোরে, ভক্তগণের আনন্দ উৎসাহে, নৃত্য কীর্ত্তনে ও সেবায় ব্যস্ততায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যা আগতে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া ও ধূপ দীপ জ্বালিয়া ঘোর ঘটায় গৌরের আরতি হইল।

"এই মত সকল দিবস পূর্ণ হৈলা;
সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিলা।
ধূপ দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ,
অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ততক্ষণ।
শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, মন্দিরা মৃদঙ্গ।
বাজায়েন বহুবিধ উঠিল আনন্দ।
অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র,
কিছু নাহি বলে, যত করে ভক্তবৃন্দ।
নানাবিধ পুষ্প সবে পাদপদ্মে দিয়া,
'ত্রাহি প্রভু' বলি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
কেহ কাকু করে কেহ করে জয়ধ্বনি,
চারিদিকে আনন্দ ক্রন্দন মাত্র শুনি।
কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে,
যে আইসে সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে।
প্রভুর হইল মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ,
যোড় হাতে সম্মুখে রহিল সর্ব্বদাস।
ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি,
লীলায় আছেন গৌরসিংহ কুতূহলী।"

শ্রীধরের ভক্তি লাভ।

খোলা-বেচা শ্রীধরের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ইনি এক জন দীন দরিদ্র, তরকারি বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতেন। নবদ্বীপের প্রান্তভাগে ইঁহার ভগ্ন কুটীর। ইনি একজন মহাশয় ব্যক্তি;—

"মহা সত্যবাদী তিঁহ যেন যুধিষ্ঠির;
যার যেহ মূল্য তাহা না বোলে বাহির।
চারি প্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণ নামে।
সর্ব্ব রাত্রি হরি বলে সুদীর্ঘ আহ্বানে।
যতেক পাষণ্ডী বলে শ্রীধরের ডাকে;
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই দুই কর্ণ ফাটে।
মহাচাষা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি মরে।
চৈঃ ভাঃ।

পরমাবিষ্ট গৌরচন্দ্র আদেশ করিলেন, "ভক্তগণ! শীঘ্র যাও, শ্রীধরকে ডাকিয়া আন। সে আসিয়া আমার আজ্‌কার প্রকাশ দেখুক।

আদেশ শ্রবণমাত্র দুই চারি জন ভক্ত ছুটিয়া শ্রীধরের পর্ণকুটীরে যাইয়া উপনীত হইল এবং তাঁহাকে গৌরের মহা প্রকাশের কথা বলিয়া অবিলম্বে তৎ সমভিব্যাহারে গৌর সন্নিধানে পৌছিল। শ্রীধরকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বজীবনে শ্রীধরের সঙ্গে যে কৌতুকাদি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন "শ্রীধর! বল তো আজ্ অষ্টসিদ্ধিকে তোমার দাস করিয়া দি।" শ্রীধর এই কথা শুনিয়া গৌরবের সহিত মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। কথিত আছে যে, বিশ্বম্ভর কোমল শ্যামল বংশীমোহন মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন; সম্মুখে লক্ষ্মী যেন তাম্বুল দিতেছে এবং পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি দেবতাগণ স্তুতি করিতেছে, অনন্ত মস্তকে ছত্র ধরিয়াছে, সনক, নারদ, শুক প্রভৃতি গুণকীর্ত্তন করিতেছে। গৌরচন্দ্র শ্রীধরের গাত্রে হস্ত দিয়া মূর্চ্ছাপনয়ন করিয়া কহিলেন "শ্রীধর, তুমি আমার স্তব পাঠ কর।" শ্রীধর কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল চিত্তে বলিলেন "প্রভো! আমি মূর্খ, নীচ কুলোদ্ভব, আমি কি স্তব করিব?" এই বলিয়া শ্রীধর ভক্তিপূর্ণ চিত্তে কত কথা বলিয়া ফেলিলেন; তাহাতেই এক অপূর্ব্ব স্তবমালা রচিত হইয়া গেল। মূর্খের মুখে এই সব অলৌকিক কথা শুনিয়া ভক্তগণ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

"বিশ্বম্ভর কহিলেন "শ্রীধর! বর লও; আজ তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দিতেছি।"

শ্রীধর উত্তর করিলেন "আর আমাকে বৃথা ভাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছো কেন? এত দিন ভাঁড়াইয়াছ বটে; কিন্তু আর পারিবে না।"

বিশ্বম্ভর অপূর্ব্ব ভাবে আবিষ্ট; বাহ্যজ্ঞান নাই। শ্রীধরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, "শ্রীধর! তোমাকে অবশ্যই বর লইতে হইবে।"

শ্রীধর উত্তর করিল 'যদি নিতান্তই বর লইতে হয়, তো এই বর দাও।'

"যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত,
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্ম জন্ম নাথ।
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল,
মোর প্রভু হউ তাঁর চরণ যুগল।"

বলিতে বলিতে সরলমতি শ্রীধরের হৃদয় প্রেমাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তিনি দুই বাহু তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র ঈষৎ ব্যঙ্গপূর্ণ হাসিয়া বলিলেন "শ্রীধর বলতো এক মহারাজ্যে তোমাকে অধিপতি করিয়া দি।"

শ্রীধর প্রেমাবেগে বলিয়া উঠিলেন, "যাও আমি তোমার ওসব কথা কিছুই শুনিতে চাই না। আমার এই ইচ্ছা যে চিরজীবন তব গুণ গাইয়া বেড়াই।"

তখন গৌরচন্দ্র স্থির গম্ভীর স্বরে সর্ব্ব সমক্ষে বলিলেন; "শ্রীধর! ধন্য তোমার দৃঢ় বিশ্বাস; কিছুতেই তোমার হৃদয় টলিল না। তুমিই ভক্তির উপযুক্ত অধিকারী; আজ তোমাকে আমি বেদের গোপ্য ভক্তি যোগদান করিলাম।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী জয় জয় রবে গগন পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

শ্রীধরের ভক্তিলাভ সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস মহাশয় এইরূপে উপসংহার করিয়াছেন:—

"ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য,
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য।

কি করিবে বিদ্যাধন রূপে যশে কুলে,
অহঙ্কার বাড়ি সব করয়ে নির্ম্মূলে।
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা,
কোটিকল্পে কোটিশ্বরে না পাইবে তাহা।

মুরারি গুপ্তের প্রতি কৃপা।

বিশ্বম্ভর মহা বিভোর অবস্থায় মাথা ঢুলাইতেছেন আর গদাধর পণ্ডিতের প্রদত্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন। সম্মুখে অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়া 'নাড়া' 'নাড়া' বলিয়া ডাকিয়া বলিলেন "কিছু বর চাই?" আচার্য্য বলিলেন "না; যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাইয়াছি।" অদ্বৈতের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে নাটকাভিনয়ের পট পরিবর্ত্তনের ন্যায় গৌরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রামচন্দ্রাবেশে মুরারি গুপ্তকে বলিলেন "গুপ্ত, একবার চাহিয়া দেখ দেখি?" মুরারি গৌরের দিকে তাকাইয়া দূর্ব্বাদল শ্যাম রামরূপ বামদিকে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ও চারিদিকে বানরেন্দ্রগণ যেন স্তুতি করিতেছে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বম্ভর দ্বিগুন উৎসাহে বলিতে লাগিলেনঃ—

"উঠ! উঠ! মুরারি আমার তুমি প্রাণ,
আমি সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি হনুমান।"

মুরারি গুপ্ত চেতনা প্রাপ্ত হইলে গৌরচন্দ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহার নাম ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "গুপ্তেতে উঁহার হৃদয়ে মুরারি বাস করেন; এই জন্য উঁহার নাম মুরারি গুপ্ত।" আর গুপ্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বৈদ্য! বর লও।" মুরারি বলিল 'প্রভু! এই বর দাও যেন চিরদিন তোমার পার্ষদ হইয়া থাকিতে পাই।

গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তথাস্তু।

হরিদাসের দর্শন।

এইবার হরিদাসের পালা। হরিদাস সকলের পশ্চাৎভাগে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, বিশ্বম্ভর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হরিদাস! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা বড়, তোমার যে জাতি আমারও সেই জাতি। যখন পাষণ্ড যবনগণ তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছিল; আমার প্রাণে তাহা শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল; আমি চক্র হস্তে বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে ও তাহাদিগকে দণ্ড দিতে কৃতসংকল্প হইলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম তাহারা তোমাকে মারিতেছে; অথচ তুমি তাহাদিগের কুশলকামনা করিয়া ভালবাসিতেছো, তখন আর তাহাদিগকে মারিতে পারিলাম না; কিন্তু তোমার পৃষ্ঠে যে প্রহার হইতেছিল, নিজ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া লইলাম। আমার প্রকাশের কিছু বিলম্ব থাকিলেও তোমার এই ব্যাপারে তাহা শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া গেল। ভক্ত নির্য্যাতন সহ্য না করিলে আমার প্রকাশ হয় না, সুতরাং পাষণ্ডী নিস্তারের উপায়ও উদ্ভাবিত হয় না। হরিদাস! আমার নাড়াই তোমাকে যথার্থ চিনিয়াছে।

বিশ্বম্ভরের ঈদৃশ করুণ বচন শ্রবণ করিয়া হরিদাস প্রেমে বিহ্বল হওতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে খেদ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হরিদাস কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিলেন "বাপ বিশ্বম্ভর! তুমি জগতের নাথ ; আমি নীচ কুলোদ্ভব অতি নীচ ও মহাপাতকী ; আমাকে উদ্ধার করার ভার তোমার উপরেই আছে। তুমি বিপদ কালের বন্ধু! তোমার স্মরণে কি না হয় ? পাপাসক্ত দুর্য্যোধন সভা মধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে চাহিলে, তখন বিপন্না কুল-কামিনী ব্যাকুল চিত্তে তোমাকে স্মরণ করিলেন, আর অনন্তরূপে তুমি বস্ত্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলে। দুরন্ত হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিপদ সাগরে নিক্ষেপ করিলেও ভক্ত তোমার একমাত্র স্মরণ প্রভাবে হাসিতেং তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। স্মরণ প্রভাবে অজামিল কিনা পাইয়াছিল? আমি এমন দুর্লভ স্মরণ বিমুখ। তোমার প্রকাশ দেখার আমার অধিকার নাই।

বিশ্বম্ভর।—তোমার যাহাতে অধিকার নাহি ; তাহাতে আর কাহারও অধিকার হইতে পারে না। হরিদাস! মনে যে অভিলাষ থাকে, প্রার্থনা কর ; পূর্ণ হইবে।

হরিদাস।—আমি পাপাসক্ত ; আমার আর কোন বাঞ্ছা নাই, কেবল এই কর, যেন আমি ভক্তের উচ্ছিষ্ট খাইয়া ও দাসানুদাস হইয়া থাকিতে পারি।

"প্রভুরে! নাথরে! মোর বাপ বিশ্বম্ভর!
মৃত মুই, মোর অপরাধ ক্ষমা কর।
শচীর নন্দন বাপ! কৃপা কর মোরে,
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে।"

বিশ্বম্ভর।—হরিদাস! বিনয় ছাড় ; তোমার সঙ্গে যে মুহূর্ত্ত কাল বাস করিবে ; সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ হইবে। তোমার শরীরে আমার নিত্য স্থিতি ; এবং তোমার মত ভক্ত লইয়াই আমার ঠাকুরালি। আমি আজ এই মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, বৈকুণ্ঠের ভক্তি ভাণ্ডার তোমারই হইল।

অদ্বৈতের প্রতি।

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের প্রতি পুনর্ব্বা র কটাক্ষ করিয়া তাঁহার মনের কথা বলিতে লাগিলেন "আচার্য্য গোঁসাই! পূর্ব্বের কথা কি কিছু মনে হইতেছে, জগতে ভক্তি শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার জন্য যখন তুমি গীতা ও ভাগবত অধ্যয়ন করিতে ; কোন শ্লোকের ভক্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া যখন ব্যাকুলচিত্তে চিন্তায় নিযুক্ত হইতে ও যতক্ষণ সদর্থ ও সৎপাঠ আবিষ্কৃত না হইত, ততক্ষণ অনাহারে উপবাসী থাকিতে ; তখন কে তোমার প্রাণে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে সত্য পাঠ ও ভক্তির অর্থ বুঝাইয়া দিত ; তুমি তখন মনে করিতে বুঝি স্বপ্নে সিদ্ধিলাভ লাভ হইল।" এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যত শ্লোকে পূর্ব্বে আচার্য্যের দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছিল, সেগুলি নাকি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন ও পুনরায় বলিলেন "আচার্য্য! সকল পাঠই পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি ; কিন্তু একটী বলি নাই ; আজ তাহা বলিব ; গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকের যথার্থ পাঠ এইঃ—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং। [সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্ব মাবৃত্য তিষ্ঠতি]।"

ইহার অনুবাদ

"তাঁহার (ব্রহ্মের) হস্ত ও চরণ সর্ব্বত্র ; তাঁহার চক্ষু ও মুখ সর্ব্বত্র ; এবং তাঁহার কর্ণও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে ; তিনি সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।"

অদ্বৈতের চিরদিনের সন্দেহ স্থল মীমাংসা হইল; মনের মধ্যে এক স্বর্গের আলোক জ্বলিয়া উঠিল; তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেনঃ—

"অদ্বৈত বলয়ে আর কি বলিব মুক্তি,
এই মোর মহত্ব যে মোর নাথ তুঞি।"

ইহার পর বিশ্বম্ভর ভক্তদলকে সাধারণ ভাবে বলিলেন যে "যাহার অভিলাষ থাকে বর যাচ্ঞা কর; আমি পূর্ণ করিব।" তখন যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহা বলিতে লাগিলেন ও বিশ্বম্ভরও হাসিতে২ তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেনঃ—

"কেহ বলে মোর বাপ না দেয় আসিবারে;
তাঁর চিত্ত ভাল হউক এই দাও বরে।
কেহ বলে শিষ্য প্রতি; কেহ পুত্র প্রতি;
কেহ ভার্য্যা প্রতি ভৃত্য যার যেই মতি।
কেহ বলে আমার গুরুর হউক ভক্তি;
এই মত বর মাগে যার যেই শক্তি।"

মুকুন্দ দত্তের দণ্ড।

যে ঘরে এই সব রঙ্গ অভিনীত হইতেছিল, তাহার প্রকোষ্ঠান্তরে সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত অধোবদনে আসীন। যাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বরে ভক্ত দল মুগ্ধ হইতেন; যিনি কীর্ত্তন করিলে গৌরচন্দ্রের পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি মহাভাবের তরঙ্গ সকল উঠিয়া পড়িত; আজ মহা প্রকাশের মহানন্দের দিনে সেই প্রিয় মুকুন্দ কেন নির্ব্বাসিতের ন্যায় বিমর্ষচিত্তে উপবিষ্ট? এ কথার রহস্য গৌরচন্দ্র ভিন্ন কেহ জানে না; মুকুন্দ জানিতেন; কিন্তু বিনানুমতিতে তাঁহার প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই। বিশ্বম্ভর একে একে সকলকেই ডাকিলেন, অথচ মুকুন্দের নাম পর্য্যন্ত করিলেন না দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত সাহসে ভর করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—

"শ্রীবাস বলয়ে শুন জগতের নাথ,
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমার?
মুকুন্দ তোমার প্রিয়; আমা সবার প্রাণ;
কেবা নাহি দ্রবে শুনি মুকুন্দের গান।
ভক্তি নারায়ণ সর্ব্বদিগে সাবধান;
অপরাধ না দেখিয়া কর অপমান।
যদি অপরাধ থাকে তার শাস্তি কর;
আপন দাসেরে কেন দূরে পরিহর।
তুমি না ডাকিলে নারে সমুখ হইতে,
দেখুক তোমারে প্রভু বল ভাল মতে।"

বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন ;—

"প্রভু বলে হেন বাক্য কভু না বলিবা;
ও বেটার লাগি কেহ কিছু না কহিবা।
খড় লয়, জাঠি লয়, পূর্ব্বে যে শুনিলা,
এই বেটা সেই হয় কেহ না চিনিলা।
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে,
ও খড় জাঠিয়া লেঠা না দেখাবে মোরে।"

শ্রীবাস পুনর্ব্বার কহিলেন "তোমার প্রহেলিকা কথা বুঝিতে পারিলাম না, আমরা তো মুকুন্দের কোন দোষ দেখিতেছি না।"

বিশ্বম্ভর। "তোমরা কি বুঝিবে? ও বেটা যখন যে মজলিসে যায়; তখন সেই মত কথা বলিয়া গোড়ে গোড় দেয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে থাকিয়া যখন সে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করে, তখন ভক্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া দন্তে তৃণ করিয়া ভক্তিভাবে নাচিতে থাকে; আবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সভায় অন্য পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া আমার হৃদয়ে জাঠি মারে। ও বেটা ভক্তিস্থানে ঘোর অপরাধী, সেজন্য তাহার দর্শন সঙ্গ বন্ধ পড়িয়াছে।"

মুকুন্দ বাহির হইতে এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া চিরকালের জন্য গৌর দর্শন হইতে বঞ্চিত হইতে হইল ভাবিয়া অঝর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন; এবং শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "পণ্ডিত! সত্য সত্যই আমি গুরুর অনুরোধে বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াছি; ইহাতে সত্য সত্যই আমার ভক্তি স্থানে মহা অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপ-রাধী প্রাণ রাখা যুক্তিযুক্ত নহে; অবশ্যই আমি এ শরীর ছাড়িব।" মুকুন্দের রোদনে ভক্ত মণ্ডলী কাঁদিতে লাগিল দেখিয়া গৌর-চন্দ্র বলিয়া উঠিলেন "আর কোটি জন্ম পরে মুকুন্দ আমার দর্শন পাইবে।"

"প্রভু বলে আর যদি কোটি জন্ম হয়; তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়।" এইকথা শুনিবামাত্র বিশ্বাসী মুকুন্দ 'পাইব' 'পাইব' বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুকুন্দের বিশ্বাস ভাব দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি করিলেন। তথাচ মুকুন্দের গৌর সম্মুখে আসিবার সাহস হইল না। ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া আনিলে মুকুন্দ নির্ব্বেদ সহকারে বিশ্বম্ভর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গ কহিলেন "মুকুন্দ! আর কাজ নাই, উঠ। তোমার দৃঢ় বিশ্বাস তিলার্দ্ধ মধ্যে আমার সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ করিয়াছে; আমার পরাজয়, তোমরই জয়। সঙ্গদোষে তোমার যে পাপ হইয়াছিল, আজ তোমার সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাহা দূরীভূত হইল। তুমি আমার পরিহাস পাত্র, পরিহাসচ্ছলে যাহা বলিলাম, তাহাতে দুঃখ করিও না। আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, তোমার কণ্ঠস্বরে ও রসনায় আমি নিরন্তর বাস করিতেছি।

গৌরের এই সব প্রেমের কথা শুনিয়া মুকুন্দের নির্ব্বেদ দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল; তখন তিনি ভক্তির মাহাত্ম্য ও আপনার দোষ কীর্ত্তন করিয়া বিলাপ করিতে লাগি-লেন। বিশ্বম্ভর কিছু লজ্জাবনত মুখে নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

নারায়ণীর প্রসাদ ভোজন।

শ্রীবাসের বাটিতে প্রেমের হাট বসি-য়াছে; এই আনন্দবাজারে যে যাইতেছে, সে আর রিক্ত হস্তে ফিরিতেছে না। প্রেমান্নে, আনন্দান্নে তাহার আত্মার উদর পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। শ্রীবাসের দাস দাসী যত ছিল, সকলেই এ আনন্দের অংশীদার হইল। কেবল শুষ্ক জ্ঞানাভিমানী ভট্টাচার্য্যগণ ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না। না পারিবারই তো কথা; অহঙ্কার ও পণ্ডিতা-ভিমানের নিকট ভক্তিদেবী অপ্রকট থাকেন। যাহা হউক, রজনী প্রভাতে গৌরের ভাব-তরঙ্গ থামিয়া আসিল; পূর্ণিমার জোয়ারে ভাটা আরম্ভ হইল; মহা ভাবের আবেগ কমিয়া স্থায়ীভাবে পরিণত হইল। তখন আপনার গলদেশস্থিত পুষ্পমালা লইয়া গৌরচন্দ্র ভক্তগণকে একে একে বাঁটিয়া দিলেন এবং আহারীয় পাত্রের অবশেষ শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা, বালিকা নারায়ণীকে খাইতে দিলেন:—

"ভোজনের অবশেষে যতেক আছিল;
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান;
তাহাকে ভোজন শেষ প্রভু করে দান।

"পরম আনন্দে খাঁয় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীর্ব্বাদ।
ধন্য ধন্য এই সে সেবিলে নারায়ণ;
বালিকা স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন।
খাইলে, প্রভুর আজ্ঞা হয় 'নারায়ণী!
কৃষ্ণের পরমানন্দে কাঁদ দেখি তুমি?'
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব,
কৃষ্ণ বলি কাঁদে অতি বালিকা স্বভাব।
অদ্যাপিও বৈষ্ণব মণ্ডলে গায় ধ্বনি;
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই নারায়ণী চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের গর্ভ-ধারিণী। এইরূপে সে দিনকার মহা লীলা শেষ হইল।

পাঠক মহাশয়, এই প্রস্তাবে অনেক অলৌকিক বৃত্তান্ত, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি এবং ভাবুকতার পরিচয় পাইলেন। স্থানে স্থানে যে অলৌকিক কথা বলা হইল, ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস জন্মিবে না, এ কথা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন; এবং তজ্জন্য অবিশ্বাস নিরাকরণ জন্য এই প্রস্তাবের বহুল স্থানে অবিশ্বাসীদিগকে বিবিধমত প্রকারে ভৎর্সনা করিয়াছেন ও নরকের ভয় দেখাইয়াছেন।

"এসব কথায় যার নাহিক প্রতীত:
অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্চিত"

সুচতুর পাঠক সাবধানে এই অলৌকিক দৃশ্যের অত্যাবশ্যকীয় অংশ টুকু বুঝিয়া লইবেন। মধুকরের ন্যায় এই ভাব-কুসুমের গম্ভীর প্রদেশে প্রবেশ করুন; রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের মন্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি; তাহা ছাড়া আর কোন তত্ত্বে কেহ যদি উপনীত হইতে পারেন, তবে বড় সুখের বিষয়। ভাবপ্রবণ দেশে মানুষী লীলায় অমানুষী ভাব প্রক্ষেপ অস্বাভাবিক নয় এবং গ্রন্থকারের চাক্ষুষ বৃত্তান্ত লেখা নয়; এই দুইটা কথা স্মরণ রাখিলে মীমাংসা অনেক সহজ হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গ-মহিলা।

(বৃন্দাবন পথে।)

দ্বিতীয় নিশা প্রভাতে মথুরাপুরী পরিহর মানসে আমরা সমস্ত দিন বাসায় বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে বৃন্দাবন দর্শনার্থে অশ্বযানে বাহির হইলাম। বৃন্দাবনের এই পথের চারিধার ঘন কৃষ্ণ ছায়াময় সুদীর্ঘ বৃক্ষাবলী পরিশোভিত কাননরাজি নব দুর্ব্বাদলে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মধুর নিস্তব্ধতা, এই পথ দিয়া ধীরে ধীরে আমাদিগকে যেন আর এক অভিনব প্রকৃতিরাজ্যে লইয়া চলিল। প্রকৃতি সুন্দরী প্রাণ খুলিয়া পবিত্র নবীভূত সৌন্দর্য্যরাশি অকাতরে পথিকের জন্য এদিক সেদিক ছড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহার এ জগতে রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা নাই। সকলি শোভা, সকলি মাধুরী। ভাবুকজন এখানে আসিলে মগন হইয়া

কল্পনার শোভা বাস্তবিক রাজ্যে দেখিতে পান। আর শোকাভিভূত মনুষ্য-হৃদয় ইহাতে জুড়াইয়া যায়। আর্য্যগণই যথার্থ কবি, তাঁহারা জীবন্ত কবিতা অধ্যয়ন করিতে এই সকল পুণ্য তীর্থ পরিদর্শন প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

"অহিংসা পরমধর্ম্ম" এই মহদ্বাক্যের সার্থকতা এই সব স্থানেই হইয়াছে। মনুষ্যের সহিত ময়ুর ময়ূরী এবং মৃগশিশুগণ একত্র পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। তাহা দেখিলে পুণ্যময় অতীতকালের তপোবন স্মৃতি আমাদিগের মানস পটে আবার জাগরুক হয়। ঋষিকুমার কুমারী যে হরিণ-শিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেন, তাহা আর্য্য কবির কল্পনা নহে, প্রকৃত চিত্র।

আমরা সন্ধ্যাসমাগমে চিরবসন্তময় রাজ্য বৃন্দাবনে আসিয়া নামিলাম। এক জন বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমাদিগকে তাহার বাটীতে বাসা দিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেল। বৃন্দাবনের বাড়ী "কুঞ্জ" নামে অভিহিত। যাত্রী দেখিলে বৈষ্ণবগণ আপন আপন "কুঞ্জে" বাসা দিতে যত্ন করে, তবে আমাদিগকে প্রকৃত তীর্থ যাত্রী বোধ না হওয়াতে তাহারা বড় সাধিয়া বাসা দিতে অগ্রসর হইল না। এখানেও পাণ্ডাঠাকুর মূর্ত্তিমান্, তাঁহারাই সকল সুবিধা করিয়া দিলেন।

বৃন্দাবন।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন কয়েক ক্রোশ পথ মাত্র ব্যবধান এবং চতুর্দ্দিকে নীল শোভাময়ী যমুনা, মধ্যে স্বর্গ কাননবৎ বৃন্দাবন দ্বীপ সম বিরাজিত, ইহাকে "আলোদ্বীপ আঁধার সাগরে" বলা যায়। এ পুণ্যদ্বীপের মাধুরী জীবলোক মুগ্ধ-কর ও পত্র পুষ্প বিশিষ্ট। নব পল্লবিত শ্যামল তরুকুলের চির প্রফুল্ল সৌন্দর্য্য রাশি এ দ্বীপ অঙ্কে নিরীক্ষণ করিলে ইন্দ্রালয়ের নন্দন কানন কল্পনা-নেত্রে যেন ফুটিয়া উঠে।

শান্তিময়ী যমুনার ঘাটশ্রেণী পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করিয়াছে। এই সকল ঘাটে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেন, সেই নিমিত্ত ইহার স্মৃতি ভক্ত বৈষ্ণব বৃন্দের নিকট অতীব আদরণীয়। তাঁহারা যে ভাবে এ সকল ঘাট দর্শন করেন, আমরা সে ভাবে তাহা না দেখিয়াও প্রচুর আনন্দ পাইয়াছি।

মাননীয় বঙ্কিম বাবুর শ্রীকৃষ্ণ নহেন, গোস্বামী মহাশয়ের কিম্বা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণঠাকুর যে ঘাটের কদম্ব তরু-শাখায় গোপবালার অপহৃত বস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের পল্লব একটু নূতনতর। গোপীনাথের "করপুটের চিহ্ন" নাকি ঐ সমুদায় পত্রাবলীতে প্রকাশিত হইতেছে। ভক্তজনের চক্ষে দেবতার লীলা খেলা অবশ্যই মালিন্যকণাহীন কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈষ্ণব কবিগণ ভক্তির স্রোতে, কবিত্ব-হিল্লোলে ভাসিয়া গিয়া তাহাদিগের "মহাপ্রভুকে" কিছু বেশি মাত্রায় বিলাসী করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাজন পদাবলী ও অন্য বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িলে ভক্তি বিষাদে পরিণত হয়। তবে আজি কালিকার অনেক বিজ্ঞ সমালোচক কৃষ্ণচরিত্রে নানা প্রকার অলৌকিকতা দেখাইতেছেন।

আরতির মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন বাসায় রহিয়া শুনিতে শুনিতে সুনিদ্রায় বিভাবরী পোহাইলে "রূপসী উষার অরুণ ভূষার"

তরুণ' শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আমরাও "পথিক মন"কে জাগ্রত করাইয়া পরদিন প্রভাতেই দেব দর্শনে গমন করিলাম।

বৃন্দাবনে গাড়ী প্রভৃতি পাওয়া যায় না, সুতরাং পদব্রজে গমন করাই নিয়ম। জুতা, ছাতা ও ছড়ি লইয়া মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ থাকায়, তাহা দ্বারবানের নিকট গেটে রাখিয়া যাইতে হয়। "এখানে আসিলে সকলি সমান," লক্ষপতি হইতে অতি গরিব পর্য্যন্ত এ স্থানে "একই মূল্য বহন করে, এ বাজারে সব এক দর" "রাজা মহারাজা, "মহামহোপাধ্যায়" "নক্ষত্র" অনক্ষত্র "রায় বাহাদুর" হইতে সামান্য কৃষক এখানে আসিয়া পাদুকা-বিহীন হন। ইংরাজের কিম্বা বিধাতার উপাধির এ স্থানে সমান গৌরব।

প্রথমেই আমরা "গোবিন্দজী ও রাধা-রাণী" দেখিতে গেলাম। তখন কেবল মাত্র ললিত প্রভাত-রশ্মি উচ্চ মন্দির চূড়ায় কনক কিরণ প্রতিভাত হইয়াছে ও কাল পিক-কূজনে বৃন্দাবন জাগিয়া উঠি-য়াছে, সেই সময়ই মন্দিরের চারিধার লোকারণ্যে পরিপূর্ণ এবং যাত্রীগণ যুক্ত-করে বসিয়া যেখানে হরিনাম জপ করি-তেছিল, আমরাও সেখানে গিয়া দাঁড়াই-লাম। গোবিন্দজী ও রাধারাণীই বৃন্দা-বনের প্রধান বিগ্রহ।

গৃহত্যাগী ভিখারীর স্থান বৃন্দাবন, বৈষ্ণব কিম্বা গোস্বামী ভিন্ন অন্য লোক তত দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ পুরুষ কৌপীন ও নামাবলীধারী, আর স্ত্রীলোকেরাও এখানে অতি সঙ্কীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে। পূর্ব্ব বঙ্গের বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এখানকার অধিবাসীর মধ্যে বেশি হইলেও নবদ্বীপ শান্তিপুরের গোস্বামী মহাশয়দের খুব দর্শন পাওয়া যায়।

বাজারে মৎস্য মাংসের সম্পর্কও নাই, খাদ্য ভিখারীর উপযোগী, কিন্তু দুগ্ধ ঘৃত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; গোচারণও নবনীত অপহরণ ক্ষেত্রে দুগ্ধ ঘৃত পাওয়া যাইবারও কথা। এখনও বৃন্দাবন গোপিনীর দেশ নয়। প্রতি বৎসর অনেক নূতন নূতন "আইন কানুন" প্রচার করিয়া "কানাই বলাই" একত্র "কাউন্সিলের" শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন।

এখানকার মনোহারীর দোকানে কেবল তুলসির মালা, তিলক "রজ" (বৃন্দাবনের ধূলা) ও নামাবলীই পাওয়া যায় এবং তাহাই লোকে ভক্তি ভরে ক্রয় করে। বৃন্দাবন নাথের রাজ্যে সৌখীন বিলা-সের উপকরণ কিছু দেখিতে পাই-লাম না।

এই সকল পবিত্র তীর্থ স্থানে অসংখ্য পতিত পাতকী আসিয়া বাস করিতেছে। তীর্থের পবিত্রতা তাহাদিগের সহবাসে যেন কমিয়া যায়। অধঃপতিত জাতিকে পরিত্রাণ করিতে মহাত্মা চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু সময়ে তাহাতে অশেষ অমঙ্গল আনিয়াছে। পুণ্যস্থানে মুক্তি লাভের ছলনায় কত প্রকার ঘৃণিত কার্য্যে যে তাহারা জীবন কলঙ্কিত ও কলুষিত করিতেছে, তাহা ভাবিলে হৃদয় ব্যথিত হইয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর এই সকল তীর্থস্থানে আবার সহসা বুদ্ধ বা চৈতন্যের আবির্ভাব না হইলে, আর এ পাপ-স্রোত নিবারিত হইবার আশা নাই। সাধু জন সংস্কার-বহ্নি জ্বালাইয়া যদি ইহার অণু-পরমাণু একেবারে ভস্মীভূত করিয়া আবার

নূতন উপকরণে ইহা প্রস্তুত করেন, তবেই নিস্তার, নতুবা আর এ জীবের মুক্তি সম্ভবে না। ঈশ্বর জানেন, এই সকল জীবনের পরিণাম কি?

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে লালাবাবুর ব্রহ্মচারী (একজন ধনবান উচ্চবংশজাত ব্রাহ্মণ, উপাধি ব্রহ্মচারী) এবং টিকারীর মহারাণীর সুন্দর দেবমন্দির দর্শন করিয়া আমরা শেষে শেঠের মন্দিরে গেলাম। লালাবাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি বৃন্দাবনের চারিদিকে শোভা করিয়া আছে। তাঁহার "সদাব্রতে" প্রত্যহ দুই বেলা অসংখ্য দীন দরিদ্র অন্ন পানে প্রতি-পালিত হইতেছে। সামান্য এক মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া কর্কশবাক্যে কেহ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারে না। এখানে অনেক ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী উচ্চ বেতনে নিযুক্ত আছেন, এবং তাঁহারা সুনিয়মে "সদাব্রতের" কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বিবাহ কিম্বা উপনয়নের সময় ধনীর গৃহে যেরূপ ভোজের আয়োজন হয়, তেমনি প্রতিদিন পুণ্যাত্মা লালাবাবুর সদাব্রতে আহার প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে যাহা খাইতে অভিলাষ করে, তাহাকে তাই পরি-তোষ পূর্ব্বক দেওয়া নিয়ম। তাঁহার ঠাকুর-বাড়ীর সমুদয় স্থান বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সদাব্রত, অসংখ্য ভিখারীর বাসেও কিছুমাত্র মলিন নহে।

যে লালাবাবুর এই অতুল বৈভবময় পুণ্য-কীর্ত্তি বৃন্দাবন জীবিত রাখিয়াছে,—লোক মুখে শুনিলাম, সেই পুণ্যাত্মা প্রত্যহ বৃন্দা-বনের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মরক্ষার্থ রুটি ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেন নাকি। এখানকার প্রায় সমুদায় দেবমন্দিরই দেখিতে অতীব মনোরমা। আর ধনীগণ তাঁহাদিগের ধনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে যেন যত্নসঞ্চিত স্বর্ণ দ্বারা আপনাদিগের দেবমন্দির-চূড়া নির্ম্মাণ করাইয়া ধার্ম্মিকজীবনের সুখানুভব করিয়াছেন। স্বর্ণ যেমন পবিত্র ও সুনির্ম্মল, তাহার স্থান দেবতার গৃহ চুড়াই যোগ্য। নরদেহ তাহার উপযুক্ত স্থান নহে। ফুল সম্বন্ধে ধার্ম্মিককবি বলিয়াছেন,

"এমন পবিত্র, এমন নির্ম্মল
দেবপদ ভিন্ন কোথা শোভে বল?"

সুবর্ণ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে,—

"এমন নির্ম্মল" এমন উজ্জ্বল,
দেবচূড়া ভিন্ন কোথা শোভে বল?

টিকারীর মহারাণীর মন্দির-চূড়া কনক গঠিত হইলেও শেঠের মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার প্রায় অর্দ্ধেক স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং উজ্জ্বল প্রভাকর কিরণ যখন তাহার উপর পূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হয়, তখন সে হাস্যময় উচ্চ দীপ্তির দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না। সে সৌন্দর্য্য আপনার গৌরবে আপনি মুগ্ধ। পৃথিবীর মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শৈশবে যখন পিসীমার মুখে "রামায়ণ মহাভারতের" পুণ্যময় অপূর্ব্ব কাহিনী শুনি-বার জন্য সন্ধ্যা হইতে কত রাত্রি চেষ্টা করিয়া জাগিয়া থাকিতাম, তখন বৃন্দাবনের এই "সোণার তালগাছের" কথা কতবার শুনিয়াছি। তাঁহার অমৃতপূর্ণ স্নেহের সহিত মিশ্রিত হইয়া তখন সে "সোণার তালগাছ" শ্রবণে যেমন মধুর লাগিয়াছিল, আজ তাহা শেঠের দেবালয় প্রাঙ্গণে চক্ষের সম্মুখে শরীরী রূপে বিদ্যমান দেখিয়াও আর তেমন মোহিত হইলাম না। স্মৃতি সুখকর কালের সে সুধাকাহিনী এখন কেবল অস্ফুট স্বপ্ন-সম বোধ হয়।

শেঠের প্রকাণ্ড ঠাকুর বাটীর পশ্চাতে একটী সুদীর্ঘ সুন্দর দীর্ঘিকা আছে। তাহার ঘন কৃষ্ণ বারিরাশি নিদাঘের মেঘমালা সদৃশ শোভাময়। সেই সলিল-হৃদয় মথিত করিয়া কত রাজহংস হংসী ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে; যেন মানস-সরোবরে বিকশিত শ্বেত শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহা একবার দেখিয়া সাধ পূর্ণ হয় না, যতবারই দেখিবে, ততবারই অতৃপ্ত নয়ন ফিরাইতে পারিবে না। কেমন সে মাধুরী, এখনও আমার মানসনেত্রে দীপ্তি পাইতেছে।

দর্শক কিম্বা যাত্রীগণের আমোদার্থে এক খানি ক্ষুদ্র বোটও সেখানে যত্নপূর্ব্বক রাখা হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে সায়াহ্নে তাহাতে আরোহণ করিয়া "জলখেলা" করা যায়। কর্ণধারহীন সে "সাধের তরণী তরঙ্গে" পড়িবার ভয় নাই। বসন্তের শরৎহিল্লোলে সে তরী আপনি ভাসিয়া যায়, "কূল ভাঙ্গিয়া" গেলেও "আতঙ্কে মরিতে" হয় না।

"মোচার খোলার মত ছোট নৌকা খানি, চলে যেন নাচিয়া নাচিয়া।" "গগনের ঘন গরজনে" কিম্বা "খর সমীরণে" অদ্যাপি কোন বিপদ সে দীর্ঘিকা সাগরে ঘটে নাই।

শেঠজীর দেবনিকেতনের ভিতরও প্রত্যহ সকাল বিকালে কাছারী হয়। এখানেও অনেক ভৃত্য এবং পরিচারক ব্রাহ্মণ আছে। শুনিলাম, এখানকার নায়েবও একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং অতিথি অভ্যাগতের সমুচিত আদর ও যত্ন করেন।

বৃন্দাবনের কোন বিগ্রহ দর্শনেই কিছু দিতে হয় না। বিগ্রহস্বামীগণ এই সকল দেব দেবীর জন্য অকাতরে প্রচুর অর্থদান করিয়া এবং জমীদারী লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। দাতাদিগের বংশধরগণ ইচ্ছা করিলেও সেই সব "দেবোত্তর" এবং "ব্রহ্মোত্তর" কাড়িয়া লইতে পারেন না। নিয়ম বড় কড়াক্কড় নাকি।

অন্যান্য মন্দিরের বিষয় বলিতে বলিতে "সাহাজীর" চিত্রময় সুন্দর মন্দিরের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই মন্দিরের বাহিরে এবং ভিতরে নব নব প্রকার খোদিত ও চিত্রিত মূর্ত্তি আছে। তাহা সুনিপুণ ভাস্কর কিম্বা দক্ষ চিত্রকর হস্তজাত না হইলেও দেখিতে প্রীতিকর। কেমন একটু নবীভূত কল্পনা তাহাতে রহিয়াছে, দর্শক নয়ন রঞ্জন প্রতিমূর্ত্তি গুলিতে ভারতীয় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার একটী চিত্র আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল; তাহা এইঃ—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহ রথারোহণে শূন্যমার্গে উঠিতেছেন, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, সুশীলা সুভদ্রা সখীগণ সহকারে সরোবর হইতে স্নাত বসনে গৃহে আসিতেছেন, স্নান স্নানে বদন মণ্ডল লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়াছে, এমন সময় পথে অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কিন্তু কথা বার্ত্তা হইতে সুবিধা হইল না, স্বয়ং ভগবান রথোপরি আরূঢ়। দেখিতে দেখিতে রথ বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল, অর্জ্জুন মুখ ফিরাইয়া নিম্নদৃষ্টে রহিলেন, রথ অদৃশ্য হইয়া গেল। লজ্জাশীলা সুভদ্রা দৃষ্টির সীমায় প্রিয়তমকে আর দেখিতে না পাইয়া পদতলে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া রাজপথেই দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চতুরা সহচরীগণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া পরস্পরে ডাকাডাকি ও হাসাহাসি

করিতে লাগিল। দেবী স্বভদ্রা তাহাদিগের পরিহাসে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিতে করিতে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

"সাহাজী" পরমভক্ত। প্রতিদিন শত ব্রাহ্মণের পদধূলি তাঁহার মস্তকে পড়িলে তিনি পরলোকে পরিত্রাণ ও মুক্তিলাভ করিবেন আশায় নিজের এবং পত্নীর কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি দেবালয়ের বারাণ্ডায় খোদিত করাইয়াছিলেন। সোপান হইতে বারাণ্ডায় উঠিতেই সেই যুগল মূর্ত্তিশিরে পদস্পর্শ হয়। তাঁহাদিগের মস্তক অতিক্রম করিয়া কোন প্রকারেই যাওয়া যায় না, এমনি ভাবে তাহা খোদিত।

হায়! অদ্য এই পূজা পাইবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ কে? ভারতের অতীত যুগের গৌরবময় কীর্ত্তির সহিত সেই অরাধ্য ব্রাহ্মণবংশ লোপ পাইয়াছে। এখন কেবল ভাগীরথীর দুই কূলে জীবিত শব মাত্র বিদ্যমান। জীবনের চিহ্নহীন উচ্ছন্ন ব্রাহ্মণবংশের হীনতা দর্শন করিয়াই ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র বিষাদে গাইয়াছিলেন,—

"কি হবে রোদন করিলে এখন!
স্বাধীনতা ধন গিয়াছে যখন,
চোরে শিরোমণি করেছে হরণ
তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে।"

আমিও কবির বিলাপের সঙ্গে একতানে বলি;—

"নাহি কি সলিল হে যমুনে, গঙ্গে,
তোদের শরীরে উথলিয়া রঙ্গে
কর অপসৃত এ কলঙ্ক রাশি
তরঙ্গে, তরঙ্গে, আস, বঙ্গ নাশি
এ ব্রাহ্মণ বংশ ডুবাও জলে।"

আগ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্র শ্রীরামভক্ত মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ বানর কুলের দর্শন পাওয়া যায়। ইহারা পালে পালে গৃহদ্বারে—সুবিধা হইলে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া কতরূপে আপ্যায়িত করে। কখন ছাতা, কখন জুতো, কখন বা ঘটী বাটী আত্মসাৎ করিয়া গৃহস্থের সহিত বন্ধুতা করিতে চায়। এই অযাচিত বন্ধুগণ গৃহস্থদিগের জোর জবরদস্তিতে বশীভূত হইবার পাত্র নহে। এই "হাউস্ ট্রেস্ পাসে" ভারতীয় পিনালকোডের ৪৪৮ ধারা প্রয়োগ করিয়া কোন "সেণ্ট্রাল জেলে" ইহাদিগকে রাখিয়া দিলে ইহারা সংশোধিত হয় কি না বলা যায় না। মথুরা বৃন্দাবনে ডার্বিনের (Mr. Darwin) শুভাগমন হইলে মনুষ্য যে বানর বংশ সম্ভূত, একথা তিনি অনায়াসেই সআইন ভাবে প্রমাণ করিয়া যাইতে পারিতেন। শুনিয়াছি, পণ্ডিতবরের আদি পিতামহের সহিত আকৃতিগত নিকটতর সাদৃশ্য ছিল। বৃন্দাবন মথুরার বানরগণের দৈনিক কার্য্য কলাপের বিষয় কোন পশুপ্রিয় দার্শনিক যদি এক খানি ইতিহাস লেখেন, তাহা হইলে এই "পুরুষ প্রধান" দিগের রহস্যময় চতুর বিজ্ঞতার বিবরণ সাধারণে কতক জানিতে পারে, নতুবা পশুত্ব ভাবুকতাহীন লেখকদিগের দ্বারা এ জাতির বুদ্ধির উদ্ধার সম্ভবে না।

বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইবার পথে অসংখ্য ভিখারী দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, এবং তাহাদিগকে কিছু না দিয়া এক পদ অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা আবার নাচিয়া নাচিয়া ভিক্ষার্থে এই সকল গান করে;—

"ধূলা নয়, ধূলা নয়, গোপীর পদরেণু,
এই ধূলা মেখেছিল নন্দের বেটা কানু।"

"মধুর মধুর বংশী বাজে এই বৃন্দাবন,
শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন।"

এ গীত শিশুকণ্ঠে সুললিত-শ্রুতিসুখকর বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পয়সায় না কুলাইলে গীতের পরিবর্ত্তে "লালাবাবুর সদাব্রতে" গিয়া দিনপাত কর। এবম্বিধ প্রিয় আশীর্ব্বাদে (?) পরিতৃপ্ত হইতে হয়, তীর্থ স্থানের এই সকল "জাত ভিখারী" অতিশয় বিরক্তজনক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিয়া রাজপথের সম্মুখে দেবালয়ে যাইবার বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাদিগকে দেখিয়া দয়া অনুকম্পায় পরিণত হয়। সরকার বাহাদুর অহিতকর কুলিআইন ইত্যাদি লইয়া চাকরদিগের সন্তোষার্থে মস্তিষ্ক বেশি মাত্রার ব্যয় না করিয়া যদি এই সকল অকর্ম্মণ্য জাতির নিমিত্ত কোন কার্য্যালয় বা কারখানা,—বিলাতের গরিবের জন্য যেরূপ আছে, খুলিয়া দেন এবং আইন দ্বারা রাজপথে ভিক্ষা নিষেধিত হইয়া যায়, তাহাতে কত স্থায়ী উপকার হয়।

বেলা যখন দুই প্রহর, তখন দেবভোগের শাঁক ঘণ্টা কাঁসর নাদে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ও আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ ভিখারীদল, কলরবে লালাবাবুর "সদাব্রতে" ও অন্নাত্র ধাবিত হইল। আমরা সেই জনস্রোতভেদ করিয়া শূন্য বাসায় আসিলাম।

দিবা নিদ্রার ক্লান্তি দূর করিয়া সায়াহ্নে আবার আমরা বৃন্দাবন ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। পথেই "বংশী বট"নামক জীর্ণ শীর্ণ একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ। গোপীনাথ ইহাতে নাকি বাঁশী রাখিতেন, তাহা "গোপেশ্বর" শিব। প্রবাদ এই, বৃন্দাবন গোপিনীগণ সহ নটবর মাধব একদা নৃত্য গীতে মত্ত, এমন সময় মহাদেব সেই নৃত্য গীতে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গ হইতে নারী রূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন এবং সেই বিলাস বলে (Ball) যোগ দেন। কাশীশ্বর নৃত্য গীতে সুনিপুণ, তাঁহার সেই অপার্থিব নাচনে সব সখীগণ চমৎকৃত হইয়া মুখ চাহিতে লাগিল, তখন ভাবে ভোলা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে রমণীগণের সহিত যে নৃত্য করিয়াছিলেন, সে জন্য লজ্জানুভব করেন, কিন্তু উদারহৃদয় গোপিনীমোহন তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া পার্ব্বতী নায়ককে গোপেশ্বর নাম দিয়া বৃন্দাবন-ধামে বাস করিতে অনুমতি দেন। এখানে সবই রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রহিয়াছে, কেবল এই "গোপেশ্বর মহাদেও" সেই একচেটিয়া রাজত্বে অত্যেকত্ব দূর করিয়াছেন। "ব্রহ্মকুণ্ড ও কালিয়াদহ" প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরিশেষে আগ্রহ সহকারে "নিধুবন" নিকুঞ্জ বনাভিমুখে চলিলাম। "বসন্তের নিত্যবাস, সঙ্গীতের চিরোচ্ছ্বাস" সুখের পূর্ণ নিকেতন এই বন, বনভূমি নহে। নন্দন পারিজাত পরিমলময় কুসুমকুল প্রস্ফুটিত, লতা পত্রে পরিশোভিত এই কুঞ্জবন অমর বাঞ্ছিত দিব্যধাম। কত ফলপ্রদ বৃক্ষাবলী সাদরে সলজ্জ লতিকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া মুগ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই সকল তরুর শ্যামলপত্র মাঝে কলকণ্ঠ পিককুল কূজনে অদৃশ্যে সঙ্গীত-তরঙ্গ বিস্তার করিয়া মোহে আচ্ছন্ন করিতেছে। তাহারা এ সংসারের জীব নহে। শাপচ্যুত দেবশিশু মনুষ্য মনের সন্তাপ অপহরণ করিতে যেন ঐ সব পল্লবিত তরুশিরে ভর করিয়াছে। শোক জ্বালায় দুঃখী মানব যখন সেখানে যাইবে,তখন এই সুরশিশুগণ

স্বর্গের পবিত্র সমাচার সঙ্গীতে শুনাইয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে। উভয় কুঞ্জ ভিতরেই প্রস্তর গ্রথিত সিংহাসন রহিয়াছে। প্রতি নিশায় পুষ্পমালায় ও দীপাধারে ভক্ত-বৃন্দ তাহা সজ্জিত করিয়া রাধাকৃষ্ণের অদ্যাপি নিশীথ সমাগমের পরিচয় দেয়। "নিধুবন" ও নিকুঞ্জবন উভয়ের মধ্যেই কুণ্ড আছে। বনবিহারে একদা মাধব বিনোদিনী ক্লান্তভাবে প্রিয়তমের নিকট শীতল পানীয় চাহিয়াছিলেন। সেই অসময়ে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কোন উপায় না দেখিয়া মদনমোহন ললিতা ও বিশাখার করস্থিত বংশী দ্বারা কুণ্ড খনন করিয়া প্রণয়িনীর পিপাসা দূর করিয়াছিলেন। তাই এই বিহারভূমে "ললিতা" ও "নিধুবনে" বিশাখা কুণ্ড বিদ্যমান। দুই কুণ্ডই পাষাণ সোপান যুক্ত ও নীল সলিলে শোভা পূর্ণ।

কুঞ্জবনের প্রবেশ দ্বারে কপিকুল প্রহরী স্বরূপ বসিয়া থাকে, আহারীয় মিষ্টান্ন দক্ষিণা না দিলে তাহারা কখনও দ্বার ছাড়িয়া দেয় না। খাদ্য দ্রব্য দিবামাত্র কেমন আদরে কৃতজ্ঞতা জানাইতে দূরে দূরে সরিয়া যায়, কাহাকেও কিছু বলে না। দুইবনের দুই দল ও দলপতি আছে। কোন্‌টা কনষার্ভেটিব (Conservative) কোন্‌টা লিবারেল (Liberal) তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মাঝে মাঝে লোকে পরিহাসচ্ছলে তাহাদিগের "লড়াই" বাধাইয়া দেয় এবং যে দল জয়লাভ করে, তাহার বানরদিগকে দলপতিসহ ভোজন করায়।

আরতি না দেখিয়াই সন্ধ্যার ললিত মধুর সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে "সন্ন্যাসীর আখড়া" হইয়া আমরা সে দিনকার মত, কেন, যেন চিরদিনের তরে পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দাবনের নিকট বিষাদে সজল নেত্রে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীর"-বাহিত, চির হাস্যময়ী প্রকৃতি রাজ্ঞীর নিবাস ছাড়িয়া আবার সংসারে আসিতে হৃদয়ের পরতে পরতে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। বসন্তেই বর্ষা আসিল—এখন ভিক্ষা কেবল প্রভু তোমার পদতলে চিরনিদ্রা———

গৃহহীন পান্থ শালে
কাটে দিন গোলমালে
বিভবের শূন্য গরিমায়,
অশ্রুভরা হাসি মুখে
যন্ত্রণা অনল বুকে
ক্লান্ত নিতি মুক্তি ভাবনায়।

শ্রীমতী নীহারিকা দেবী।

সুখ।

যখন জানিতাম না আমি সুখী কি দুঃখী, তখন আমি সুখী ছিলাম। যখন জানিলাম আমি সুখী, তখনই বুঝিলাম আমি দুঃখী।

সুখ অজ্ঞ, দুঃখ জ্ঞানী। জ্ঞানের উৎপত্তি দুঃখে, দর্শন বা বিজ্ঞান বিষাদের ইতিবৃত্ত।

যখন সুস্থ ছিলাম, তখন জানিতাম না

স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য কাহাকে বলে। তখন হাত পা শরীর ছিল কি না, জানিতাম না। ইচ্ছা হইত, লাফাইতাম, ছুটিতাম, হাতের সঙ্গে পায়ের সঙ্গে তখন পরামর্শের আবশ্যক হয় নাই।

সত্যযুগে জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন উপনিষদ ছিল না। কারণ তাহারা তখন সুখী। তাহারা শরীর চিরিয়া হাড় গণিবার আবশ্যকতা বুঝে নাই। যে যত দুঃখী, সে তত জ্ঞানী। পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিত শরীরের ভূগোল রচনা করেন, পূর্ব্ব দেশীয় পণ্ডিত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনের ভূগোল রচনা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের দুঃখের পরাকাষ্ঠা। পশ্চিমেরা এখনও আমাদের অপেক্ষা সুখী, তাই আমাদের মত জ্ঞানী নহেন।

জ্ঞানে সুখ না অজ্ঞানে সুখ? যে সুখী সে কি জ্ঞানী? সে কি জানে যে সে সুখী?

এক দিন ছিল যখন দুজনে কত গল্প করিতাম, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গল্প করিতাম। যখন দুজনে কত খেলিতাম, কত বেড়াইতাম, চাঁদের আলোকে দুজনে দুজনাকে দেখিয়া হাসিতাম, চুলের রাশি ধরিয়া টানিতাম। তখন জানিতাম না যে, তোমাকে ভালবাসিতাম। কিন্তু তখনই তোমাকে প্রকৃত ভালবাসিতাম, তখনই কেবল মরিতে বলিলে মরিতে পারিতাম। কারণ তখন জানিতাম না যে, তোমাকে ভাল বাসিতাম। যে দিন জানিলাম, যে তোমাকে ভালবাসি, সে দিন অর্দ্ধেক ভালবাসা ফুরাইয়াছে। তাহার পর যে দিন তোমার কাছে সে কথা ফুটিলাম, সে দিন বার আনা শেষ হইয়াছে। তাই মুখে লালিমা, আধ আধ কথা, মাথা হেঁট, এই সকল পরের ঘরে ধার করিয়া সে বার আনা পূরাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও কিছু ছিল, যে দিন সাত গাঁয়ের লোক এক করিয়া সবার সাক্ষাতে বলিয়াছিলাম "তোমা বই আর জানি না" সে দিন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম, তখন ষোল কড়াই কাণা হইয়া গিয়াছিল। কেবল খাতিরে পড়িয়া সংসারের বন্ধুর ক্ষেত্রে গড়াগড়ি দিবার জন্য দুজনে ছড়া বাঁধিয়াছিলাম। কথাটা বড় কটু কিন্তু বড় সত্য। তবে ফুটিতে গেলেই কিছু পরিমাণে মিছা হইয়া যায়।

জ্ঞান অক্ষরে ফুটে, ভাব অক্ষরে ফুটে না। অক্ষরে যাহা ফুটে, সেটা পোষাক, শরীর নহে। ভাব ফুটে কিছু কিছু সুরে, সেও গোপনে। রবির ছায়ার চেয়ে কায়াটা অনেক ভাল। কবির বাক্য যাহা পড় সেটাত উদ্গার, যেটা পড়িতে পার না সেইটাই আসল কবিতা। সেটা কবির হৃদয়। গাছপালা বড় সুন্দর। লতা পাতা বড় সুন্দর, ফুল ফল বড় সুন্দর। নীলাকাশে শরৎশশী, নীল পত্রে শ্বেত কমল, নীলমণ্ডলে তারার মালা, বড় সুন্দর, বড় সুন্দর। কিন্তু তারাও কি কবির হৃদয়ের পরিচয় দিতে পারে? তিনি যাহা পারিলেন না, তুমি তাহা পারিবে?

এই জন্যই ত ভাবুকেরা পাগল হয়। মনের ব্যথা বলিতে পারিলে কম কষ্ট হয়, মনটা খালি হয়। কিন্তু যার ব্যথা, সে কি ফুটতে পারে? সোণারবেণে ব্যথার আধলাটা বাজারে ফেলে দিয়া বিনিময়ে প্রাণটা পূরা করিতে পারে। কিন্তু যার ব্যথা—ব্যথার মত ব্যথা, সে কি তা ফুটতে পারে? তার ব্যথাও পবিত্র

দেবতা, আঁধারের আধারে সে তা লুকিয়া রাখে। শেষে পাগল হয়। তা না হলে কি গৌরাঙ্গ সাগরজলে ঝাঁপ দিতেন। তা না হলে কি রাধিকার কোকিল-কূজনে মুরলী ভ্রম হইত? বাধিত যাহা ফুটে তাহা প্রলাপ, তাহা ঠিক হয় না। কাকে মারতে কাকে মেরে বসে।

দুঃখের ব্যথা যখন ফোটা যায় না, তখন সুখের কথা কি ফোটা যায়? হরি হরি! সুখের যে কথাই নাই। সুখের অনুভাবকতা নাই। সাদা আলো কি দেখা যায়? যখন রঙ্গিন চস্‌মা দিয়া দেখ, তখনই সে সাদার ভিতর কি আছে তা বুঝিতে পার। দুঃখের ভিতর সুখের অনুভূতি। সুখে সুখের অনুভূতি নাই। দুঃখের ভিতর যখন সুখের অনুভূতি হয়, তখন সুখ অতীত হইয়াছে। পরের মুখে শোনা কথার সাক্ষ্য, গজভুক্ত কপিত্থবৎ।

সুখের সময় সুখের প্রতীতি করিলে মানবজীবনের বিচিত্রতা থাকিত না। গোলাপ সুন্দর হইলেও তোড়ায় দুটা পাতার বেড় দিতে হয়। সুখের সময় সুখের প্রতীতি থাকিলে মানুষের ঝগড়া ঘুচিত না। স্তনের মধুরতা তখন বুঝিলে কি মায়ের স্তন ছাড়িয়া চুষী ধরিতাম? সে অভয়কোল ছাড়িয়া কে ধীরে ধীরে পায় পায় উঠানে নামিত?

আর তুমি? সে সময় যদি জানিতাম তোমাকে ভালবাসি, তাহলে কি আজ এ অন্তর্জ্বালায় দিবানিশি, নিশি দিবা জ্বলিতে হইত? তাহলে কি যে কিছু গান গাই, তাহাতেই সেই এক সুর দেখা যাইত?

আসল যার মেলে না, তার ঝুটা বড় সস্তা। টাকায় এক সের হীরা ও এক হাজার মুক্তা বালাখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। ভাবের ভণ্ডামী ষোল আনা। ভাবুক কয়টা মিলে? ভাষ ফুটে না, কিন্তু ফুটন্তভাব—নামের ছাপ ও প্রিয়তম, বাঁকা দৃষ্টি ও নখ খোটা. কুণ ও পরচুল দোকান ভরা। রাধিকা একটী। যাকে দেখিলে শত পদ্ম ফুটে, তার মত দুর্ভাগ্য কে? আর তার মত দুঃখী কে যে আপনাকে সুখী বলিয়া পরিচয় দেয়? সুখ বোঝা যায় না, দুঃখই বোঝা যায়, যে আপনাকে সুখী বলিয়া বুঝে সে বুঝিল কি? অথচ কাঁদে লক্ষে একটী; হাসে লক্ষ জন। হাসি না কি ঝুটা, তাই এত সস্তা। এক দিন একটী বালকের দুইটী চিত্র দেখিয়াছিলাম, একটী হাসিতেছে আর একটী কাঁদিতেছে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন্‌টী সুন্দর? তুমি বলিয়াছিলে, যেটী কাঁদিতেছে।

সে হা করিয়া কান্না নহে, চীৎকার করিয়া কান্না নহে। যে রোদনে অঙ্গভঙ্গী গলাবাজী আছে, সে ঝুটা রোদন। তাতে গভীরতা নাই, পবিত্রতা নাই, মোহিনী শক্তি নাই। তা বুকে পূরিয়া রাখিবার জিনিষ নহে, রাস্তায় ফেলিয়া দেখিবার জিনিস। আর এক দিন আর একটী শিশুর দুটী চিত্র দেখিয়াছিলাম। একটী জাগ্রত আর একটী সুষুপ্ত। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন্‌টী সুন্দর? তুমি বলিয়াছিলে, সুষুপ্তটী সুষুপ্তি বিবাদের পরিণতি, হাসি জাগ্রত বৃক্ষের ফুল। গভীরতা পবিত্রতা সম্মোহকতার ছবি সুষুপ্তি। হাসি ও জাগরণ বিকার বিপ্লব ও প্রলাপ। প্রাণের আকুঞ্চন, জীবনের তুফান, সংসারের ঝটিকা। জ্ঞানী জাগ্রত, সুখী সুষুপ্ত। জ্ঞানীর শয্যা কণ্টকিত,

তাই সে জাগ্রত। যখন বুকের উপর মাথাটী গিয়া পড়িয়া থাকিতাম, তখন চক্ষু চাহিত না, কে যেন নিমীলিত করিয়া দিত। সে নিদ্রায় স্বপ্ন ছিল না, জানিতাম না জাগিয়া থাকিতাম কি ঘুমাইতাম। নতুবা বলিতে পারিতাম, কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছিল!

এখন বয়স হইয়াছে, প্রবীণ হইয়াছি, তাই নিদ্রা পলায়ন করিয়াছে। দিবসে ও রাত্রিতে কত মুহূর্ত্ত, সব গণিয়া বলিতে পারি। এখন জ্যোতিষী হইবার সুবিধা হইয়াছে। দুঃখী ব্যক্তি এত জাগিয়া থাকে বলিয়া তাহার বিজ্ঞান চর্চ্চার সুবিধা হয়। ছিলাম কবি, হইতেছি বৈজ্ঞানিক। যখন কবি ছিলাম তখন জানিতাম না, এখন জানিয়াছি। এখন বৈজ্ঞানিক হইতেছি, তাহা এখনই বুঝিতে পারি। সুখে সুখের প্রতীতি হয় না, কিন্তু দুঃখে দুঃখের প্রতীতি হয়।

নতুবা দুঃখমোচনে লোকের উদ্যম জন্মিবে কেন? রোগের সময় রোগী যদি রোগ না বুঝিত, তবে রোগের প্রতিকার হইত না, রোগের প্রাণান্ত ঘটিত। ভাবুকের উন্মত্ততা ও রোগীর রোগ প্রতিকার চেষ্টা উভয়েই সজীবতা আছে, কিন্তু একটীতে জ্ঞান নাই, আর একটীতে জ্ঞান আছে। একটী সুখ, অন্যটী দুঃখ! একটীতে উপভোগ, অন্যটীতে প্রতিকার। যে কারণে সুখের সময় সুখের প্রতীতি জন্মে না, ঠিক্ সেই কারণেই দুঃখের সময় দুঃখের প্রতীতি জন্মে।

বিজ্ঞান ও দর্শন চিকিৎসা শাস্ত্র, মানব জীবনের ব্যাধি পরিহারের সন্ধান। কোনটী পূর্ণ নহে, কোনটীতে আশা পূর্ণ হয় না। জ্ঞানের সূত্র দুঃখে; জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণতি দুঃখে। সুখের বিজ্ঞান নাই। যাহার প্রতীতি নাই, তার পরীক্ষা, পরিদর্শন, ব্যবচ্ছেদ ও ব্যবস্থা নাই, তার আবার বিজ্ঞান কি করিয়া হইবে?

সুখের যখন প্রতীতি নাই, বিজ্ঞান নাই, পরের মুখে সুখের শোনা কথার যখন সাক্ষ্য লইতে হয়, তখন সুখ আছে; বা ছিল, বা হইবে, তাহার প্রমাণ কি?

প্রমাণ কিছুই নাই। আজীবন যে অন্ধকারে সূর্য্যের আলোক আছে, তার প্রমাণ কি? যখন সকলেই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত, তখন সুস্থ লোক আছে, তাহার প্রমাণ কি? যখন সকলেই অন্ধ, তখন চক্ষুষ্মান লোক আছে, তাহার প্রমাণ কি? বস্তুতঃ কোনই প্রমাণ নাই। যা কিছু আছে, তোমার এই প্রতারণা পূর্ণ হাস্যে, তোমার এই গভীর নিরাশার কঠোরতম প্রশ্নে। সুখ পাইয়াছি এক দিন ইহা জানি, আর প্রমাণ নাই, সুখী হইব আর এক দিন ইহা বিশ্বাস করি, আর কোন প্রমাণ নাই। "We may be happy yet" প্রাণের উপর এ কথাটী লেখা আছে।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী।

পরিণয়োপহার।

(কোন বন্ধুর বিবাহে প্রদত্ত।)

১

যে পবিত্র প্রেম পুষ্প পরিণয়-হার,
আজি পরিয়াছ গলে, দুই জনে কুতূহলে,
মানব জন্মের ইহা পুণ্য পুরস্কার!
জগতে ইহার কাছে, আর কি অমৃত আছে?
এ সুধা পায়নি দেব মথি পারাবার,
ওঠেনি সাগর জলে, এ কৌস্তভ কোন কালে,
হেন পরিমলময় পারিজাত হার,
পরিলে অমর আজি যে মণি-মন্দার!

২

অমৃত ঔষধ হেন জীবনের আর,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে, নাহি কিছু কোন স্থানে,
বিশল্যকরণী হেন জ্বালা যন্ত্রণার!
রোগ শোক দুঃখ ভরা, এত যে বিষাক্ত ধরা
ইহার (ই) পরশে বাঁচে সৃষ্টি বিধাতার!
যে প্রাণে এ পুণ্য স্রোত, হয় নাই প্রবাহিত
পবিত্র করেনি প্রাণ প্রণয়ে যাহার,
সে ত সাহারার মত, হা হা করে অবিরত,
এ জীবনে সে পিপাসা নহে পূরিবার,
ঢাল যদি স্বর্গ মর্ত্ত্য পরাণে তাহার!

৩

সে জীবন শূন্যময়—শূন্য সে হৃদয়,
উদ্যম উৎসাহ হীন, আশাশূন্য চিরদিন
অন্তরে অনল জ্বলে সকল সময়,
তার নয়নের কাছে, সংসার পুড়িয়া আছে,
ছাই হ'য়ে—ভস্ম হ'য়ে গেছে সমুদয়!
সে জানেনা সুখ শান্তি, সে বোঝে নকলি ভ্রান্তি,
সে জানেনা দয়া মায়া স্নেহ কারে কয়!
জগতের নারী নর, সে ভাবে সকলি পর,
তাহার কেহই নয় সেও কারো নয়!
সে যেন আকাশ ছাড়া, জলন্ত একটী তারা,
পরের অশুভ করে, নিজে ভস্ম হয়!

৪

অপ্রেম এমনি সখা মহা অকল্যাণ,
প্রেম মঙ্গলের মূল, উন্নতি—উত্থান!
প্রেম করে পরিপূর্ণ অপূর্ণ জীবন,
জগতের নরনারী, যমুনা জাহ্নবী বারি,
মিলাইয়া করে এক মহা প্রস্রবণ!
উদ্যম উৎসাহ আশা, দয়া মায়া ভালবাসা
বহে শত মুখে, গঙ্গা সাগরে যেমন!
হাসে তার তীরদেশে, সংসার সুন্দর বেশে
বিনোদ বসন্তে যথা বন উপবন!

৫

প্রেম নহে ভোগ বাঞ্ছা—বাসনা বিলাস,
প্রেমের প্রতিমা নারী, শত স্বর্গ পায় তারি,
পবিত্র হৃদয়ে ধর্ম্ম—সদা করে বাস!
সংসার করিয়া শূন্য, তারি কাছে যত পুণ্য
প্রীতির পবিত্র তীর্থ পাপ করে নাশ!
কোমল পবিত্র দৃষ্টি, প্রাণে করে সুধা বৃষ্টি
জাগায় হৃদয়ে সত্য আশা অভিলাষ,
প্রেম নহে ভোগ বাঞ্ছা বাসনা বিলাস!

৬

ধর্ম্মের সহায় নারী তপস্যার প্রাণ,
সিদ্ধির সাধনা নারী, যাগ যজ্ঞ সব তারি,
তাহার সাহায্য বিনা মিলেনা নির্ব্বাণ!
হইয়ে সংসার ত্যাগী, তাই সে সতীর লাগি,—
তাই সে নারীর প্রেমে উন্মাদ ঈশান!
ধর্ম্মের সহায় নারী তপস্যার প্রাণ!

৭

জননী ভগিনী নারী, নারী সমুদয়,
বিপদে বন্ধুর মত, উপদেশ দেয় কত,
শীতল ছায়াটী যেন বুক ঢেকে রয়!
যেন সে পরের তরে, জন্মিয়াছে এ সংসারে,
আপনার প্রাণ তার আপনার নয়,
জননী ভগিনী নারী, নারী সমুদয়!

৮

আজ সে মহিমাময়ী রমণীর সনে,
মিলিত হইলে সখা পবিত্র বন্ধনে!
শিখিও তাহার রীতি, সেই প্রেম সেই প্রীতি,
সেই দৃঢ় ধর্ম্মভাব শিখিও জীবনে,
শিখিও সে সরলতা, শ্রদ্ধা ভক্তি পবিত্রতা,
শিখিও সে স্নেহ দয়া দীন হীন জনে!
শিখিও শিবের মত, পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত,
পবিত্র সতীর সেই পূত আচরণে!
এমন রমণী লয়ে, ভোগ অভিলাষী হ'য়ে,
ভু'লনা পরম ধর্ম্ম সদা রে'খ মনে,
ভু'লনা ভু'লনা দোহে, সংসারের মায়ামোহে,
থাকে যেন স্থিরমন বিভুর চরণে।
রাখুন মঙ্গলময় সুখে দুই জনে!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

খোকার মার প্রতি।

১

অধরের প্রান্তে হাসির আভাস,
নয়নের কোণে মধুর জ্যোতি,
হৃদয়ের মাঝে কুসুম-বিকাশ,
বদন-মণ্ডলে প্রীতির ভাতি,—

২

কি সাগর সেঁচি,—লভি কি রতন,
বল, ভাগ্যবতি, হরষ এত?
বিধি মিলাইলা কি অমূল্য ধন,
সফল করিয়া কঠোর ব্রত?

৩

বুঝেছি, বুঝেছি, পতি-সোহাগিনি,
আনন্দ-লহরী যাহার তরে;—
সাগরের প্রায় রত্ন-প্রসবিনী
হয়েছ করুণ দেবের বরে!

৪

সাগরের প্রায়?—অযথা তুলনা!
অতুলে তুলনা কভু কি সাজে?
সেঁচিলে জলধি মিলে কি বলনা,
যে ধন তোমার কোড়ের মাঝে?

৫

চাঁদের কিরণে কুসুম-সুষমা
জড়িত হইয়া মাধুরী ধরি,
বিকাশি রূপের মোহন গরিমা
ঘুমায় তোমার কোলেতে মরি!

৬

কি দেখিছ, অয়ি মুগধ-মানসে,
আঁখির ভিতরে ঢালিয়া প্রাণ?
সুতমুখ পানে চাহিয়া অবশে,
লভিছ হরষ হারায়ে জ্ঞান!

৭

ক্ষরিছে গলিত মমতা উরসে,
ঝরিছে নয়নে আনন্দ-ব্যথা,
নাচিছে হিল্লোল হৃদয়ে, সরসে
বসন্ত-পবন-পরশে যথা।

৮

অধীরে কভু বা অস্ফুট আদরে
মমতা-উচ্ছ্বাসে চুমিছ কত
ললাটে, কপোলে, চিবুকে, অধরে,
চাপিয়া বক্ষেতে প্রাণের স্তুত।

৯

পুলক-নিশ্চল-লোচনে আবার
কি দেখিছ, সতি, শিশুর পানে?
নিরখি সুন্দর বদন উহার
পতিমুখচ্ছবি পড়িল মনে?

১০

সেই বিস্তারিত নয়ন-যুগল;
সেই সুকুঞ্চিত চিকুর-ভার,
তেমতি উন্নত ললাট উজ্জ্বল,
তেমতি অধর পীযুষ-সার,

১১

তেমতি ভুরুর সুবঙ্কিম টান,
সেই অবয়ব, গঠন-প্রথা,—
শিশু পিতা হতে লভিয়াছে প্রাণ,
প্রদীপ হইতে প্রদীপ যথা *।

১২

তনয়ের পানে চাহিয়া, যুবতি,
দেখিছ স্বপনে পতির মুখ,
জাগায়ে মানসে সুখ-পূর্ব্বস্মৃতি,
মৃদুল স্পন্দনে কাঁপায়ে বুক!

১৩

স্মরিছ আবেগে সে দিনের কথা
যবে শুধাইলে আদরে ধরি
পতিকণ্ঠ ভুজে, অংসোপরি মাথা
রাখিয়া, নয়নে অমিয় ঝরি,—

১৪

"বল দেখি, নাথ, কি হবে আমার
তনয় অথবা তনয়া, শুনি?"
"তনয়া, প্রেয়সি!" পতির উত্তর;
"তনয়, নিশ্চয়, বলিনু শুনি!"

১৫

হয়েছিল পণ সুস্থির সে দিন,
গণনায় শেষে হারিবে যেই,
বিজয়ীর পাশে স্বীকারিবে ঋণ,—
যাহা যত ইচ্ছা চাহিবে সেই।

১৬

পুত্র কোলে করি তাই, গরবিণি,
ভাবিতেছ বুঝি গভীর মনে,
পতি পরাজিত, তব কাছে ঋণী,—
আদায় করিবে পণ কেমনে।

১৭

দেখনা চাহিয়া তুলিয়ে বদন
খাতক দাঁড়ায়ে পালঙ্ক-ধারে,—
দেখিতেছিলে যা জাগ্রতে স্বপন
যে আনন এবে তোমা নেহারে?

১৮

চকিতে মিশিল নয়নে নয়ন,
চকিতে ফুটিল মোহন হাসি,
চকিতে ফুটিল মধুর বচন,—
"উষাদেবী কোলে কিরণ-রাশি।"

১৯

"কথাতে কি, নাথ, শোধা যায় পণ?
সেই দিবসের ভুলেছ কথা?"
"কি দিব, প্রেয়সি, কি আছে আপন,
ভিখারীরে ছলি দিওনা ব্যথা!

২০

"কি রেখেছ, প্রিয়ে, কি দিব তোমায়,
দিয়াছি পরাণ, দিয়াছি মন,
দিয়াছি দেহ যা ছিল সমুদায়,
দিয়াছি অমূল্য প্রণয় ধন!"

২১

"কারাগার তবে!" বলিয়া রমণী
পতি বামেতর বান্ধিল করে,
(বিদ্যুৎ-চমকে নাচিল ধমনী,)
চুমিল আদরে অধর-পরে।

২২

"দেখ, নাথ, দেখ, সুন্দর কেমন
খোকাটি আমার কোলেতে শুয়ে!"—
নিশ্বাসে নিশ্বাসে মিশায়ে দুজন
চুমিল উভয়ে শিশুরে নুয়ে।

শ্রীবরদা চরণ মিত্র।

* "প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ"—ইতি রঘুবংশম্।

বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা।

(নবম প্রস্তাব।)

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার—একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইঁহার পিতা শ্রীনাথ আচার্য্য-চূড়ামণি দায়ভাগের একখানি টীকা রচনা করেন বলিয়া ন্যায়ালঙ্কার স্বপ্রণীত দায়ভাগটীকায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার জীমূতবাহন প্রণীত বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র-প্রচলিত সুপ্রসিদ্ধ দায়ভাগের দায়ভাগটীকা ও দায়ভাগ-সিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা নামে দুই খানি টীকা রচনা করেন।

আলোচ্য তাতনির্ম্মিতনিবন্ধমারাধ্যবিশ্বেশ্বরং।
আচার্য্যাচার্য্যস্তনুতে বিবৃতিমিমাং দায়ভাগস্য।

রাজসাহী জেলার বরিয়া গ্রামবাসী মধুসূদন শিরোমণির নিকট যে দায়ভাগ-কুমুদচন্দ্রিকা আছে, তাহা ১৬২৮ শকে লিখিত হয়। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের বিদ্বন্মোদিনী নাম্নী টীকা এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের শকুন্তলাবিবৃতিও বোধ হয় এই রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার বিরচিত।*

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর তান্ত্রিক দীক্ষাহোমাদি বিষয়ে তন্ত্রপ্রমোদন ও তাঁহার ষষ্ঠপুত্র রঘুমণি আগমসার নামে তন্ত্রসংগ্রহ রচনা করেন।

---

* রঘুবংশের আরও পাঁচখানি টীকা আছে। (১) গোপীনাথ আচার্য্য কবিরাজকৃত কবিকান্তা; (২) ভগীরথ পণ্ডিত আবসথ্যের জগচ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা, (৩) বৃহস্পতি মিশ্র রচিত রঘুবংশবিবেক, (৪) ভবদেব মিশ্র প্রণীত সুবোধিনী; (৫) কৃষ্ণপতির অন্বয়লাপিকা। গোপীনাথ বোধ হয় বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করেন।

কবিরাজ গোপীনাথ * * * রঘুবংশকাব্যস্য।
ব্যক্তিতরসতাশেষং কবিকান্তা রচ্যতে টীকা॥

শান্তিপুরের পণ্ডিত কালিদাস বিদ্যাবাগীশের নিকট ১৫৯৯ শকের ৩রা শ্রাবণ সোমবার কৃষ্ণশর্ম্মা কর্ত্তৃক লিখিত একখানি হস্তলিখিত পুস্তক আছে।

নব-নব-শর-চন্দ্রে টিপ্পনী বৈ রঘোস্ত
সমলিখদিতি শাকে সম্মিতে সৌম্যবারে।
শশধর পরিপূর্ণে শ্রাবণস্য তৃতীয়ে
মিহির—————কৃষ্ণশর্ম্মা॥

দ্বিতীয় টীকাকার ভগীরথের পিতার নাম শ্রীহর্ষদেব। ইনি বলভদ্র পণ্ডিতের বংশধর ও কূর্ম্মাঞ্চলের রাজা জগচ্চন্দ্রের কুলপুরোহিত ছিলেন। তদনুসারে টীকার জগচ্চন্দ্রিকা নামকরণ হয়। এই কূর্ম্মদেশ কি উড়িষ্যা না তৈলঙ্গ দেশ, বলিতে পারি না।

অপর তিন টীকাকার মিথিলাবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বৃহস্পতি মিশ্র গোবিন্দ মিশ্রের ঔরসে ও মথায়ী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রন্থকারের পত্নীর নাম নিবৃত্তি। তিনি গৌড়াধিপের সভাসদ ছিলেন।

বিদ্বৎসভাসু বিনয়ী প্রণয়ী গণেষু
গৌড়াধিপাহৃচিত প্রচুর প্রতিষ্ঠঃ॥

চতুর্থ টীকাকার ভবদেব মিশ্র গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন——

সর্ব্বাগম পরার্থজ্ঞঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
ভবদেব ব্যধাৎ রম্যাং রঘুবংশ সুবোধিনীং॥

পঞ্চম টীকাকার কৃষ্ণপতি মিথিলার সকরাঢ়ী বংশোদ্ভব ছিলেন।

সন্তীহ যদ্যপি বিশিষ্ট জনপ্রণীত-
টিকা রঘুপ্রভবকাব্যভবাস্তথাপি।
স্বস্বান্তমোদনকরান্বয়লাপিকেয়ং
স্বস্পাতি কৃষ্ণপতিনা কৃতিনা প্রচক্রে॥

রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম পূর্ব্ববঙ্গের অনেক তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান স্বর্ণগ্রামে (সোণার গাঁয়) ছিল। তিনি শ্যামার্চ্চন চন্দ্রিকা ও ক্রমচন্দ্রিকা নামে তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

গৌড়শ্রীরত্নগর্ভাখ্যসার্ব্বভৌম-বিপশ্চিতা।
বংশ্যানাং হিতমুদ্দিশ্য কৃতা শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা।

বেদবেদান্ত, আগম ও তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ পূর্ণানন্দ পরমহংস এক জন সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। প্রথিত আছে, তিনি তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ও অনুষ্ঠান বলে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তৎপ্রণীত ষট্‌চক্রভেদ, ককারাদিশব্দ-ক্রমে কালীকাদিসহস্রনামস্তুতিরত্ন, সপ্তা-ধারাত্মক শাক্তক্রমতন্ত্র, বামকেশ্বর তন্ত্র, শ্যামারহস্য, তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিনী, মুক্তিবিষয়ক তত্ত্বচিন্তামণি নামক বৈদান্তিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। পূর্ণানন্দ ব্রহ্মানন্দের শিষ্য ছিলেন। ১৪৯৯ শকে তত্ত্বচিন্তামণি রচিত হয়।

পূর্ণানন্দেন গিরিণা কৃতং শ্রীপতিবাসরে।
ইষে কালাঙ্কবেদেন্দু-শাকে মঙ্গলবাসরে॥

চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত বংসপুর গ্রাম নিবাসী রামবল্লভ শর্ম্মা পূর্ণানন্দ গিরি প্রণীত ষট্‌চক্রভেদের পূর্ণানন্দচক্রনিরূপণ, রামনাথ সিদ্ধান্ত ষট্‌চক্রদীপিকা, বঙ্গদেশীয় শঙ্করা-চার্য্য নামা অনৈক তন্ত্রবিৎ পণ্ডিত ষট্‌চক্র-ভেদ টিপ্পনী, এবং বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য নামে অনৈক বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ষট্‌চক্রবিবৃতি রচনা করেন। শঙ্কর রামদেবের পুত্র এবং নারায়ণের পৌত্র ছিলেন। তিনি সিদ্ধ-বিদ্যাদীপিকা ও তারারহস্যবৃত্তিকা নাম্নী আরও দুই খানি তন্ত্রগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। ষট্‌চক্রভেদের দ্বিতীয় টীকাকার রামনাথ এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

শ্রীরামনাথসিদ্ধান্তরচিতা তত্ত্বদর্শিনী।
সতাং সন্তোষমাধত্তাং টীকা ষট্‌চক্রদীপিকা॥

শ্যামাকল্পলতা নামে তন্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থ একাদশ স্তবকে রামচরণ নামা অনৈক তান্ত্রিক পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। ভবানী প্রসাদ সারচিন্তামণি নামে তন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। নাম দৃষ্টে উভয়কেই বঙ্গদেশবাসী বলিয়া বোধ হয়। ১৭৫৪ শকের লিখিত সারচিন্তামণি নামক পুস্তক কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের স্বর্গীয় পিতা হরকুমার ঠাকুর

পণ্ডিতবর অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় স্বরচিত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের ৩২৮ পৃষ্ঠার পূর্ব্বোক্ত টীকাকারগণ ভিন্ন দিনকর, চরিত্রবর্দ্ধন, বিশ্বরকর, কৃষ্ণভট্ট ও মল্লিকনাথকে রঘুবংশের টীকাকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দিনকরের টীকা ১৪৪১ সংবতে (১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হয়। তাঁহার মাতার নাম কমলা।

বর্ষেঽস্মিন্ বিক্রমার্কে শশিযুগমনুতি দ্বিচক্রিতে সূক্তিযুক্তাং
টীকামেতাং সুবোধাং ব্যতনুত কমলা কুক্ষিজন্মা দিনেশঃ॥

চরিত্রবর্দ্ধন দিনকরের পূর্ব্বতন লোক। বোম্বে নগরীর সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত বলেন যে, দিনকর অনেক স্থলে চরিত্র বর্দ্ধনের গ্রন্থের অনুকরণ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, চরিত্রবর্দ্ধন অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন।

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের বিবৃতি ভিন্ন অভি-জ্ঞান শকুন্তলের রাঘবভট্টরচিত এক খানি টীকা এবং নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের অর্থদ্যোতনিকা বিদ্যমান আছে।

মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতের সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দক্ষিণাকালিকার সংক্ষেপ পূজা প্রয়োগ প্রণয়ন করেন। *

তন্ত্রবিষয়ক জ্ঞানানন্দতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ তন্ত্রশিরোমণি প্রণীত। হরগোবিন্দ তন্ত্রবাগীশ দক্ষিণাকল্প নামে তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মহিম্নস্তব নামে সুপ্রসিদ্ধ শিবস্তোত্রের বৈষ্ণবী নামক বিষ্ণুবিষয়িণী ব্যাখ্যাও এই হরগোবিন্দ বিরচিত।

বর্ণভৈরব নামে একখানি স্বল্পায়তন গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি ও অকারাদি বর্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতা রামগোপাল পঞ্চানন। তাঁহার পিতার নাম রামনাথ, পিতামহের নাম নারায়ণ। বিদ্যাপতি, যোগীশ, কবিরাজ মিশ্র নারায়ণের উত্তরোত্তর পূর্ব্ব পুরুষ।

বিখ্যাতকবিরাজমিশ্রধরণীগীর্ব্বাণ-বাচস্পতি
যোগীশ স্তনুজস্তদীয়গুণযুক্ ষট্‌তর্কবিদ্যা
পতিঃ।
আচার্য্যো জনিস্তৎসুতঃ শ্রুতিগুরুলক্ষণ্যাদি
নারায়ণ
স্তন্মীরাত্মজরামনাথতনয়সৌয়ং কৃতিঃরাজতে॥

শ্রীপতির পুত্র রামকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি নামে ভগবতীর এক খানি স্তোত্রগ্রন্থ রচনা করেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য আগমচন্দ্রিকা নামক তন্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেন। আগমচন্দ্রিকার প্রারম্ভে রামকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং মুনিবেদনৃপে শকে।
শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্ষিপ্য তশেত্যাগমচন্দ্রিকা॥

তিনি প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তৎপ্রণীত বহুতর গ্রন্থ পণ্ডিতকুলতিলক শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি 'কৌমুদী' নামে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে মন্ত্রকৌমুদী, অধিকরণকৌমুদী, আগমকৌমুদী, ভাগবত কৌমুদী, সঙ্কল্প কৌমুদী, ব্রতোদ্‌যাপন কৌমুদী, প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী ও স্মৃতিকৌমুদী পাওয়া গিয়াছে। প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী গৌড়ীয় স্মার্ত্তচূড়ামণি শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেকের টিপ্পনী রূপে লিখিত। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত-সংগ্রহকার হেমাদ্রির চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির অন্তর্গত ব্রতখণ্ড অবলম্বন পুরঃসর ব্রতোদ্‌যাপনকৌমুদী বিরচিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ভিন্ন তিনি ব্যবহারদর্পণ, বিরোধভঞ্জনী নামক মহাভারতার্থ প্রকাশিনী টীকা, আখ্যাতবাদ টিপ্পনী ও শাব্দবোধ প্রক্রিয়া নামে দুই খানি বাদার্থ গ্রন্থ, মম্মটভট্ট কৃত কাব্যপ্রকাশ নামক সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থের কাব্যপ্রকাশ ভাবার্থ নাম্নী টীকা, ভারতী তীর্থ রচিত পঞ্চভূতবিবেক নামক বৈদান্তিক গ্রন্থের দীপিকা নাম্নী টীকা রচনা করেন বলিয়া অনুমিত হয়। ১৫৭৮ শকাব্দে লিখিত মহাভারতার্থ প্রকাশিনী, এবং ১৬৪৮ শকে লিখিত ব্যবহারদর্পণ পাওয়া গিয়াছে।

যাদবেন্দ্র বিদ্যালঙ্কার শ্যামারহস্য নামে তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে দশমহাবিদ্যার যথাবিহিত পূজাদি নিরূপিত হইয়াছে।

* স্বর্গীয় হরকুমার ঠাকুর মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত রাজোপাধিভূষিত পুত্রের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন। তিনিই বোধ হয় মূলাযোড়ের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত টোল সংস্থাপন করেন। প্রতি বৎসর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে M. A. সংস্কৃতে পরীক্ষা প্রদানার্থীগণের জন্য বিশ টাকার একটী মাসিক বৃত্তি 'হরকুমারবৃত্তি' নামে রাজা যতীন্দ্রমোহন কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত মেঘদূতের টীকা প্রণয়নে অনেকানেক পণ্ডিত স্ব স্ব পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। হরগোবিন্দ বাচস্পতি, রমানাথ তর্কালঙ্কার, ভরত সেন মল্লিক, সনাতন গোস্বামী, শাশ্বত ভগীরথ মিশ্র, বিশ্বনাথ মিশ্র, কল্যাণ মল্ল * ও মল্লিনাথ—ইঁহারা প্রত্যেকেই মেঘদূতের এক এক খানি টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সিদ্ধান্তপঞ্চানন উপাধিধারী বিক্রম-পুরের জনৈক পণ্ডিত বাক্যতত্ত্ব নামে এক খানি স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশের রচিত স্মার্ত্তাচার্য্য শূলপাণি প্রণীত শ্রাদ্ধবিবেকের বিবৃতি নাম্নী টীকা, কৃত্যপল্লব দীপিকা (শান্তিকল্প-প্রদীপ) ও তন্ত্ররত্ন নামে দুইখানি তন্ত্রশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ বিরচিত হয়। ১৫২১ সংবতের আষাঢ় মাসে লিখিত একখানি কৃত্যপল্লব-দীপিকা বিদ্যমান আছে।

শ্রীকৃষ্ণবিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যেন ধীমতা।
ক্রিয়তে বিদুষাং প্রীত্যৈ কৃত্যপল্লবদীপিকা॥

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের দায়া-ধিকার সম্বন্ধীয় দায়ক্রমসংগ্রহ নামক সুপ্র-সিদ্ধ স্মৃতি গ্রন্থ জীমূতবাহনের দায়ভাগ অব-লম্বনে বিরচিত। প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বঙ্গ-দেশে ইহা দায়ভাগের নিম্নতর আসন অধি-কার করিয়া আছে। সাহিত্যবিচার নামক নৈয়ায়িক গ্রন্থ এই শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের প্রণীত বলিয়া অনুমিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপবাসী ছিলেন। নবদ্বীপের রাজা রামজীবনের মনোরঞ্জনার্থ তিনি ১৬৩৩ শকে কৃষ্ণপদামৃত ও ১৬৪১ শকে পদাঙ্কদূত রচনা করেন। এই উভয় গ্রন্থেই কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-গণের নিকট এই উভয় গ্রন্থই সমাদরের যোগ্য।

শাকে নায়কবেদষোড়শ-মিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা স্মরণ্‌
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতবচনং বিদ্বন্মনোরঞ্জনং
শ্রীলশ্রীযুত রামজীবন মহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত রাশিলগ্নাদি বিষয়ে জ্যোতিঃসূত্র প্রণয়ন করেন। ইঁহার গুরুর নাম মার্ত্তণ্ড বলিয়া বোধ হয়।

নত্বা শ্রীগুরুমার্ত্তণ্ডঃ দুর্ব্বোধধ্বান্তনাশনং।
ক্রিয়তে জ্যোতিষাং সূত্রং শ্রীকৃষ্ণচক্রবর্ত্তিনা॥

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মঞ্জুভাষিণী নামে শঙ্করা-চার্য্যের রচিত আনন্দলহরী নামক শিব স্তোত্রের টীকা* প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতার নাম বল্লভাচার্য্য।

---

* ভগীরথ মিশ্রের টীকার নাম তত্ত্বদীপিকা, শাশ্বতের টীকার নাম ললিতা, কল্যাণমল্লের টীকার নাম মালতী, বিশ্বনাথ মিশ্রের টীকার নাম মেঘ-দূতার্থমুক্তাবলী। পণ্ডিত কুলতিলক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মেঘদূতের পাঠ-বিবেকে এই সকল টীকাকার হইতে নানা স্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

* আনন্দলহরীর আরো পাঁচ খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে (১) নরসিংহ কৃত টীকা, (২) গঙ্গাহরির দীপিকা, (৩) কৈবল্যাশ্রম যতীর সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী, (৪) গোপীরমণ নারা[illegible] পঞ্চানন প্রণীত টীকা, এবং (৫) গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম রচিত টীকা। গৌরীকান্ত সুকবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আরো বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সুধীরিমাং।
আনন্দলহরীটীকাং তনোতি বিদুষাং মুদে॥

এই গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম প্রণীত প্রসিদ্ধ

শ্রীবল্লভাচার্য্য পুত্রেণ শ্রীলশ্রীকৃষ্ণশর্ম্মণা।
আনন্দলহরীব্যাখ্যা যথাশক্তি বিতন্যতে ॥

শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ গোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র। তিনি জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি বিরচিত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক নৈয়ায়িক গ্রন্থের ভাবদীপিকা নাম্নী টীকা রচনা করেন।*

প্রণম্য শিবয়োঃ পাদৌ ধীমতা কৃষ্ণশর্ম্মণা।
সিদ্ধান্তমঞ্জরীব্যাখ্যা ক্রিয়তে ভাবদীপিকা ॥

কৃষ্ণভট্ট আড়ে প্রণীত কাশিকা বা গাদাধরী বিবৃতি, নির্ণয়সিন্ধুর ভাষ্য, মঞ্জূষা বা জগদীশতোষিণী, শক্তিবাদবিবরণ, আখ্যাতবাদ টিপ্পনী, পদার্থচন্দ্রিকাবিলাস বিদ্যমান আছে বলিয়া সংস্কৃতবিৎ ডাক্তার হল্ সাহেব নির্দ্দেশ করেন। রঘুনাথ শিরোমণির আখ্যাতবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার টিপ্পনী রচিত হয়। শিরোমণির তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি অবলম্বনে জগদীশ তর্কালঙ্কার যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহার টীকারূপে কৃষ্ণভট্ট মঞ্জূষা লিপিবদ্ধ করেন। গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশের দীধিতি-ভাষ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কাশিকা, গদাধরের শক্তিবাদ বা শক্তিবিচারের টীকারূপে শক্তিবাদ-বিবরণ (শক্তিবাদার্থদীপিকা) বিরচিত হয়। শিবাদিত্য মিশ্রের সপ্তপদার্থনিরূপণ নামক বৈশেষিকদর্শন অবলম্বনে শারঙ্গধর পদার্থচন্দ্রিকা নামে তাহার ভাষ্য রচনা করেন। কৃষ্ণভট্টের পদার্থচন্দ্রিকাবিলাস সেই পদার্থচন্দ্রিকার ভাষ্যরূপে লিখিত।

কৃষ্ণদাস নামে নৈয়ায়িক নানার্থবাদটিপ্পনী রঘুনাথ শিরোমণির নানার্থবাদদীধিতি অবলম্বনে রচনা করেন। গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ও জনৈক অজ্ঞাতনামা নৈয়ায়িক বিরচিত নানার্থবাদটিপ্পনী বিদ্যমান আছে।†

কৃষ্ণ ধূর্জ্জটী দীক্ষিত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় রচনা করেন। ইহা দেবান্তসূত্রের ভাষ্যকার ও কাত্যায়নপ্রাতিশাখ্যের ব্যাখ্যাতা অন্নভট্টের তর্কসংগ্রহের ভাষ্য।‡

ইতিপূর্ব্বে পঞ্চম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক অদ্বিতীয় তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি তন্ত্রসার ও শ্রীতত্ত্ববোধিনী নামে দুই খানি তন্ত্র গ্রন্থ

মৈথিল ন্যায়াচার্য্য কেশব মিশ্রের তর্কপরিভাষার ভাবার্থদীপিকা নামে টীকা ডাক্তর হল্ সাহেব প্রাপ্ত হন।

* ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর (১) ন্যায়দীপিকা নাম্নী টীকা শ্রীকণ্ঠ দীক্ষিত ন্যায়বাগীশ রচিত। এতদ্ভিন্ন যাদব ব্যাসের (২) ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী সার, এবং (৩) লৌগাক্ষি ভাস্করের ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী প্রকাশ বিদ্যমান আছে।

† জগন্নাথ পণ্ডিতের নানার্থবাদবিবেক, জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের নানার্থবাদবিবৃতি নামে নানার্থবাদের আরও দুইখানি টীকা আছে।

‡ তর্কসংগ্রহ কলিকাতায় পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও বারাণসীতে ডাক্তর বেলেণ্টাইন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সুপ্রসিদ্ধ বৈশেষিক দর্শনগ্রন্থের বহুতর টীকা বিদ্যমান আছে। (১) অন্নভট্ট প্রণীত তর্কদীপিকা ও শ্রীনিবাস ভট্টরচিত তর্কদীপিকার সুরতকল্পতরু নামক টীকা,(২)নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর দীপিকাপ্রকাশ ও রামভদ্র ভট্টরচিত তট্টীকা,(৩) মুকুন্দভট্ট কৃত তর্কসংগ্রহচন্দ্রিকা,(৪) চন্দ্ররাজ সিংহের পদকৃত্য,(৫) বৃন্দাবনবাসী গোবর্দ্ধনাচার্য্যবিরচিত ন্যায়ার্থলঘুবোধিনী,(৬) পট্টাভিরাম শাস্ত্রী প্রণীত নিরুক্তি,(৭) মেরুশাস্ত্রীর তর্কসংগ্রহোপন্যাস,(৮) গোবর্দ্ধন মিশ্রকৃত ন্যায়বোধিনী, এবং (৯) তর্কসংগ্রহতত্ত্বপ্রকাশ ডাক্তার হল সাহেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রচনা করেন। তন্ত্রসার শাক্ত বৈষ্ণবাদি নানা দেব দেবীর উপাসকগণের পরম পূজনীয় ও বহুমানিত গ্রন্থ। কৃষ্ণানন্দ বহুবিধ তন্ত্র হইতে এই সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ইহাতে তিনটী বিস্তীর্ণ পরিচ্ছেদ আছে। গুরুতা-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তন্ত্রসার অনুসারে স্ব স্ব শিষ্যবর্গকে নানা দেবতার মন্ত্রপূজাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট তন্ত্রসারই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন হইয়াও গুরুতাব্যবসায়ীগণ বর্ত্তমান সময়েও শিষ্যবর্গের নিকট দেবতার ন্যায় সম্মানিত ও পরিপূজিত হইয়া থাকেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী ও অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধর বলিয়াই শিষ্যবর্গের নিকট তাঁহাদের এত আদর ও সম্মান। বর্ত্তমান সময়ে গুরুগণ* শিষ্যবর্গকে উপদেশ ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের পরিবর্ত্তে তাহাদের নিকট হইতে রাশি রাশি অর্থ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব অর্থগৃধ্নুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মূল তন্ত্রগুলির অধ্যয়ন ও আলোচনা বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারই মূলতন্ত্রসমূহের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই তন্ত্রসারই বা কয়জন গুরুতাব্যবসায়ী সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেন? মাণিকগঞ্জের বাবু রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতার বটতলার সুপ্রসিদ্ধ বেণীমাধব দে কর্তৃক বাঙ্গালা অক্ষরে তন্ত্রসার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাবু রসিকমোহন তন্ত্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক তন্ত্র, জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল ও পুরাণাদি প্রকাশ করিয়া মৃতপ্রায় সংস্কৃতসাহিত্যের পুনরুজ্জীবন সাধন করিতেছেন।

কৃষ্ণানন্দ বেদবিদ্যালঙ্কার বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ ও দেবার্চ্চনাদি সম্বন্ধে বৈদিকসর্ব্বস্ব নামে স্বল্পাবয়ব একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

হয়শীর্ষাদিকং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণানন্দশর্ম্মণা।
সর্ব্বস্বং বৈদিকানাস্তু ক্রিয়তে ধীরসম্মতং॥

কৃষ্ণকান্ত ন্যায়রত্ন—ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর ন্যায়রত্নাবলীর 'ন্যায়রত্নপ্রকাশিকা' নামে টীকা রচনা করেন। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তমতের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক 'দশশ্লোকী' সংক্ষেপে প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মানন্দের গ্রন্থ দশশ্লোকেরই ভাষ্যরূপে লিখিত।

ন্যায়রত্নাবলীং টীকাং তস্যং নত্বা চ নীলিকাং।
তনোতি শ্রীকৃষ্ণকান্তো ন্যায়রত্নপ্রকাশিকাং॥

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ—"ন্যায় রত্নাবলী" নামক পুস্তকে ন্যায়শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করেন।

নব্যপ্রাচীনতার্কিক সর্ব্বার্থাধীয়ান-ধীমতা।
তন্যতে কৃষ্ণকান্তেন ন্যায়রত্নাবলী সতা॥

কৃষ্ণদত্ত—গদ্যপদ্যে শাস্ত্রসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থে বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শাস্ত্রবিষয়ক প্রামাণিক বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

* কিরূপ লোক গুরু হওয়ার অধিকারী তাহা বিশ্বসারতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে নির্দ্দিষ্ট আছে।

সর্ব্বশাস্ত্রপরো দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
সুবচাঃ সুন্দরঃ সাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ।
আশ্রমী দেশস্থায়ী চ গুরুরেবং বিধীয়তে॥

যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত গুরু অনুসন্ধান করিলে কয়জন মিলে, জানি না। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহার বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর সংখ্যাই অধিক হইবে।

আধায় ধ্বনি বিশেষং বিশেষাং হিতসাধনং ক্রিয়তে কৃষ্ণদত্তেন সর্ব্বশাস্ত্রস্য সংগ্রহঃ ॥

ভরতসেন মল্লিক—প্রায় দেড় শত বৎসর অতীত হইল হুগলী জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বৈদ্যকুলে ভরত-মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ সেন। হরিহর নামে এক জন প্রসিদ্ধ বৈদ্য তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ ছিলেন। তিনি একজন অতি প্রসিদ্ধ টীকাকার ও গ্রন্থকার। ভরতমল্লিক সুখ-লেখন ও কারকোল্লাস নামে ব্যাকরণ সম্পর্কীয় পুস্তক, দ্বিরূপকোষ নামে অভিধান, লিঙ্গাদিসংগ্রহ নামক সুপ্রসিদ্ধ অমরকোষের টীকা *, বৈদ্য-কুলতত্ত্ব নামে বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণের বংশাবলীর ইতিহাস, দেশ-

কৌমুদী নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাণিনি ব্যাকরণ প্রণেতা ভট্টোজি দীক্ষিতের পুত্র এবং রামাশ্রমের শিষ্য। তিনি রায় মুকুটমণির পরবর্ত্তী টীকাকার। স্থানে স্থানে রায় মুকুটের ভ্রম ভানুজী কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে।

বলবীবল্লভং নত্বা গিরং ভট্টোজিদীক্ষিতং।
সুধাখ্যামমরটীকাং মুনিত্রয়মতানুগাং ॥

রায় মুকুটমণি ১৩৫২ শকে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ষোড়শ জন কোষকার ও অমরের টীকা-কারের গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বরচিত উৎকৃষ্ট অমরকোষের টীকা প্রণয়ন করেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেকানেক বৈয়াকরণ ও কোষকারের মত তাঁহার পদচন্দ্রিকা নাম্নী টীকার স্থানে স্থানে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। তিনি ক্ষীরস্বামী, কোক্কট, ভোজ-রাজ, দ্রাবিড়, সুভূতি, হড্ডচন্দ্র, কলিঙ্গ, সর্ব্বধর, রাজদেব, গোবর্দ্ধন, ব্যাখ্যামৃত, টীকাসর্ব্বস্ব, মাধবী, মধুমাধবী, সর্ব্বানন্দ ও অভিনন্দের অমরকোষের তৎপূর্ব্বতন টীকা-কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রায়-মুকুট মেদিনী ও বিশ্বপ্রকাশ প্রভৃতি অভি-ধানেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত শব্দব্যুৎপত্তি স্থানে স্থানে ভ্রমাত্মক বলিয়া অধ্যাপক উইলসন (Professor H. H. Wilson.) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রায়মুকুট মহত্তাপীয় কবি চক্রবর্ত্তী রাজপণ্ডিত বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

স্বয়ংপ্রকাশতীর্থের শিষ্য মহাদেবের প্রণীত টীকার নাম বুধমনোহরা। ১৮০২ সংবতের লিখিত একখানি পুস্তক কলিকাতা এসিয়া-টিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে।

১৯১২ অনুষ্টুভ শ্লোকে পদ্মনাভ দত্ত ভূরিপ্রয়োগ নামে অমরকোষের ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট রচনা করেন। অভিধানতন্ত্র নামে অমরকোষের পরিশিষ্ট ২০১২ শ্লোকে ও তিন কাণ্ডে জটাধর আচার্য্য কর্ত্তৃক বির-চিত। জটাধরের পিতার নাম রঘুপতি ও

* সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাধাকান্ত দেববাহা-দুরের যত্নে ও ব্যয়ে ১৭৭৩ শকে বহুবিধ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত সুবিস্তীর্ণ শব্দকল্প-দ্রুম নামক সংস্কৃত অভিধানে অমরকোষের নিম্নলিখিত টীকাকারগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সুভূতি, হড্ডচন্দ্র, কলিঙ্গ, কোক্কট, দ্রাবিড়, সর্ব্বধর, ক্ষীরস্বামী, রাজদেব, গোবর্দ্ধন, মাধবী, সর্ব্বানন্দ, অভিনন্দ, অরুণ, মল্লিনাথ, নীলকণ্ঠ, রায় মুকুটমণি, ভগীরথ, জয়াদিত্য, কোলাহলাচার্য্য, শবর, স্বামী, নয়নানন্দ, বিদ্যাবিনোদ, শ্রীরাম তর্কবাগীশ, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, ভানুজী দীক্ষিতের ব্যাখ্যা সুধা, অচ্যুত উপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা প্রদীপ, মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার কৃত সারসুন্দরী, নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পদার্থ-কৌমুদী, রমানাথ বিদ্যাবাচস্পতির ত্রিকাণ্ড-বিবেক, ভরত মল্লিকের মুগ্ধবোধ সম্মতা টীকা, ব্যাখ্যামৃত, সন্দেহভঞ্জিকা, টীকা সর্ব্বস্ব।

ভানুজী দীক্ষিতের টীকার নাম সুধা। বঘেলবংশোদ্ভবা রাজা কীর্ত্তিসিংহ দেবের আদেশে ভানুজী পাণিনিসম্মত এই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। ভানুজী সিদ্ধান্ত

বিখ্যাত কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ খণ্ড কাব্য মেঘদূতের টীকা ও সুবোধা নামে কুমার-

মাতার নাম মন্দোদরী। তিনি দিতীয় বিপ্রকুলজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ভাগীরথীং জলময়ীং জগতামধীশাং
মন্দোদরীরঘুপতী পিতরৌ চ নত্বা।
দিতীয় বিপ্রকুলজঃ স জটাধরোঽসৌ
আচার্য্য এতদকরোদভিধানতন্ত্রং॥

মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার সারসুন্দরী নামক অমরকোষের টীকা ভিন্ন নানার্থশব্দ ও শব্দরত্নাবলী নামে দুইখানি অভিধান রচনা করেন। অধ্যাপক উইলসন বলেন যে, মথুরেশ মূর্চ্ছা খাঁর (মুসা খাঁ) আশ্রয়ে থাকিয়া ১৫৮৮ শকে শব্দরত্নাবলী প্রণয়ন করেন। রাজা মূর্চ্ছা খাঁনের পিতার নাম শিতমান খান। মূর্চ্ছা খানের পুত্র রাম-আদেশে শব্দরত্নাবলী রচিত হয়। নানার্থ শব্দে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

নত্বা জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম মূর্চ্ছা খান-নৃপাজ্ঞয়া।
নানার্থশব্দা লিখ্যন্তে মথুরেশেন যত্নতঃ॥

মথুরেশের পিতার নাম শিবরাম চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম পার্ব্বতী। তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী বন্দ্যঘটীয় কুলীন ছিলেন। চন্দ্র, কাশীনাথ, মাধব, ও সর্ব্বানন্দ শিবরামের উর্দ্ধোত্তর পূর্ব্ব পুরুষ। ১৬০২ শকে সুপদ্ম ব্যাকরণের মতানুযায়ী সারসুন্দরী মথুরেশ কর্ত্তৃক বিরচিত হয়।

মথুরেশের পিতা শিবরাম চক্রবর্ত্তী ১৭৫৯ শকে গ্রহনক্ষাদির শুভাশুভ বিচার বিষয়ে শিশুবোধিনী নামে জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

যঃ সর্ব্বানন্দবন্দ্য ক্ষিতিতলবিদিতঃ
সৎকুলোমেলবীজীস্বনুস্তস্যাম জজ্ঞে
কৃতবিবিধকুলো মাধবো মাধবাভঃ।
কাশীনাথোঽপি তস্মাৎসমজনি, কুলরাম্‌-
চন্দ্রবন্দ্য স্ততো বৈ
তস্মাৎ সুখ্যাতনামা সমজনি শিবরামোঽর্থী-
বিচ্চক্রবর্ত্তী॥
রায়মুকুটটীকাদেঃ কলাপাদিক্রিয়া যতঃ।
সুপদ্মপ্রক্রিয়া তস্মাৎমথুরেশেন তন্যতে॥
গজাষ্টেতিথিযুক্‌শাকে বিদ্যালঙ্কারধীমতা।
লিঙ্গাদিসংগ্রহে টীকা নির্ম্মমে সারসুন্দরীং॥
শিবরাম চক্রবর্ত্তী জনকঃ পার্ব্বতী প্রসূঃ।
তস্য শ্রীমথুরেশোঽসৌ চকার সারসুন্দরীং॥

পঞ্চধ্যায়াত্মক জ্যোতিঃসাগর-সার নামে জ্যোতিষগ্রন্থ এই মথুরেশ রচিত কি না, জানি না।

সামন্তসার গ্রামনিবাসী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি নামে অমরকোষের সুবিস্তৃত উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। ১৭৪২ শকাব্দে লিখিত এক খানি পুস্তক মুরসিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নসীপুরের বাবু জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্তের নিকট বিদ্যমান আছে।

মতং গুরূণাং প্রতিচার্য্য যত্নাদ্‌
আলোক্য তন্ত্রানিচ কোবিদানাং।
সতাং মুদে শ্রীরঘুনাথশর্ম্মা
ত্রিকাণ্ডচিন্তামণিমাততান।

এই টীকা মহামতি কৃষ্ণবল্লভের অনুরোধে বিরচিত হয়। এই কৃষ্ণবল্লভ কে, বলিতে পারি না।

মুকুন্দশর্ম্মা লিঙ্গানুশাসনটীকা বোপদেবের মুগ্ধবোধ অনুসারে রচনা করেন। ১৬১৭ শকে লিখিত এক খানি গ্রন্থ শান্তিপুরের রাধিকানাথ গোস্বামীর নিকট বিদ্যমান আছে।

নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং বোপদেবকবেমতং।
জ্ঞাত্বা টীকা বিরচিতা ক্রিয়া মুকুন্দশর্ম্মণ।

রাঘবেন্দ্র (রঘুনন্দন) ভট্ট অমরকোষভাষ্য কাতন্ত্রব্যাকরণ সম্মত করিয়া রচনা করেন। টীকাকারের পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণভট্ট।

কাত্যায়নব্যাড়ি-শ্রীমাধবাদীন্‌
কাতন্ত্রতন্ত্রাণি বিচার্য্য যত্নাদ্‌।
শ্রীরাঘবেন্দ্রোঽমরসিংহকোষে
তনোতি ভাষ্যং সুধিয়াং হিতায়॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণভট্টস্য তনুজেন দ্বিজন্মনা।
নিরমায়ি সতাং প্রীত্যৈ ভাষ্যং মানুষবর্গকঃ॥

রাজসাহী জিলার অন্তঃপাতী লালগোলার বাবু তারানাথ রায়চৌধুরীর নিকট এক খানি কলাপসূত্রানুমোদিত অমরকোষমালা বিদ্যমান আছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় নাই।

সম্ভবের * পূর্ব্বভাগের টীকা রচনা করেন। এই সুবোধার প্রারম্ভে গ্রন্থকার কেন কেবল মাত্র প্রথম সাত সর্গের টীকা করিয়া নিবৃত্ত হইলেন,তাহার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কুমারসম্ভবংশম কালিদাসমহাকবিঃ।
যশ্যকার মহাকাব্যং সর্গৈ ষোড়শভিঃ শ্রুতং।
তস্য শেষাষ্টসর্গস্য সঞ্চারোঽভূন্ন দৈবতঃ।
পাঠোঽষ্টমস্য সর্গস্য দেবীশাপান্ন বিদ্যতে॥
টীকা তৎ সপ্তসর্গস্য সুবোধাখ্যা যথামতি।
গৌরাঙ্গসেনপুত্রেণ ভরতেন বিতন্যতে॥

শ্রীরাম লিঙ্গানুশাসনটিপ্পনী নামে অমরকোষের টীকা রচনা করেন।

লিঙ্গসংগ্রহবর্গস্য টিপ্পনীবহুসম্মতা।
শ্রীরামশর্ম্মণাকারি সুমতিপ্রতিপত্তয়ে॥

শ্রীকর আচার্য্য ব্যাখ্যামৃত নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

পদার্থকৌমুদী নামে টীকা নারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ১৬২৭ শকে লিখিত এক খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীনারায়ণ-পাদপদ্মমধুলিন্নারায়ণঃ শ্রীনিধিঃ।
যত্নেনামরপঞ্জিকাং বিতনুতে সংক্ষেপতঃ সৎকবিঃ॥

ভরত সেন রচিত ভট্টিকাব্য (রাবণবধ), শিশুপালবধ, ও নৈষধচরিতের মুগ্ধবোধক সম্মত টীকা বর্ত্তমান আছে। * সুখলেখন গ্রন্থে ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন।—

কুলবিতরণবিদ্যা বৈভবশ্রেষ্ঠগোষ্ঠী
বরহরিহর সেন খ্যাত বংশপ্রসূতঃ॥

---

*কুমারসম্ভবের আরও চারি খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। (১) গোবিন্দ রাম শর্ম্মার ধীররঞ্জিকা।

সানন্দং চরণাভিবন্দনভবৎপ্রোদ্গাঢ়হর্ষাশ্রুভিঃ।
সংসিক্তাননভূরিগদ্গদবচা দেবেন্দ্রবৃন্দার্চ্চিতং।
পাদাব্জং পরিবন্দ্য শঙ্করবিভো গোবিন্দরামো দ্বিজঃ
ব্যাখ্যানং বিতনোতি পণ্ডিতমুদে যত্নাৎ কুমারীয়কং॥

(২) মিথিলাবাসী রঘুপতি কৃত কুমার ব্যাখ্যাসুধা। এই টীকায় অষ্টমসর্গেরও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবুধৈঃ কৃতাত্র, টীকা প্রসিদ্ধার্থনিরুক্তিদক্ষা।
ইয়ন্তু গূঢ়ার্থবিবেচনায়
বিতন্যতে শ্রীরঘুণা প্রযত্নাৎ॥

(৩) রঘুবংশের টীকাকার কৃষ্ণপতি শর্ম্মার অন্বয়লাপিকা। টীকাকার মিথিলার সঙ্করাঢ়ী কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জগদ্ধর ও দিবাকরের বিস্তীর্ণ টীকা হইতে বিশেষ সাহায্য পান।

সঙ্করাঢ়ীকুলোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণপতিশর্ম্মণা।
টীকা কুমারকাব্যস্য ক্রিয়তেঽন্বয়লাপিকা॥
শ্রীমজ্জগদ্ধর-দিবাকরপণ্ডিতাদেঃ
অত্যন্তবিস্তরতরা হি কুমারটীকা।
লক্ষ্যাববোধবিষয়া রচিতা ময়াপি
ধীরেণ কৃষ্ণপতিনান্বয়লাপিকেয়ং॥

এই জগদ্ধর মালতী মাধব ও বেণীসংহার নাটকের এবং বাসবদত্তা নামক গদ্যকাব্যের টীকা রচনা করেন।

(৪) গোপালানন্দ বাণীবিলাস প্রণীত সারাবলী নাম্নী টীকা। ইহার পিতার নাম ভগীরথ মিশ্র।

শ্রীভগীরথ মিশ্রস্য সূনু—তয়া সুধীঃ।
বাণীবিলাসঃ কুরুতে টীকাং সারাবলীমিমাং॥

* ভট্টিকাব্যের প্রকৃত নাম রাবণবধ বলিয়া ১৩২৬ শকে পুরুষোত্তম দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত পুস্তকে উল্লিখিত আছে। ইহা প্রবরসেনের রাবণবধ হইতে পৃথক গ্রন্থ। শ্রীধর স্বামীর পুত্র ভট্টিস্বামী নামা ব্রাহ্মণ কবি গুজরাটের অন্তর্গত বলভীপুরের রাজার সভাসদ্ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যাকরণের দুরূহ দুর্ব্বোধ ব্যাকরণশাস্ত্রের উদাহরণাদি প্রদর্শনার্থ দ্বাবিংশতি সর্গে এই মহাকাব্য রচনা করেন।

কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেন-নরেন্দ্র পালিতায়াং।

বিদিতচরিতধীরঃ শ্রীলগৌরাঙ্গস্থ
ব্যধিত ভরতসেনো বালবোধার্থমেতৎ ॥

কীর্ত্তিরতো ভবাতাম্র পস্থ তস্থ
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্ ॥
(ভট্টি, ২২।৩৫)

ভরতমল্লিকের ভট্টিটীকা বয়সে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। ভট্টিকাব্যের ছয়খানি টীকা উত্তরোত্তরকালে যথাক্রমে রচিত হইয়াছে। (১) জয়মঙ্গল, (২) হরিহর, (৩) পুণ্ডরীকাক্ষ, (৪) কন্দর্প চক্রবর্ত্তী, (৫) বিদ্যাবিনোদ, ও (৬) ভরতমল্লিক।

নরনারায়ণ বিদ্যাবিনোদ আচার্য্যের পিতার নাম বাণেশ্বর ও পিতৃব্যের নাম জটাধর ছিল। ইহাঁর বাসস্থল পূর্ব্বগ্রাম। ইনি ক্রমদীশ্বর রচিত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সূত্রানুযায়ী উদাহরণ স্বরচিত ভট্টিবোধিনীতে প্রদর্শন করেন।

পূর্ব্বগ্রামিকুলে কলানিধিনিভ শ্ছত্রী স্মেরু স্থিতো
ভ্রাতা যস্থ জটাধরো, দ্বিজবরো বাণেশ্বর, স্তৎস্মৃতঃ।
তৎ পুত্রঃ প্রথিতোঽভবৎ কবিবরো নারায়ণো নামতঃ
সোঽভূদভ্যসনেন শাস্ত্রনিচয়াবিদ্যাবিনোঃ দার্থতঃ ॥

সন্তি যদ্যপি ভূয়াংসঃ শব্দলক্ষণচক্ষুষঃ।
তথাপি জৌমরাভ্যাস বিশেষায়ৈর শিষ্যতে ॥

পুণ্ডরীকাক্ষ ভটিকাব্যের যে টীকা রচনা করেন, তাহা কলাপ (কাতন্ত্র) ব্যাকরণ সম্মত বলিয়া তাহার নাম কলাপদীপিকা। টীকাকারের পিতার নাম শ্রীকান্ত পণ্ডিত।

নত্বা শঙ্করচরণং জ্ঞাত্বা সকলং কলাপতত্ত্বঞ্চ
দৃষ্টা পাণিনিতন্ত্রং বদতি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত সোণাপুর গ্রামের সাহা বাবুর নিকট ১৬৫০ শকের লিখিত একখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এই সাহা বাবুর নিকট ১৬৪৫ শকে লিখিত পুরুষোত্তম প্রণীত ভাষাবৃত্তি নামক ভট্টি টীকাও বিদ্যমান আছে।

মাঘের রচিত শিশুপালবধ * মহাকাব্যের সর্ব্ব প্রধান প্রামাণিক টীকাকার মল্লিনাথ সূরি। ভরত মল্লিকের টীকা ভিন্ন (১ বল্লভ দেবের শিশুপালবধ টীকা, (২) ভগীরথের অনীয়সী, ও (৩) মিথিলাবাসী ভবদত্তের তত্ত্বকৌমুদী পাওয়া গিয়াছে। ১৫৯৪ শকে বঙ্গাক্ষরে লিখিত বল্লভ দেবের টীকা কলিকাতা এসিয়াটীক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয় টীকা-

ভাষাবৃত্তিতে পুরুষোত্তম এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

নমো বুদ্ধায় ভাষায়াং যথা ত্রিমুনিলক্ষণং।
পুরুষোত্তমদেবেন লঘ্বী বৃত্তি বিধীয়তে ॥

রামচন্দ্র বাচস্পতি প্রণীত সুবোধিনী নামেও ভট্টিকাব্যের টীকা বিদ্যমান আছে।

*মহাকবি মাঘের পিতার নাম শ্রীদত্ত। ১৪৩৬ শকে বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত এক খানি শিশুপালবধ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে।

দত্তাত্মজঃ স্বকবিকীর্ত্তিহ্নাশয়াদঃ।
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানং ॥

মাঘ ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শস্বরূপ করিয়া শিশুপালবধ রচনা করেন। মাঘের কবিত্ব ও বর্ণনা শক্তি অতি অদ্ভুত ছিল। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ওজস্বী, গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহু বিস্তৃত বর্ণনা ও সহৃদয়তার অভাব মাঘের প্রধানতম দোষ। মাঘের মধুর ও মনোহর বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতবর্গ শিশুপালবধকে অসঙ্কুচিত চিত্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

উপমা কালিদাসস্য, ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং,মাঘে সন্তিত্রয়োগুণাঃ ॥
পুষ্পেষু জাতী, নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা, পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা, নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘ, কবি কালিদাসঃ ॥

কার ভগীরথ বোধ হয় মেঘদূতের টীকাকার ভগীরথ মিশ্র হইতে অভিন্ন ব্যক্তি।

বোধার্থমল্পবুদ্ধীনাং টীকামেতা মনীয়সীং।
বিদধাতি দ্বিজঃ শ্রীমান্——ভগীরথঃ॥

তৃতীয় টীকাকার ভবদত্ত মিথিলাবাসী ছিলেন। ১৫৫২ শকাব্দে (৫১২ লক্ষ্মণাব্দে) লিখিত পুস্তক চম্পানগরের জয়পতি ঝার নিকটে বিদ্যমান আছে।

মাঘে শ্রীভবদত্তেন টীকা যা ক্রিয়তে শুভা।
সর্গঃ সম্ভোগনামাসৌ তত্রাণান্দশযোহসমঃ॥

ভরত মল্লিকের টীকা ভিন্ন মহাকবি শ্রীহর্ষের রচিত নৈষধচরিতের অনেকানেক টীকা বিদ্যমান আছে। (১) নারায়ণ বেদকর প্রণীত নৈষধীয়-প্রকাশ। টীকাকার নরসিংহ পণ্ডিতের ঔরসে মদালসার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণজাতীয় সংস্কৃত সুপণ্ডিত ছিলেন।

নত্বা শ্রীনরসিংহপণ্ডিতপিতুঃ পাদারবিন্দিদ্বয়ং।
মাতুশ্চাপি মদালসেত্যভিধয়া বিখ্যাতকীর্ত্তেঃ ক্ষিতৌ।
শ্রীরামেশ্বরসীতয়োঃ সুমনসো গুর্ব্বোবগর্ব্বো যথা—
বুদ্ধি শ্রীনিষধেন্দ্রকাবঃবিবৃতিং নির্ম্মাতি নারায়ণঃ॥

এই নারায়ণের টীকা উত্তরনৈষধ (১২—২২ সর্গ) ডাক্তার রোয়ার সাহেব কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রযত্নে প্রকাশ করেন। পূর্ব্বনৈষধের প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ * কৃত টীকা বর্ত্তমান আছে।

(২) ভবদত্ত প্রণীত নলচরিত টীকা। এই ভবদত্ত প্রাগুক্ত তত্ত্বকৌমুদী নামক মাঘ কাব্যের টীকা রচনা করেন। নৈষধ-চরিতের এই টীকায় তিনি স্বীয় বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। আদিদেব, কর্ণ, বাচস্পতি মিশ্র, ধর্ম্মাদিত্য, জগদ্ধর, দিবাকর, নরশর্ম্মশর্ম্মা, দেবদত্ত, ও ভবদত্ত। টীকাকারের পিতার নাম দেবদত্ত।

(৩) গোপীনাথ আচার্য্যের হর্যহৃদয়া। ইনি বোধ হয় বঙ্গদেশবাসী ছিলেন।

(৪) নৈষধচরিতের চতুর্থ টীকা দীপিকা নরহরি বিরচিত। (৫) বংশীবদনশর্ম্মা প্রণীত নৈষধটীকা।

শ্রীরামচরণৌ নত্বা বংশীবদনশর্ম্মণা।
নৈষধীয়প্রবন্ধেঽস্মিন্নতিসংক্ষিপ্য লিখ্যতে॥

মল্লিনাথ সূরি বিরচিত ভারবির রচিত কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যের চারি খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। (১) বঙ্কিমদাসের বৈষম্যোদ্ধরণী। বীরভূম জিলার অন্তর্গত ভীমগড় গ্রামবাসী গোপালচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের নিকট গদাধর শর্ম্মা কর্ত্তৃক ১৫৯৪ শকের লিখিত এক খানি হস্তলিখিত পুস্তক আছে।

অথ বঙ্কিমদাসেন প্রণম্য পরমেশ্বরীং।
বৈষম্যোদ্ধরণী কাব্যে ভারবীয়ে বিধীয়তে॥
ব্রহ্মাস্যগ্রহচন্দ্রশেখরমুখক্ষৌণীমিতে ভূপতেঃ

* কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সুযোগ্য অধ্যাপক ও সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক স্বর্গীয় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় নৈষধচরিতের পূর্ব্বার্দ্ধের টীকা ভিন্ন, ভবভূতিঃ উত্তররামচরিত নাটকের, দণ্ডীর কাব্যদর্শন নামক অলঙ্কারগ্রন্থের এবং রাঘবপাণ্ডবীয় মহাকাব্যের টীকা রচনা করেন। রাঘবপাণ্ডবীয় নামক দ্ব্যর্থ কাব্য জয়ন্তীপুরের রাজা কামদেবের সভাসদ কবিরাজ পণ্ডিত কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিরচিত হয়। কাব্যদার্শের আরো দুই খানি টীকা আছে। প্রথম টীকা চন্দ্রিকা ত্রিসেন কৃত, দ্বিতীয় টীকা ত্রিশরণ ভট্ট ভীম প্রণীত।

শাকে কার্ত্তিকসংজ্ঞকে শনিদিনে মাসে সিতায়াংতিথৌ।
অষ্টম্যাং লিখিতা সুবোধবিষমা টীকা মুদা ভারবেঃ।
শ্রীদামোদরশর্ম্মণা সুরবরং নত্বা হরিং কামদং॥

(২) গদসিংহের তত্ত্বচন্দ্রিকা। গদসিংহ স্বীয় ভ্রাতা শ্রীসিংহের নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি এক জন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। ইনি প্রকাশবর্ষের কৃত ভারবির টীকার গ্রন্থারম্ভে উল্লেখ করিয়াছেন।

সন্তি প্রকাশবর্ষাদি টীকা অপি সুবিস্তরাঃ।
তথাপি লঘুবোধার্থং গদসিংহোঽকরোদিমাং॥

(৩) তৃতীয় টীকা মনোহর শর্ম্মার সুভাষিণী। এই টিকা রাজা মাণিক্যমল্লের তুষ্টিবিধানার্থে বিরচিত হয়।

নত্বা ভবানীচরণারবিন্দং
মনোহরেণ ক্রিয়তে বিচার্য্য।
মাণিক্য মল্লক্ষিতিপালতুষ্ট্যৈ
সুভাষিণী ভারবিকাব্যটীকা॥

(৪) ভারবির চতুর্থ টীকা প্রদীপিকা জৈনাচার্য্য দেববিজয়গণির শিষ্য ধর্ম্মবিজয়গণি রচিত। ১৭৬৬ শকের লিখিত এক খানি পুস্তক মুরসিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জাফরগঞ্জবাসী গোপাল দাস মোহন্তের নিকট পাওয়া গিয়াছে।

বেচারাম ন্যায়ালঙ্কার কর্ত্তৃক আনন্দরঙ্গিনী কাব্য বিরচিত হয়। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার চন্দননগরবাসী ছিলেন। এই কাব্যে চন্দননগর হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত জলপথে যাইতে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী গ্রাম নগরাদির বর্ণনা সহ কাশীধামের মাহাত্ম্য ও তত্রত্য তীর্থাদির পৌরাণিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই কাব্য আট সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার স্বয়ং সিদ্ধান্ততরী নামে ইহার টীকা রচনা করেন। গ্রন্থকার তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থশেষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যলীলা বিষয়ে সৎকাব্যরত্নাকর, ভৈষজ্যরত্নাকর নামে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ, সিদ্ধান্তমণিমঞ্জরী নামে জ্যোতিষ ও সিদ্ধান্তমনোরমা নাম্নী তাহার টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজারাম সিদ্ধান্ত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যশ্চৈতন্যরহস্যমদ্ভুতরসং সৎকাব্যংরত্নাকরং
বৈদ্যানাং সুখহেতবেঽতিবহুলং ভৈষজ্য রত্নাকরং।
তস্মাৎ শ্রীমণিমঞ্জরীং সুরুচিরাং নেপালভূপাজ্ঞয়া
শ্রীসিদ্ধান্তমনোরমাং সমকরোৎ টীকাং তথা জ্যোতিষি॥

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

পালরাজগণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে আমরা পাল রাজন্যবর্গের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত আলোচনা করিব।

বুদ্ধদেবের এক নাম সুগত। তদনুসারে বৌদ্ধগণ “সৌগত” নামেও পরিচিত হইয়াছেন। তাম্র শাসন ও প্রস্তর লিপিতে পাল রাজন্যবর্গকে সৌগত বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মুঙ্গেরের তাম্র শাসনে মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেবকে

"পরম সৌগত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সেই শাসন পত্রের অনুবাদক উইলকিন্স সাহেব ইহা ভাল রূপে অনুধাবন না করিয়া, দেবপাল দেবকেই স্বগত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর স্থাপনকর্ত্তা সার উইলিয়ম জোন্স উইলকিন্স সাহেবের উক্ত ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাগলপুরের তাম্র শাসনে মহারাজাধিরাজ নারায়ণপাল দেবকেও "পরম সৌগত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পাল রাজারা যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাহার প্রমাণ এত অধিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, সে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ করিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম। সত্য বটে পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু মিথ্যাবাদী কুলাচার্য্যগণ তাঁহাদের যে চিত্র সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্তই কাল্পনিক। এই মিথ্যাবাদী কুলাচার্য্যদিগের কৃপায় সাধারণ বঙ্গবাসীগণ অবগত আছেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের অত্যাচারে বাঙ্গালা দেশে হিন্দুধর্ম্ম ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ লোপ পাইয়াছিল, ইহারা ব্রাহ্মণদিগের উপবীত ছিড়িয়া ফেলিতেন ও এবম্বিধ বহু প্রকার অত্যাচার করিতেন। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। যদি জগতের মিথ্যাবাদিগণের শ্রেণী বিভাগ করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল কথা যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

বোদাল স্তম্ভ লিপির বিবরণ প্রবন্ধের প্রারম্ভে প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পুরুষানুক্রমে পাল রাজন্যবর্গের মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন এবং এই সকল মহাত্মাদিগকে তাঁহারা যথেষ্ট সম্মান ও পূজা করিতেন। বিজয় কার্য্য সমাধা করিয়া পালরাজগণ যখন আপনাদিগের মস্তক সেই সকল ব্রাহ্মণের পাদপদ্মে স্থাপন করিতেন, তখন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ ও হিন্দু বিদ্বেষ্টা কিরূপে বলিব? বোদাল স্তম্ভ লিপিতে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদিগের যেরূপ গুণানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, পাল রাজগণ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগের হিতৈষী কি শত্রু ছিলেন।

১। খাতঃ শাণ্ডিল্যবংশোকাবীরদেবস্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালো নাম তদ্গোত্রে গর্গস্তস্মাদজায়ত।

২। শক্রঃ পুরোদিশ্যিপতি ন্ দিগন্তরেষু
তত্রাত্রি দৈত্যপতিভি র্জিতনন্দনঃ সঃ।
... ... ধর্ম্মপরায়ণঃ স্ম
তৎস্মানুপৈতি নিজহাস বৃহস্পতিং যঃ॥

৩। পত্নীচ্ছানাম তস্যাসীদিচ্ছারাত্তবিবর্জ্জিনী।
নিসর্গবিমল স্নিগ্ধাসাধ্বী প্রেমময়ী শুভা॥

৪। বিদ্যাস্থ যূপমুখ ... ...
... ... পরতস্ত্রিলোকঃ।
সূনুস্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ
শ্রীদর্ভপানিরিতিনামনি সুপ্রসিদ্ধঃ॥

৫। আরেবাজনকান্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলা-
সংহতরাগৌরী পিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ
পুষ্যতসিতিম্নোগিরে।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণজলাদাবারিরাশি-
দ্বয়াৎ
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করংদাশ্রীদেব-
পালনৃপঃ॥

৬। মাদ্যন্নানাগজেন্দ্রস্রবদনবর তোচ্ছ্বাসিদনি-প্রবাহৈঃ
ক্লিন্নক্ষোত্তুত ভঙ্গপ্রবণঘনরজঃ সম্বৃতাশা বিকাশঃ।
দিক্‌চক্রায়াত ভূভৃৎপরিকর বিসরদ্বাহিনী দুর্বিলোকং
প্রাপ্য শ্রীদেবপালোনৃপতির বসতাপেক্ষয়া দ্বারি যস্য॥

৭। দত্ত্বাপ্যনম্রমুডুপচ্ছবিপীঠমগ্রে
যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্রমুকুটাঙ্কিতপাদ পাংশুঃ
সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ॥

৮। তস্যশ্রীশর্করাদেব্যা মত্রেঃ সোম ইব দ্বিজঃ।
অভূত্ সোমেশ্বর শ্রীমানপরমেশ্বরবল্লভঃ॥

৯। নভ্রান্তঃ বিকটং ধনঞ্জয়তুলামারুহ্য বিক্রামতা
বিত্রান্যর্থিষু বর্ষতা স্তুতিগিরো নোদ্গার্ব্বমাকর্ণিতাঃ।
নৈবোক্তং মধুরং বচঃপ্রণয়িনঃ সন্তর্পিনাস্বশ্রিয়া
যেনৈবং স্বগুণৈর্জ্জগদ্বিসদৃশৈশ্চক্রেসতাং বিস্ময়ঃ॥

১০। শিব ইব করং শিবায়া হরিরিব লক্ষ্ম্যা গৃহাশ্রম প্রেপ্সুঃ।
অগ্নুরূপায়া বিধিকৃৎ তরলাদেব্যাঃপাণিং জগ্রাহ॥

১১।..................
দুর্বোধোহভ্যস্তশক্তিঃ স্বনয পরিগতা শেষবিদ্যাপ্রতিষ্ঠঃ।
তাভ্যাং জন্মপ্রপেদে ত্রিদশ জনমনো নন্দনঃসূক্তিয়াভিঃ
শ্রীমাণ কেদারমিশ্রো গুহ ইব বিলসদ্দীপ্ত রূপপ্রভাবঃ॥

১২। ভাস্বদ্দর্শনসম্পীত চতুর্বিদ্যা পয়োনিধীন্।
জহাসাগস্তসম্পত্তি মুদ্গিরন্নস্থিবাস্তু যঃ॥

১৩। উৎকোলিতোৎকলকুলং হৃতহূনগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃত দ্রবিড় গুর্জ্জর রাজদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরসনাভরণং বুভোজ-
গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং॥

১৪। স্বয়মপহৃত বিত্তানর্থিনো যোবমেনে
দ্বিষদি সুহৃদিবাসীন্নির্ব্বিবে কো যদাত্মা।
ভবজলধি নিপাতে যস্য ভীধুর্তপাপা-
পরিমুদিত কংশং যো যঃ পরে ধাম্নিরসে।

১৫। যস্যাগ্রেষু বৃহস্পতিপ্রকৃতেঃশ্রীসূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব প্রজাপ্রিয়বলোগত্বব ভূয়ঃ স্বয়ং॥
নানাম্ভো নিধিমেখলস্য জগতঃ কল্যাণ গঙ্গাচিরং
গঙ্গাম্ভঃ প্লুতমানসো নতশিরা জগ্রাহ পূতঃপয়॥

১৬। দেবগ্রামভবা তস্য পত্নীবন্ধা.........
... . ॥

১৭। সা দেবকীব তস্মাদ্য শোদয়া স্বীকৃত-মিবকৃষ্ণং
গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমংতনয়ং॥

১৮। জমদগ্নি-কুলোৎপন্নঃ সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামসেন ইবাপরঃ॥

১৯। কুশলোগুণান্ বিবেক্তং বিজিতেষু যঃ নৃপঃ প্রসাদং স্বনমতি।
শ্রীনারায়ণ পালঃ প্রশস্তিরপরা কিয়ত্যসৌব॥

২০। নানাকাব্য রসাগমেষ্বধিগমো নীতৌ পরতিষ্ঠতা।
বেদোক্তানুগমাদসৌ প্রিয়তমো বঙ্গস্য সম্বন্ধিনাং।
আসক্তিগুর্ণকীর্ত্তনেষু মহতাং বিখ্যাত বিজ্ঞ্যোহিবো॥

যস্যানন্নমতেরমেয়যশসো ধর্ম্মাবতারোনদঃ।।

২১। যদাশিসঃ শাসতি বাগধীশ বিহায় বৈরাণিনিসর্গজানি।

উভেস্থিত সখ্যমিবাভিগম্যবেকত্র লক্ষ্মীশ্চ স্বরস্বতীশ্চ ॥

২২। শাস্ত্রানুশীলনগভীর ফর্কোবি বাদে বিদ্বত সভাসুপরবাদি মদাম্বুলেপঃ।

উচ্চাসিতঃ সপরিতো রিপুবিদ্বিষাঞ্চ।

নস্তোকবিক্রমবরেণ হতাভিমানঃ॥

২৪। সহসৈব বলং ন যস্য যন্ত্রাধগতাপি ন কর্ম্মধুয়ন্নকিঞ্চিৎ।

কলিদানমপি যস্য ন জাতু শাস্তং——,,

২৫। অতিলোল পলিত কলিযুগ বাল্মীকি বমপিশুরধর বর্ম্মেতি——

২৬। বানীপ্রসন্ন গম্ভীরা বিরোতিবপুনাতিব।

পিতরং স্বয়মাস্থায় পুত্রন্নপগমৎস্বয়ং।

ত্রক্ষতি পুরুষাৎ যস্য——যংচপ্রপেদীর।

গোদা——

২৭। স্বকীয় বপুষো লোকে ক্ষণ প্রাহিণি স্বাদি——

২৮।——ফলিনাং বৃক্ষঃ প্রিয়সখজাজ্জো-পমরোপিন।

হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ ও যাগ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। এই সকল দানপত্র অবলম্বন করিয়াই আমরা প্রধানতঃ তাঁহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রাচীন কালে কোন দানপত্র দ্বারা যে ভূমি দান করা হইত, তাহার চতুঃসীমা উল্লেখ করিয়া এরূপ বলা হইত যে, এই চতুঃসীমার মধ্যগত কোন ভূমি যদি ইতি-পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কিম্বা দেবতাতে অর্পিত হইয়া থাকে,তবে তদ্‌বাদে অপর সমস্ত ভূমি অদ্য দান করিলাম। মুদ্গাগিরি নগরে বিজয়ী স্কন্ধাভার সংস্থাপন পূর্ব্বক যখন মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভট্ট বৃক্ষরথ মিশ্রকে (শ্রীনগর বা আধুনিক পাটনার), অন্তর্গত কুমিলা বিষয়ীর (পরগণা) অন্তঃপাতী মিসিক গ্রাম দেব উদ্দেশে দৈব কার্য্য সম্পাদনার্থ দান করিয়া ছিলেন, তখনও তিনি ঐ কথা বলিয়া-ছিলেন। এমত অবস্থায় জানিনা কোন্ মূর্খ তাঁহাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী বলিতে পারেন।

সেন রাজগণের দান পত্রের মর্ম্মালোচনা দ্বারা বোধ হয় তাঁহারা বিষ্ণুর উদ্দেশে ভূমি দান করিতেন। কারণ লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে আমরা "নারায়ণ ভট্টারক মুদ্দিশ্য" শব্দ দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু পাল রাজ-গণ দেবাদিদেব ভগবান্ শশাঙ্ক শেখরের উদ্দেশ্যে ভূমিদান করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাগলপুরের তাম্রশাসনে ঐস্থানে (সেন রাজগণের শাসন পত্রে যে স্থানে "নারায়ণ ভট্টারক মুদ্দিশ্য" শব্দ লিখিত হইয়াছে সেই স্থানে) "ভগবন্ত শিবভট্টারক মুদ্দিশ্য" লিখিত রহিয়াছে। এই শাসন পত্র পাঠে অনুমিত হয় যে, তীরভুক্ত (ত্রিহুত) প্রদেশস্থিত কক্ষবিষয়ীর (পরগণা) অধীন কলস পোতগ্রামে সহস্র দেব মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ ভগবান মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি তাহাতে সংস্থাপন করিয়া সেই দেবতার পূজা, বলি, চরু, সত্র প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন ও রোগিদিগের আশ্রয়, ঔষধ ও সেবা শুশ্রুষা নির্ব্বাহ জন্য মুকুতিকা নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এ সকল কি হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ বিদ্বেষের পরিচয়? আমরা যতই এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকি, ততই মিথ্যাবাদী কুলাচার্য্যদিগের প্রতি ঘৃণা শত

গুণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনেকে বলেন যে, ইহারা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের পারিবারিক ইতিহাস রক্ষা করিয়া দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহারা পুরুষানুক্রমে মিথ্যার প্রশ্রয় ও আশ্রয় দিয়া আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। ইহারা অর্থলোভে অদ্যাপি যে সকল অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা কি আমরা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না? এরূপ মিথ্যা পরিপূর্ণ পারিবারিক ইতিহাস থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল।

যোদালস্তম্ভলিপি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ বলুন, পালরাজগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি, কিরূপ ব্যবহার করিতেন।

পাল রাজন্যবর্গের রাজ্যশাসন প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা আমরা আপাততঃ আলোচনা করিতে বিরত রহিলাম। সময়ান্তরে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবেক। কিন্তু আপাততঃ তাহাদের শাসন সংক্রান্ত রাজকর্ম্মচারিদিগের পদের তালিকা মুঙ্গের, ভাগলপুর ও আমগাছির তাম্র শাসন হইতে এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। ইহা দ্বারা পাঠকগণ তাঁহাদের শাসনপ্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এরূপ আশা করিতে পারি।

রাজরাণক।	অধীনস্থ রাজন্যবর্গ।
রাজামাত্য।	মন্ত্রী।
মহাসান্ধিবিগ্রহিক।	সন্ধি বিগ্রহের কর্ত্তা।* (Minister of peace and war.)
মহাক্ষপটলিক।	প্রধান বিচারপতি। (Chief justice.)
মহাসামন্ত।	প্রধান সামন্ত।
মহাসেনাপতি।	প্রধান সেনাপতি।
মহাপ্রতীহার।	রাজপুররক্ষক সেনাদলের নায়ক।
মহাকর্ত্তাকৃতিক।	তদন্তকারীদিগের নায়ক।
মহা দোঃ সাধ সাধনিক।	দুরূহ কার্য্যসম্পাদনার্থ যাহারা নিযুক্ত ছিলেন তাহাদের নায়ক।
মহাদণ্ডনায়ক।	ফৌজদারি বিভাগের প্রধান বিচারপতি।
মহাকুমারামাত্য।	যুবরাজের মন্ত্রী।
রাজস্থানীয়োপরিক।	রাজপ্রতিনিধি। (Viceroy and governor.)
দাশাপরাধিক।	(Investigators of the crimes.)
চৌরদ্ধরণিক।	গোয়েন্দা পুলিশের অধ্যক্ষ।
দাণ্ডিক।	মেজেষ্ট্রেট বা ফৌজদার।
দাণ্ডপাশিক।	অস্ত্র ও শস্ত্রের অধ্যক্ষ।
শৌল্কিক।	Custom's collector.
গৌল্মিক।	এক দল সৈন্যের নায়ক। Collonel.
ক্ষেত্রপ	কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ।
প্রান্তপাল।	সীমান্ত রক্ষক।
কোষপাল।	ধনরক্ষক। (খাজাঞ্চী।)
খণ্ডরক্ষ।	Superintendents of wards.
তদাযুক্তক।	Inspectors of wards

* মন্ত্রিত্ব পদে অধিকাংশ স্থলে ব্রাহ্মণ। তদ্ব্যতীত ক্ষত্রিয় কিম্বা কায়স্থ নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু মহাসান্ধি বিগ্রহকের পদটী কায়স্থদিগের প্রায় একচেটীয়া ছিল। বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণ বোধ হয় সকলেই নারায়ণ দত্তের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। ইনি মহারাজ লক্ষণ সেনদেবের শাসন কালে মহাসান্ধি বিগ্রহকর পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

বিনিযুক্তক। নিযুক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ।
Hd. of the appointment Department.

হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক। হস্তি, অশ্ব, উষ্ট্র ও নৌ সমূহের অধ্যক্ষ।

কিশোরবড়বা গোমহিষ্যজাধিকাধ্যক্ষ। এই সকল পশু সমূহের অধ্যক্ষ।

দ্রুতপেষনিক। দ্রুত সংবাদ বহনকারীগণের অধ্যক্ষ।

গমাগমিক। ডাক বিভাগের অধ্যক্ষ।

অভিত্বমান। ....

বিষয়পতি। পরগণার শাসনকর্তা।*

গ্রামপতি। গ্রামের শাসনকর্তা।

তরিক। নৌ বিভাগের অধ্যক্ষ।+

দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুড়া অঞ্চলে অদ্যাপি পালরাজগণের কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রদেশবাসী মানবগণ সেই সকল স্মৃতি চিহ্নের সহিত স্বকোপল-কল্পিত গল্প রচনা করিয়া তাহার অযথা পরিচয় দিয়া থাকেন। হায়! দিগ্বিজয়ী বঙ্গকুলতিলক পালরাজগণ, অদ্য তোমরা কোথায়, কৃতঘ্ন বঙ্গবাসীগণ তোমাদের সেই সকল কৃত কার্য্যের সহিত বাণ, বিরাট প্রভৃতি কল্পিত ব্যক্তিবৃন্দের নাম সংযোগ করিয়া তোমাদের কীর্ত্তি লোপের চেষ্টা করিতেছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সেন রাজগণের বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছিলাম, অদ্য পালরাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমাপ্ত করিলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। কেবল শাসনপত্র ও খোদিত লিপি অবলম্বন করিয়া এক একটী রাজবংশের ইতিহাস সংগ্রহ করা কতদূর দুরূহ কার্য্য, তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকগণ অবশ্যই অনুভব করিতে পারেন। মনুষ্য ভ্রম প্রমাদের দাস, আমাদের লেখা যে আদ্যোপান্তই ভ্রমশূন্য হইবে, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না। তবে পাল ও সেন রাজগণের সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ মত প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত সংশোধন জন্য আমরা যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। "কলিকাতা রিবিউ" নামক বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক "সেন রাজগণ" পুস্তকের

*ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, ডাক্তর শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের ন্যায় এক জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত "বিষয়পতি" শব্দের ইংরেজি অর্থ (Commissioners of the districts) লিখিয়াছেন। অদ্যাপিও কোন কোন প্রদেশে পরগণাকে বিষয় বলে, ইহা কি তিনি অবগত নহেন?

+নৌবিভাগের অধ্যক্ষের কথা দুইবার উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং বোধ হয় প্রথমবার সমরতরীর অধ্যক্ষকে নির্দেশ করা হইয়াছে। এস্থলে হয়ত পাঠক হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালীর আবার যুদ্ধ জাহাজ! কিন্তু পুরাতত্ত্বালোচনা দ্বারা অনুমিত হইয়াছে যে, প্রাচীনকালে অর্ণব নির্ম্মাণ ও জল যুদ্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উজ্জয়িনী নগর নিবাসী মহাকবি কালিদাস ইহা অবগত হইয়াছিলেন। ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বেও তুরুস্কের সুলতানের সমস্ত অর্ণবযান বঙ্গদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া যাইত। খ্রীষ্টাব্দের চতুর্দ্দশশতাব্দীতে বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্ক পোলো আমাদের অর্ণবযান সমূহের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্পাঠে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার মতে এরূপ বৃহৎ সুন্দর ও সুদৃঢ় অর্ণবতরী তদানিন্তন জগতে অন্য কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যাইত না।

সমালোচনে বলিয়াছেন, "স্কুলের পাঠ্য ইতিহাস লেখকগণ এই পুস্তক দর্শন করিয়া অনেক ভ্রম সংশোধন করিতে পারিবেন।" আমরা কিন্তু সে আশা করি না, কারণ ইহা আমাদের জাতীয় স্বভাবের বিপরীত। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর কথায় ভ্রম সংশোধন করিতে নিতান্ত লজ্জা ও অপমান বোধ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত নহি।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

কি ছিল, কি আছে, কি চাই।

বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষ কখনও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, পরিবর্ত্তন স্বভাবের চিরন্তন প্রচলিত নিয়ম, এই নিমিত্ত মানুষের মধ্যে পরিবর্ত্তনের বাসনা আমরা এত সমধিকরূপে দেখিতে পাই। ব্যক্তি-বিশেষের জীবনের কার্য্য মূলে এই বাসনা, সমাজের কার্য্য মূলেও এই বাসনা। এই নানাবর্ণ, নানাস্বভাব অসংখ্য মানবসমাজ এই একই বাসনা দ্বারা পরিচালিত। যে জাতির অথবা যে ব্যক্তির বর্ত্তমান অবস্থা যত অসন্তোষজনক, সে জাতির অথবা সে ব্যক্তির মধ্যে এই পরিবর্ত্তন-বাসনা তত বেশী। অবস্থা এবং কার্য্যানুসারে এই বাসনা হইতে কখনও বা সুফল, কখনও বা কুফল প্রসূত হয়। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত রিফর্ম বিল, এবং নর-শোণিত-স্নাতক ফরাসী-বিপ্লব একই জননী গর্ভ সম্ভূত।

আমাদের ভারতবর্ষীয় সমাজ সমূহেও এক্ষণে পরিবর্ত্তন-বাসনা একান্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আর বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছি না। ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক কার্য্য মধ্যে,—মোট কথা আমাদের সমাজের সমুদয় কার্য্য বিভাগেই—আমরা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি। তন্মধ্যে সমাজনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক বিষয়ে মতভেদ অত্যন্ত অধিক; এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক স্বতন্ত্র-ভাবে এই দুই বিভাগে কার্য্য করিতেছেন। কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিভাগে সকলে একত্র চেষ্টা করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা পাছে এদিকেও অন্য দুই দিকের ন্যায় বহু সম্প্রদায়ের উদয় হইয়া পড়ে। এখন পর্য্যন্ত আমরা রাজনৈতিক বিশেষ কোন অধিকার প্রাপ্ত হই নাই, শীঘ্র প্রাপ্ত হইতে পারিব কি না, সে বিষয়েরও গুরুতর সন্দেহ আছে। কাযেই সে বিষয়ের মতভেদ এখন পর্য্যন্ত তত প্রকাশ্যরূপে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু এ বিষয়েও আমাদের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন মতের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। একশ্রেণী গত সময়ের প্রতি মাত্র দৃষ্টি করিতে চাহেন না, বা দৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ করেন না; অপর শ্রেণী যাহা ছিল তাহাই পাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র। আমরা এ উভয় শ্রেণীকেই তুল্যরূপে ভ্রম-পতিত বলিয়া মনে করি। যাহা হউক, এ বিষয়ে সকলের অন্তঃকরণেই একটী পরিষ্কার মত গঠিত হওয়া প্রয়োজন, এই নিমিত্ত, আমরা হিন্দু, মুসলমান এবং

ইংরেজ সময়ের কয়েকটী বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

রাজশক্তি—আর্য্য শাসন সময়ে রাজা যেরূপে নিজের শক্তি পরিচালন করিতেন, এবং প্রজারা রাজার প্রতি যেরূপ বিশ্বাস করিত, সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া অনেকে আক্ষেপ প্রকাশ করেন; কেহবা মধ্য সময়ের অবস্থা স্মরণ করিয়া মলিন হন, এবং বর্ত্তমান অবস্থার অনেক দোষ ও অনেক অভাব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এখন এই সময় ত্রয়ের অবস্থা একবার একে একে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"অরাজকেহি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো
বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য লোকস্থ রাজানামসৃৎপ্রভুঃ॥"
(মনু ৭ম, অঃ ৩ শ্লোক।)

হিন্দুর রাজা ভগবানের সৃষ্ট, সামাজিক শক্তি হইতে এ রাজশক্তি জন্মে নাই; যে ঈশ্বর চতুর্ব্বর্ণের সৃজনকর্ত্তা, তিনিই এই সামাজিক শক্তির এক প্রধান বর্ণের সৃজন করিলেন। এই রাজা যেরূপ উপকরণে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে মানব ধর্ম্মসংহিতা-কর্ত্তা বলিতেছেন :—

"ইন্দ্রানিল যমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যোনির্ম্মিতো-
নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা।
(মনু অঃ ৭ম, শ্লোক৪।৫)

ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, তপন, মৃত্যু এবং কুবেরের সার ভাগ গ্রহণ করিয়া ভগবান রাজাকে সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার তেজে সমুদয় ভূতই অভিভূত হয়। আজি কালি আমরা পৌরাণিক লেখকদিগের অনেক কথার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দেই যে, লেখক নিজে সেরূপ ব্যাখ্যা কোন দিন স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। হয়ত কেহ উল্লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া বলিবেন যে, রাজপ্রভাবের স্বভাব বুঝাইবার নিমিত্ত এইরূপ অলঙ্কারময় ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে রাজাকে তাঁহারা মানবীয় উপাদানে সৃষ্ট বলিয়াই মনে করিতেন। ৮ম শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি করিলে আর এরূপ মীমাংসায় সায় দেওয়া যায় না। :—

"বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্যইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠ তি। ৮।
(মনু সপ্তম অঃ।)

রাজা মানুষ, এ কথা মনে করিলেই রাজাকে অবমাননা করা হয়। রাজা নিতান্ত বালক হইলেও তাহাকে মানুষ মনে করিয়া অবমাননা যেন না করা হয়। এইরূপ উপদেশান্তে সংহিতা-কর্ত্তা বলিতেছেন, রাজা মহতী দেবতা, নররূপে এই পৃথিবীতে অবস্থিত। এই ত গেল রাজশক্তি সম্বন্ধে সেই সময়ের ধারণা। এক্ষণে রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে কি উপদেশ আছে, তাহা আমাদের একবার দেখা আবশ্যক।

"তস্মাদ্ধর্ম্মং যমিষ্টেষু স ব্যবস্যেন্নরাধিপঃ।
অনিষ্টঞ্চাপ্য নিষ্টেষু তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ॥ ১৩

রাজা যে নিয়ম প্রচলিত করিবেন, তাহার দ্বারা ইষ্টই হউক আর অনিষ্টই হউক, কখনও সে নিয়মের অতিক্রম করিবে না।

ইয়ুরোপের রাজাও এক দিন ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইতেন (god's annointed.) য়িহুদীরা ঈশ্বরের বিশেষানুগৃহীত ব্যক্তিকে

রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজাকে চিরদিনই মানবীয় উপাদানে গঠিত মনে করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে রাজশক্তি সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; রাজার শক্তি এক্ষণে প্রজাপ্রদত্ত শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। তিনি প্রজার নিকট নিকাশের জন্য পর্য্যন্ত দায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। হিসাব কিতাবে কাযে কর্ম্মে রীতিবিরুদ্ধ কিছু দেখিলে, তাঁহার কৈফিয়ত তলব করা যাইতে পারে। সুতরাং সেই আর্য্য সময়ের অমানুষীয় উপকরণে গঠিত নররূপী দেব ক্রমে পরিবর্ত্তনের স্রোতের মধ্য দিয়া আসিয়া সমাজের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া পড়িয়াছেন। এখন আবার এই কর্ম্মচারীরূপী রাজশক্তিকে দেবরূপী প্রস্তুত করিয়া তোলা তত সহজ নয়। অতীত কালের অদৃষ্ট অবস্থাকে কল্পনা অনেক সময়ই উজ্জ্বল রঙ্গে চিত্রিত করিয়া থাকে, গত অবস্থা স্মরণ করাইয়া স্মৃতি অনেক সময়ই অনর্থক আমাদিগকে কাঁদায়, কিন্তু স্মরণ করিয়া দেখুন, আমরা সে অবস্থায়ও এইরূপ কষ্টভোগ করিয়াছি কি না। পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি সম্মান দেখায় না, এরূপ জাতি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা এই সংসার-সৈকতে নিজদিগের চরণচিহ্ন সহ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সম্মান করি, কাজেই তাঁহাদের সময়ের অবস্থাকেও আমরা ভাল বলিয়া কল্পনা করিয়া লই। সময়ের পরিবর্ত্তনে, রুচির পরিবর্ত্তনে, সামাজিক অবস্থার যে বিষম পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং পূর্ব্বের রীতিনীতি যে আজ আর সমাজ পরিচালনে সক্ষম নয়, একথা অতি অল্প লোকেই মুখে স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দুপ্রচারক হিন্দুর রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতির ব্যাখ্যা করিয়া গর্ব্বিত বচনে আবার সমাজকে সেই সমুদয় নীতি অনুসরণ করিতে বলেন। তাঁহাদের অন্তরে পূর্ব্বগামী আর্য্য মহর্ষিগণের প্রতি যে গাঢ় ভক্তিরাশি বিরাজ করিতেছে, তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেই; কিন্তু আমরা একথা না বলিয়া আর থাকিতে পারি না যে, এক্ষণে এ গাড়ীর চাকা আর পশ্চাতে নেওয়া যায় না। মুখে যিনিই যাহা বলুন না কেন; আজ দেব-শক্তিধারী, অজ্ঞাতাভিপ্রায় রাজার শাসন অবিতর্কিত রূপে শিরোধার্য্য করিতে কেহই স্বীকৃত হইবেন না।

এক্ষণে সমাজ উন্নতই হউক, আর অবনতই হউক, পৌরাণিক সময়ে যাহা ছিল, তাহা আর নাই; ভিন্ন ভিন্ন রূপ সমাজ-সংসর্গে, আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং বিবেচনা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নূতন অবস্থায়, নূতনপ্রকারের ব্যবস্থার প্রয়োজন। তবে সেই ব্যবস্থা কোন দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইবেক,—হিন্দু সমাজ যাহাতে যাইয়া পৌরাণিক আর্য্য সমাজে শীঘ্র পরিণত হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে হইবেক, না ক্রমে জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন বলে, যখন সেরূপ অবস্থা পরিগ্রহ করা উচিত, সেই রূপ অবস্থানুযায়ী কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারে, এই রূপ শক্তির উপযোগীতার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবেক? আমারা বলিব, পূর্ব্বকীর্ত্তি জাতীয় গৌরবের পতাকা, ইহাকে উচ্চে প্রথিত করিতে চাও, কর; অবসন্ন এবং

ম্রিয়মান সৈনিক যখন সেই পতাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, যখন অন্য জাতির পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তির সহিত তাহার পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি কলাপ তুলনা করিবে, তখন তাহার অবসন্ন দেহে বল সঞ্চারিত হইবে,—সে উত্তেজিত হইয়া জীবনের যুদ্ধে অগ্রসর হইবেক। আমি এ পবিত্র স্মৃতি-ধ্বজা উঠাইয়া ফেলিতে বলি না, কিন্তু আবার লক্ষ্য-বিমুক্ত করিতেও চাহি না।

হিন্দুরাজগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনানুরোধে যে নীতি অবলম্বন করিয়া শাসন করিতেন, সে নীতি মুসলমান শাসন নীতি অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ ছিল। ইংরেজাধিকারের বর্ত্তমান শাসন নীতির সহিত যে তাহার তুলনাই চলে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে শাসন প্রণালী প্রচলিত, তাহাতে যে কোন প্রকার কলঙ্ক নাই এবং তাহাই আদর্শ শাসন প্রণালী, একথা আমরা বলি না। ইহার মধ্যে যে অনেক গুরুতর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন, তাহা আমরা বিশেষ-রূপ জানি। কিন্তু সমাজকে পূর্ব্বাবস্থায় নেওয়া সেইরূপ পরিবর্ত্তনের লক্ষ্য হইতে পারে না। আমরা যে অবস্থায় আছি, সে অবস্থা আমাদের পূর্ব্বাবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া নিকৃষ্ট-তর অবস্থায় কেহ যাইতে চাহে না, উৎকৃষ্ট-তর অবস্থার আকাঙ্ক্ষা করাই স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষে অনেক পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমরা সামাজিক উন্নতির বীজ দেখিতে পাই। একথায় স্বদেশ-প্রিয় অনেকের নিকটই তিরস্কৃত হইব বোধ হয়, কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে লিখিতে হইতেছে, স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মুসলমানের অভ্যুদয় ক্ষণকালের নিমিত্ত দেশে জ্ঞানের স্বাধীনতা প্রতিরোধ করিয়া সমাজকে উৎক্লেশিত করিয়াছে সত্য; কিন্তু আবার পক্ষান্তরে সেই বিষম ভেদময় আর্য্য সমাজে সাম্য বিস্তারের সূত্রপাতও আবার মুসলমানের সময়ই আরম্ভ হইয়াছে। ইংরেজ শাসন সময়ে সেই সাম্যের ভাব এত বহুল বিস্তৃত হইয়াছে যে, জেতা এবং জিতের মধ্যে সামান্য প্রভেদ সহ্য করিতেও কেহ আর প্রস্তুত নয়। তপোবনের নিভৃত কুটীর পূর্ব্বে জ্ঞানের বসতিভূমি ছিল, এক্ষণে তাহাকে সামান্য গৃহস্থের কুটীরেও দেখিতে পাই এবং ক্রমে যে নিম্ন হইতে নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ দেখিব, এ আশা-কেও আমরা দুরশা বলিয়া মনে করি না।

হিন্দুর রাজত্ব সময়ে হিন্দুর রাজনীতি অত্যন্ত অসাম্যময় ছিল, এ কথা আমরা বলি-য়াছি, এক্ষণে তাহা আমাদের পক্ষে প্রমাণ করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে আর্য্য সময়ে আমরা চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ প্রধানতঃ দেখিতে পাই; এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্যবসা-য়ের সমতা ছিল না, এ কথা সকলেই জানেন। অসমতা যে বর্ণগত লোকদিগের ইচ্ছানুসারে রক্ষিত হইত, তাহা নহে, শাস্ত্রের আদেশে আইনের শাসনে রক্ষিত হইত, যথা—

"দশস্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোহব্রবীৎ॥
ত্রিষুবর্ণেষু যানি স্যুরক্ষতো ব্রাহ্মণোব্রজেৎ॥
মনু অষ্টম অঃ, ১২৪ শ্লোকঃ।

স্বায়ম্ভুব মনু শারীরিক দণ্ডের দশ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই শারীরিক দণ্ডসংহিতা-কর্ত্তা কেবল ক্ষত্রিয়াদি ভিন্ন বর্ণের প্রতি ব্যবস্থা করিলেন, ব্রাহ্মণ তুল্যাপরাধে অথবা একই অপরাধে অপরাধী

হইলেও তাঁহাকে অক্ষত শরীরে যাইতে দিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহাতে অসাম্যের কোন কথাই নাই; মূর্খের প্রতি যে দণ্ড প্রয়োগে কেবল সামান্য মাত্র ক্লেশ প্রদান করা হয়, এক জন জ্ঞানী এবং সম্ভ্রান্ত লোকের প্রতি সেরূপ দণ্ড প্রয়োগ করিলে মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর এবং গুরুতর দণ্ড প্রয়োগ করা হয়, সুতরাং বাহ্যিক ফল দৃষ্টে দণ্ডের গুরুত্ব লঘুত্ব বিচার করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দুই জন অপরাধীর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দণ্ডে তুল্যরূপ ফল এবং অপরাধীরও তুল্য মানসিক কষ্ট জন্মিতে পারে; অতএব উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে অসাম্য প্রমাণ হয় না, বরং সাম্যনীতিই সমধিক রূপে রক্ষিত হইয়াছে। আমরা এরূপ তর্কের ভুল সহজেই দেখাইতে পারি, কিন্তু যখন ভূরি ভূরি অসমতার প্রমাণ স্পষ্টত পড়িয়া আছে, তখন বাকবিতণ্ডায় অনর্থক সময় ক্ষয়ে ফল নাই। আমরা পাঠকবর্গের বিচারার্থ ৪র্থ অধ্যায়ের অশীতিতম শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

ন শূদ্রায় মতিংদদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিস্কৃতং।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥

এই শ্লোকে শূদ্রকে জ্ঞানদান, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান এবং ব্রতাচরণ করার আদেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এককথায় মধ্যে ত আমরা কোন ক্রমেই উচ্চনীতির কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, পৌরাণিক ভারতে জ্ঞান ব্রাহ্মণে, বলবীর্য্য ক্ষত্রিয়ে, ব্যবসায় বুদ্ধি বৈশ্যে এবং সেবাধিকার শূদ্রে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। শক্তির যথেচ্ছা বিকাশের স্বাধীনতা কখনও প্রদত্ত হইত না। তখন কোন কারণে কেহ যদি এই সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করিত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুরুতর রাজ-শাসন ভোগ করিতে হইত। রামচন্দ্রের ন্যায় রাজা পর্য্যন্ত অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেও শূদ্রতপস্বীর শিরচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইলেন। সে শূদ্র হইয়া তপশ্চ্যাচরণের উপযুক্ত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিল, এই তাহার প্রাণদণ্ডের উপযোগী অপরাধ! ইহাপেক্ষা একদেশদর্শী নীতি আর কি হইতে পারে? প্রধানবর্গের প্রাধান্য চিরদিনের তরে স্থায়ী রাখিবার নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়ই আর্য্যনীতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীগত প্রাধান্যই পৌরাণিক ভারতের উন্নতির প্রধান কারণ এবং এই শ্রেণীগত প্রাধান্যই আবার মধ্য ভারতের অধঃপতনের কারণ। অসাম্য হইতে জাতির অভ্যুদয় হইতে পারে না। শ্রেণী বিশেষের প্রাধান্য অল্প কালের নিমিত্ত স্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী হওয়া বড় অসম্ভব। আর্য্যগণ যত দিন পর্য্যন্ত নিজদিগের চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে পরস্পরের প্রাধান্য রক্ষায় চেষ্টা করিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহাদের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইয়াছিল সত্য; কিন্তু যখন নিয়মিত যোদ্ধাজাতি অপেক্ষা অধিক তেজস্বী এবং অধিক সংখ্যক শত্রু আসিয়া দেশবৈরী রূপে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন একমাত্র গৃহ-বিচ্ছেদ-বিভিন্ন, আত্মকলহ-ক্ষীণ-সমষ্টি ক্ষত্রিয়গের বাহুবলের উপর ভারতের অদৃষ্ট লিপি নির্ভর করিল। সেই বিষম বিকল্প সময়ে অপর তিন বর্ণ সময়ের উপযোগী কোন সাহায্য করিতেই সক্ষম হইল না। পরে যাহা ঘটিল, তাহা

সকল ইতিহাস পাঠকই বিশেষরূপে অবগত আছেন। যে ভেদময়ী অসাম্য পূর্ণ নীতি হইতে এরূপ ফল প্রসূত হইয়াছে, আমরা কখনই সে নীতিকে আদর্শ করিয়া অনুসরণ করিতে পারি না।

আর্য্যদিগের শাসন সময়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে দেশ শাসিত হইত, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আর্য্য সময়ের গ্রাম্য-সমিতি এখনও সভ্য জগতে কতক পরিমাণে আদর্শ স্থান অধিকার করে। আর আর্য্য শাসনকর্ত্তৃগণ বিচার বিক্রয় করাকে পরম অধর্ম্ম মনে করিতেন। এ কালের ন্যায় সে কালে ৫৲ টাকার দাবির নিমিত্ত ২০৲ টাকা ব্যয় করিয়া ১৫৲ টাকা ডিক্রী পাইতে হইত না। যাহা হউক, সে সমুদায় আমরা যথা স্থানে আলোচনা করিব। আমরা পাঠকগণকে এই পর্য্যন্ত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আর্য্য সময়ের রাজনীতি ভেদময়ী ও অসাম্য-পূর্ণ—সুতরাং সে নীতি কখনও আদর্শ নীতি নহে। আমরা পরের প্রবন্ধে মুসলমান নীতি, এবং ইংরেজ নীতি আলোচনা করিব।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

পুরাতন।

নূতনের চমক অধিক। পুরাতন ধীর, স্থির, গম্ভীর, সৌন্দর্য্যময়। সৃষ্টির দুইটী রহস্য, নূতন ও পুরাতন। নূতন উদ্ভাসিত, পুরাতন নিগূঢ়। নূতন লইয়া সকলে ব্যস্ত, পুরাতনের পক্ষপাতী অল্প লোক। ভাসা ভাসা যাহা, তাহা সহজ-লভ্য—সকলে পায়। নিগূঢ় যাহা—গভীর আঁধারে ঢাকা যাহা—শত শত প্রস্তর স্তর উদ্ভেদ করিয়া যাহা পাইতে হয়, তাহাতে আমোদী লোকের সংখ্যা জগতে কম। এই জন্য পুরাতনের কথা তুলিতে মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়।

কিন্তু নূতন লইয়াই পুরাতন গড়া। বিন্দু বিন্দু নূতন পুঞ্জীকৃত হইয়া পুরাতন সৃষ্ট হইয়াছে। পলে পলে তিলে তিলে নূতন পুরাতনে সমাহিত হইতেছে। নূতন ক্ষণবিধ্বংসী, সান্ত, বর্ত্তমান-জীবী। পুরাতন চিরস্থায়ী, অনাদি, অনন্ত, বিশ্বাদ্য, বিশ্ব-বীজ।

ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে বোধ হয়, নূতন আছে বলিয়া পুরাতন হইয়াছে। একি সত্য কথা? সর্ব্বদা নূতন পুরাতনে গড়াইয়া পড়িতেছে। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে নূতনেরই আধিপত্য অধিক। আবার আজ যাহা পুরাতন, কাল তাহা নূতন ছিল। আবার নূতন গুলিই পলে পলে তিলে তিলে পুরাতন হইয়া যাইতেছে। নূতন দিয়া পুরাতনের সর্ব্ব-শরীর গঠিত। ইহা দেখিয়া আপাততঃ এই ভ্রম হইতে পারে যে, নূতনই পুরাতনের ভিত্তি। কিন্তু একথা বলাও যাহা, এই বিচিত্র বিশাল সুন্দর সৃষ্টি নির্জ্জীব, মৃত-শূন্য হইতে সৃষ্ট, ইহা বলাও তাহাই। চক্ষের প্রতিনিমিষের উপরে যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে, তাহাই নূতনত্ব। যে মুহূর্ত্তে কোন ঘটনার প্রকাশ, তাহার নূতনত্ব সেই মুহূর্ত্তের আরম্ভ ভাগ টুকু পর্য্যন্ত

ব্যাপিয়া থাকে, শেষভাগে মহাপ্রলয়ে বিলীন হইয়া যায়। নূতনের আদি আছে, অন্ত আছে। পুরাতনের "অন্ত নাই" একথাটী যত সহজ-বোধ্য, "আদি নাই" একথাটী তত সহজ নয়।

কাল যত যাইতেছে, পুরাতন আরও পুরাতন হইতেছে। অনন্ত কালের তুলনায় পুরাতনের প্রাচীনত্ব অনন্ত গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। কিন্তু পুরাতন যে প্রথমেই বা সর্ব্বাদিতেই পুরাতন ছিল, একথা কে সহজে বিশ্বাস করিবে? পুরাতন ও নূতনের মধ্যে কে জনক, কে সন্তান, ঠিক করা সহজ নহে। আমরা বলি, সৃষ্টি একথার অর্থই নূতনত্ব—নূতনই সৃষ্ট। সৃষ্টির অভিপ্রায় নূতনত্বেরই ক্রমোবিকাশ। নূতনত্বের পূর্ণাভাব অথচ সৃষ্টি সমাধা হইল, এ ত বাতুলের কথা। কিন্তু সৃষ্টির বীজ পুরাতন—বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজ পুরাতন। যে মহাবীজ হইতে এই বিশ্ব প্রকাশিত, তিনি অনাদি, অসৃষ্ট, পুরাতন পুরুষ; ইহাতে মতদ্বৈধ নাই। যিনি জড়বাদী, তিনিও অনাদি অসৃষ্ট জড় পরমাণু বা অন্ধ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। যিনি দ্বৈতবাদী, তিনিও নির্ম্মাতা এবং উপাদান কারণের অসৃষ্টত্ব এবং আদিমত্ব স্বীকার করেন। যিনি একেশ্বর পরায়ণ তিনি বলেন, আদি এবং অন্তের অতীত, পুরাতনের পুরাতন, পিতামহের পিতামহ, বিশ্বাদ্য বিশ্ববীজ হইতে এই আনন্দঘন বিচিত্র সৃষ্টিচক্র ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত। আজ পর্য্যন্ত কেহই বলেন নাই—বলিতে পারেন নাই, এই সুবিশাল বিশ্ব মৃত আকাশ হইতে সমুদ্ভূত। বলিলেও, আকাশেরই আদিমত্ব ও অসৃষ্টত্ব স্বীকার করিতে হয়। বিকারে সৃষ্টি বা নূতনত্ব। বিকারের জন্য নির্ব্বিকারের প্রয়োজন অলঙ্ঘনীয়! সৃষ্টির বীজ চাই, নূতনত্বের পুরাতন চাই—ভিত্তি চাই। আগে পুরাতন, পরে নূতন। একটী বীজ, অপর বৃক্ষ বা ফল।

বিকার সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার ভাল নয়। ভাল নয় এই জন্য যে, আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের নিগূঢ় অর্থ বুঝি না। সতের বিকারও যে সৎ, এ ধারণা আমাদের নাই। আমরা আশৈশব বার্দ্ধক্য মায়াবাদীর নিকট মায়ার কথা—ছায়ার কাহিনী—মিথ্যার সংবাদ—অসারের ইতিহাস শুনিয়া থাকি। কিন্তু মায়াবাদীরা প্রকৃত পক্ষে দ্বৈতবাদী। কারণ তাঁহাদের বিদ্যা এবং অবিদ্যা আছে—মায়া এবং ব্রহ্ম আছেন—অসৎ এবং সৎ আছেন এবং পরমাণুবাদী নৈয়ায়িকেরও সৎ ও অসতের জ্ঞান আছে। জড়বাদীর চক্ষে সৎ অতি হীনাবস্থ—অন্ধ, কিন্তু অসৎই জাগ্রত এবং পরাক্রান্ত। অদ্বৈতবাদী আদিতে সৎ ছাড়া আর কিছুই মানেন না—জানেনও না। সুতরাং অন্তেও তিনি সৎ ছাড়া কিছুই মানিতে পারেন না। কারণ সতের বিকারেও সৎই উৎপন্ন হইবে। সৎ মৌলিক। মূল ধাতুকে অমিশ্র ও মৌলিকাবস্থায় রাখিয়া, গঠনাদি প্রণালী দ্বারা, যত পার বিভিন্নাবস্থ কর, উৎপন্ন সকল সমমৌলিক ও সুন্দর হইবে। তদ্রূপ যিনি আদৌ সৎছাড়া অসৎ মানেন না, জানেন না, তাঁহার মতে অমিশ্র সতের বিকারে অসতের উৎপত্তি অসম্ভবপর। মূল সদ্বস্তুকে যতই বিভিন্নাবস্থ করনা, উৎপন্ন, সদ্‌ভিন্ন আর কি হইবে?

শক্তিরূপে ব্রহ্ম নির্গুণ। আনন্দ ঘনরূপে তিনি ক্রিয়াবান ও অবস্থান্তরিত। পূর্ব্বোক্ত

স্থলে বলা যাইতে পারে, শক্তি-বীজ ইচ্ছা আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা নিদ্রিত আছে। নিদ্রিতাবস্থায় তাহার কোনই গুণ অনুভব করি না। কিন্তু ভাবযোগে তাহা জাগ্রত হইলে আমরা ক্রিয়াবান ও অবস্থান্তরিত হই। সেই আদিম পুরাতন শক্তি স্বরূপ পরব্রহ্মই আনন্দ-ঘন রূপে লীলাময় হইয়া বিশ্ববীজরূপ ধারণ করিয়াছেন। সেই পুরাতন পুরুষ হইতেই সমস্ত সৃষ্টি বা নূতনত্বের উদ্ভব। পুরাতনই সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যের মূলীভূত কারণ। পুরাতনই সকল আনন্দ ও আরামের আকর। আমরা পুরাতনেরই পূজক।

ঐ শোন, পূর্ব্বস্মৃতির মধ্যে পুরাতন সুখ, দুঃখ, আনন্দ, শোক——জীবনের আলো, আঁধার সকলই সমভাবে কেমন মনোহর প্রলোভনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অমৃতময় সঙ্গীত গাইতেছে। ঐ গানের স্রোত কেমন অনন্তকাল স্থায়ী, কেমন অসীম শান্তি সুখ-প্রদ! এই যে প্রভাতে আকাশের নীলিমায় মিশিয়া পাপিয়া গাইতেছিল, গাইতে গাইতে সে যেন কোথায় গেল, তাহার গান যেন আকাশবাণীর ন্যায় আকাশে ডুবিয়া গেল, কিন্তু এই দেখ, এখনও সেই পাখী, সেই গান, সেই নীলিমা-ভরা অনন্ত আকাশ লইয়া প্রাণ জাগিয়া আছে! এই যে জাগিয়াছে, আর কি ঘুমাইবে? এইত পরকাল— এইত ইহকালের পরপার! ঐ দেখ, সেই মৃত বন্ধু, মৃত আত্মীয় এ দেশে অনন্ত জীবন লাভ করিয়া কেমন অখণ্ড আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন! এই দেখ, তোমার বাহিরের নিদ্রিত, মৃত শৈশব, যৌবন—জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তগুলি এখানে কেমন আনন্দে জাগিয়া আনন্দে নাচিতে ও গাইতেছে! প্রভাতের আলো, বসন্তের ফুল, বর্ষার মেঘ, যাহা কিছু তোমার চক্ষুর উপর দিয়া এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, দেখ, তাহা আবার এ রাজ্যে জাগরিত। দেখ, পুরাতনে কেমন অনন্ত-কালস্থায়ী নবজীবন, নব আনন্দরাশি উৎসারিত! তাই বলি, এই যে পুরাতন বৎসরটী যাইতেছে——আমাদের জীবনের কত পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ, আনন্দ, সুখ, শান্তি,আরাম, আশা,ভরসা, নিরাশা, আঁধার, আলোক ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে, এস আমরা সকলে মিলিয়া এই শেষ সময়ে তাহাকে অভিবাদন করি। কেহ মনে করিও না, পুরাতন বৎসর চলিয়া যায়। বস্তুত যত দিন যায়,বৎসর যায়, ততই উহা নিকটবর্ত্তী হয়। এই বর্ত্তমানে যদি উন্নতি চাও, আশা চাও, ভরসা চাও, ঐ ভবিষ্যৎ যদি আলোকিত করিতে চাও, তবে এই পুরাতন বৎসরটীকে ভুলিও না। যাঁহারা গত জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত লইয়া মানিকহার গাঁথিয়া গলায় পরিতে পারেন,তাঁহারাই পৃথিবীর ভূষণ এবং সৃষ্টির আলোক হন। কোথায় পতন, কোথায় উত্থান,তৎসমস্তই এই গত জীবনের ইতিহাস-মধ্যে অঙ্কিত। আলোক নিবাইয়া ভীষণ আঁধার-কণ্টক-বনে ভ্রমণ করাও অসাধ্য নয়, কিন্তু গত জীবন ভুলিয়া আগামী জীবনে উন্নতির সোপান অতিক্রম করা নিতান্তই অসাধ্য সাধন। আত্মচিন্তা, আত্মদৃষ্টি যাহা বলি না, সকলই গতজীবনের ইতিহাস সমালোচনায় নিহিত।

আমাদের মধ্যে যিনি গত বৎসর ভুলিয়া গিয়াছেন, তিনিই বর্ত্তমান বৎসরে প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। যিনি বর্ত্তমান বৎসর ভুলিবেন, তিনিই আগামী বৎসরে প্রবঞ্চিত হইবেন।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রেমান্তে।

(সঙ্গীত।)

১

বেহাগ-খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সে আমার—আছে গো কেমন ?
এখনো তার ঠোঁটে হাসি ফোটে কি তেমন ?
এখনো কি আঁখি তুলে
চারি-দিকে চায় ভুলে ?
সমুখে কি ভাসে তার সুখের স্বপন ?
—সুখে থাক, তাই চাই,
আমি মরি ক্ষতি নাই,
হ'য়ে গেছে যা হবার—কপাল লিখন !

২

ঝিঁঝিট,—কাওয়ালী।

দেখাবার হ'তো যদি প্রাণ,
পিরীতি হ'তো না আজি কবির স্বপন গান !
দেখাতাম বুক চিরে,
দেখিতাম, রমণি রে !
কুহেলিকা, মরীচিকা পিরীতে পেতো না স্থান !

৩

মিশ্র পিলু,—কাওয়ালি।

যা কিছু আসিত প্রাণে—সুখ, দুখ, গান—
তারে না জানাতে পেলে (হ'তো) আকুল পরাণ।
যাতনায় প্রাণ যায়,
নীরবে যাইতে চায়—
এখন জানাতে তায়, আসে অভিমান।

৪

মিশ্র বেলোয়ার,—খং।

দেখিলে আসিত ছুটে, এখন পলায়ে যায় !
না দেখিয়া গরবিনী প্রেম কি ভুলিতে চায় !
প্রেম কি আঁখির মেলা ?
চকিত বিজলী-খেলা ?
সে যে প্রলয়ের নিশি ঘেরে আছে সমুদায় !

৫

সিন্ধু-কাফি,—কাওয়ালী।

দেখা হ'লো তার সনে, দেখা হ'লো কেনরে !
হৃদয়ের জানাজানি আর নাহি যেন রে !
মুখে নাহি কোন কথা,
সেই ব্যথা, ব্যাকুলতা,
সুধু, গরবেতে ঢাকাঢাকি চোখে চোখে যেন রে !

৬

বেহাগ,—কাওয়ালি।

এই কি প্রেমের শেষ—যে প্রেম গত ?—
চোখে চোখে দেখা হলে অমনি নয়ন নত !
শরমে মরমে মরা, পলাই পলাই !
কত কাজে ব্যস্ত যেন, অবসর নাই !
গরবে বুঝাতে চাই,
সে সব ঘুচেছে ছাই,
আর ছেলে খেলা নাই, হ'য়েছি মানুষ মত !

৭

ললিত,—যৎ।

শুনিলে আমার নাম রোষে জ্বলে যায়—
এখনো কি আছে ক্ষত, তাই ব্যথা পায়?
এখনো কি জুড়ে হিয়ে
রোষের প্রলেপ দিয়ে?
শুনিবে উদাস হ'য়ে কবে তবে, হায়!

৮

সিন্ধু-কাফি,—কাওয়ালি।

কি দোষ ক'রেছি, হায়,
ভালবাসিয়ে তাহায়!
সকলে চাহিয়া যায়,
আমিই চাহিলে তায়—
কেন হয় মুখ রাঙা, গুণ্ঠনে লুকায়?
সবারে যে চোখে দেখে,
যেন—যেন দূরে থেকে,
আমারে কেন সে-চোখে দেখিতে না চায়!

৯

যোগিয়া-বিভাষ,—আড়া।

সে দিন যেত কেমনে?
ভাল আর পড়ে না মনে!
গেছে যেন কত মাস,
পড়িয়াছি উপন্যাস,
এর এটি ওর সেটি, আসে না স্মরণে!
ছাড়া-ছাড়া স্বপ্ন মত,
আছে কথা গোটাকত;
এ ল'য়ে যে দিন যেত,—বিস্মিত আপনে!

১০

খট,—যৎ।

যে প্রেম গিয়াছে দূরে, কাজ নাই তুলে আর
সে যে শুষ্ক ফুল-মালা, অকাল-মরণ-হার!
ইন্দ্রধনু নহে তাহা,
সে যে মারাত্মক হাহা!
প্রেম নয়—স্মৃতি-জ্বালা, নিন্দা, ঘৃণা, অত্যাচার!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

জীবনবৃত্ত লেখকদিগের দৌরাত্ম্য।

মাঘ মাসের "নব্যভারতে" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ৺অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম্ম বিষয়ক মত সম্বন্ধে এক প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি ঐ প্রস্তাবে এক স্থানে আমার উপর বিশেষ কটাক্ষ করিয়াছেন। "তাঁহাকে (অক্ষয় বাবুকে) অজ্ঞতাবাদী বলিলে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় করেন, বলা হয়। রাজ নারায়ণ বাবু এমন কথা কেন বলিলেন, জনসাধারণ তাহা বুঝিয়া দেখিবেন।" বিদ্যানিধি মহাশয় "অজ্ঞতাবাদ" অথবা বিশুদ্ধ রূপে বলিতে গেলে "অজ্ঞেয়তাবাদ" (Agnosticism) শব্দে কি বুঝায় তাহা জানেন না। অজ্ঞেয়তাবাদী তাঁহাকে বলা যায়, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কিন্তু তাঁহার শক্তি, করুণা প্রভৃতি কোন গুণ আছে এরূপ বিশ্বাস করেন না। যথা হিউম, হার্বট স্পেন্সর প্রভৃতি। অক্ষয় বাবুকে এগনষ্টিক্ আমি এই অর্থে বলিয়াছি। অক্ষয় বাবু যে এই রূপ সংশয়বাদী ছিলেন, তাঁহার

প্রণীত উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ হইতে বিদ্যানিধি নিজেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন, আমার এ বিষয়ে আর অধিক আয়াস পাইতে হইবে না। তিনি বলেন যে, উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগে তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। উল্লিখিত প্রথম ভাগেও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

"বিশ্বকারণ যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় স্বরূপ, এই অসংশয়িত ও অখণ্ডনীয় তত্ত্বটি উল্লিখিত রূপ বহুতর উপনিষদ্ বচনে একরূপ সূচিত ও নির্দ্দেশিত রহিয়াছে।" উপক্রমণিকা, ১০১ পৃষ্ঠা। "উপনিষৎ-প্রণেতা প্রাচীন পণ্ডিতেরা পূর্ব্বোক্ত রূপ অনেকানেক বচনে পরমার্থ চিন্তনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে বুঝি কেবল এই অনুক্ত দুইটী কথা সুস্পষ্ট লিপিবদ্ধ করিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। (১) যাঁহারা এই অদ্ভুত জগতের অদ্ভুত কারণের অদ্ভুত স্বরূপ * নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাতে কল্পিত গুণ ও কল্পিত স্বরূপ আরোপ করেন; তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানান্ধ। (২)—যাঁহারা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়-স্বরূপ বিশ্বকারণকে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়স্বরূপ বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত রূপ অপ্রকৃত বাদী। বস্তুত বিশ্বকারণের জ্ঞানানুসন্ধান বিষয়ে যিনি যত অগ্রসর হইতে চেষ্টা করুন না কেন, তদীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে ততই দূরস্থ হইতে থাকে।" ঐ ঐ

এখানে বলা কর্ত্তব্য অক্ষয় বাবু উপনিষদের যেরূপ "অদ্ভুত" ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার অন্যতর ব্যাখ্যা আছে।

অক্ষয় বাবু ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিবার পর একেবারে নাস্তিক হইয়াছিলেন, এমন কথা আমি বলি না, কিন্তু তথাপি আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, অজ্ঞেয়তাবাদ নাস্তিকতার কাছাকাছি। এক ডিগ্রী কম মাত্র। নাস্তিকতা যদি উনপঞ্চাশ হয়, তাহা হইলে অজ্ঞেয়তাবাদ আটচল্লিশ। আমাদিগের সকল জ্ঞান বস্তুর গুণের জ্ঞান। বস্তুর স্বরূপ আমরা কিছুই জানিতে পারি না। ঈশ্বরের কোন গুণ আছে উহা যদি না বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে মোটে ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যেমন প্রত্যেক পদার্থ কতক পরিমাণে জানা যায়, আর কতক পরিমাণে জানা যায় না, ঈশ্বরও সেইরূপ; তবে তিনি অন্য পদার্থ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অজ্ঞেয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

আমার শ্রদ্ধাস্পদ ও অতি প্রিয় বন্ধুবর মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের সহস্রগুণ ছিল। তিনি সে বিষয়ে অনুকরণস্থল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটী দোষ ছিল। তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী হইয়াও, ব্রাহ্মসমাজ হইতে পীড়া নিবন্ধন অবসৃত হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি জন্য উক্ত সমাজে যে সকল অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই সকল অনুষ্ঠানের সম্যক গৌরব তিনি একচেটিয়া করিতে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেন। একজন অজ্ঞেয়তাবাদী ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিসাধনের গৌরব লইবার জন্য কেন এত লোলুপ ছিলেন, বুঝিতে পারি না। অক্ষয় বাবু ধর্ম্ম বিষয়ে লিখিবার সময় যেমন 'অদ্ভুত শব্দ' প্রয়োগ করিতে

* যিনি এরূপ লিখিতে পারেন, তিনি, অন্যান্য বিষয় না হউক, ধর্ম্ম বিষয়ে যে নিজে একটী অদ্ভুত জীব হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা ইহা লিখিবার সময়ে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

ভালবাসিতেন, আমিও সেইরূপ এ ঘটনা সম্বন্ধে অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি। অক্ষয় বাবুর উল্লিখিত আত্মহত্যাতিশয় দোষ থাকুক, কিন্তু ঈশ্বরের এক জন পরম ভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার জন্য তাঁহার আকিঞ্চন ছিল না। বিদ্যানিধি তাঁহাকে এক জন পরম ভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। অক্ষয় বাবু জীবিত থাকিলে তিনি তাঁহার জীবনীলেখকের এরূপ চেষ্টা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন, সন্দেহ নাই।

বিদ্যানিধি, অক্ষয়বাবুকে ঈশ্বরভক্ত প্রমাণ করিবার জন্য, ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পূর্ব্বে যখন তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী ছিলেন না, তখনকার ভূরি ভূরি বাক্য তাঁহার প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এমন কি, আমার যে বক্তৃতার প্রথমে "কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন" এই বাক্য আছে, সেই বক্তৃতা অক্ষয় বাবুর রচিত বলিয়া বিদ্যানিধি তাঁহাকে এক জন পরম ভক্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহা অতি কৌতুকজনক ব্যাপার। এই বক্তৃতা যে আমার রচিত, তাহা সকল লোকেই জানে। তাহা আমার বক্তৃতার প্রত্যেক সংস্করণে আছে। যে সময়ের বৃত্তান্ত বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, সে সময়ের লোকের বিষয় যিনি এত অল্প জানেন, তাঁহার সকল কথার যথার্থতা বিষয়ে পাঠক কিরূপে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারেন?

ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পরও অক্ষয় বাবুর যে ঈশ্বর ভক্তি ছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য, বিদ্যানিধি মহাশয়, কোন ব্যক্তির সহিত কথোপকথন-সময়ের তাঁহার যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। তিনি উপাসক সম্প্রদায়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই গ্রাহ্য হইতে পারে। অক্ষয়বাবুর সংশয়-ভাব-সময়ে চারুপাঠের অনেক সংস্করণ বাহির হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যে সকল প্রস্তাব আছে, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে থাকিবার কালে রচিত হইয়া তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। আর এক কথা বিবেচনা করিতে হইবে। সংশয়বাদী ও অজ্ঞেয়তাবাদিদিগের মানবজাতির প্রতি এতটুকু করুণা আছে যে, ছেলেদের জন্য যে সকল পুস্তক তাঁহারা রচনা করেন, তাহাতে ঈশ্বর বিষয়ক প্রস্তাব থাকিতে দেন। অক্ষয় বাবু যে বহু কাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি বলিয়াছি, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পূর্ব্বকাল সম্বন্ধে খাটে না। ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে তাঁহার সংশয়ভাব ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পর এবং প্রথম ভাগ উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা লিখিবার (১৭৯১ শকের) পূর্ব্বে তাঁহার মনে উদিত হয়, কিন্তু উহার বীজ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। অক্ষয়বাবু কোনকালে বিশেষ ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন না। ইদানীন্তন এক অন্ধকেরে বিশ্ববীজ মাত্রে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আর কিছুই ছিল না। অতএব আমি যে বলিয়াছি, তিনি মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক কথা।

বিদ্যানিধি, রামমোহন রায়ের প্রতি অক্ষয় বাবুর ভক্তি তাঁহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিশ্বাসের এক প্রমাণ স্বরূপ ধরিয়াছেন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি বিখ্যাত মিলসাহেবের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল।

আমার প্রতি বিদ্যানিধি যে কটাক্ষ করিয়াছেন,তাহা আমি ধরি না। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ, এমন কি, সমস্ত হিন্দুসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি তিনি যেরূপ অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। তিনি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের একজন লেখকের কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব্বে সিমলা গমনের অগ্রে যে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরস্বরূপ বিষয়ে সভ্যদিগের মতামত লইবার জন্য যে হাত তুলিবার প্রথা ছিল, সে বিষযে প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিদ্যানিধি প্রকারান্তরে মিথ্যা বলিয়াছেন, ইহা অল্প ধৃষ্টতার কার্য্য নহে। যিনি এরূপ আচরণ করিতে সক্ষম, তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে কিরূপে তর্ক চলিতে পারে ? প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কোন শিষ্য অক্ষয়বাবুর সহিত বালীতে সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি তখন অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন, কিন্তু তিনি সেই অবস্থাতে তাঁহার সহিত এক ঘণ্টাকাল কথা কহিলেন, বাগান দেখাইলেন, প্রস্তর শম্বুকাদি দেখাইলেন, কত প্রীতি ভালবাসা দেখাইয়া বলিলেন যে,"আমি আর কাহারও সহিত কথা কহিতে পারি না, কিন্তু তুমি নাকি অতি উচ্চ স্থান হইতে আসিয়াছ, মহর্ষির নিকট হইতে আসিয়াছ, তাই তোমার সহিত এত কথা কহিতে পারিতেছি, এত বেড়াইতে পারিতেছি। তোমাকে দেখিয়া আমার কত আনন্দ হইতেছে! যে পর্ব্বতে আমরা সকলে এক দিন ছিলাম, তুমি সেই উচ্চ ভূমি হইতে নামিয়া আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছ।" গুরু, মহর্ষির প্রতি এত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি একজন চেলার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

অক্ষয়বাবুর উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে তিনি যে সকল উপাসক সম্প্রদায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আর একটী নূতন সম্প্রদায় সংযুক্ত হইল। সে সম্প্রদায়ের নাম অক্ষয়োপাসক সম্প্রদায়। ইহা দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

সকলে অবগত আছেন যে, অক্ষয়বাবু আমার কিরূপ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার কোন দোষের বিষয় বলা আমার পক্ষে অতীব কষ্টকর, কিন্তু অন্ধ-উপাসক জীবনবৃত্ত-লেখকদিগের দৌরাত্ম্যে তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম, ইহাতে আমি অতিশয় পরিতাপিত আছি। জীবনবৃত্তলেখক বলিয়া যে অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়া সেই জীবনবৃত্তের নায়ককে মনুষ্যের পূর্ণ আদর্শরূপে খাড়া করিতেই হইবে, এ কোন্ কথা ?

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ।

(উপসংহার)

বিবাহ সম্বন্ধে মোটামুটী যে সকল কথা বলা প্রয়োজন, আমরা এক প্রকার তাহা বলিয়াছি। কিন্তু বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আরও কিছু বলা উচিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং আমাদিগের দেশের শুশ্রুত-সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র একরূপ স্থিররূপে নির্ণয় করিয়াছেন যে, রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। এদিকে মনু-সংহিতা নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, পুরুষের পাঠ সমাপ্ত না হইলে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। মনুসংহিতা বালিকার সহিত যুবকের বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু তাহা যখন বিজ্ঞান-সম্মত নয়, তখন তাহা প্রতিপাল্য হইতে পারে না। এই জন্যই রক্ষণশীল দলের অন্যতর চিন্তাশীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র নাথ বসু মহাশয় বালিকার বিবাহের বয়স ১০ হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।* যে কারণেই হউক, তাঁহার পূর্ব্বের মত কতক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "বিজ্ঞান যে সর্ব্বত্র ঠিক নয়, ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাইতেছি; তবে কেমন করিয়া বিজ্ঞানের কথা মানিব?" অথচ তিনি বালিকার বিবাহের বয়স, হিন্দু সমাজের প্রচলিত নিয়ম উপেক্ষা করিয়া, দশ বৎসরের উপর তুলিয়াছেন। ইহাতেই বোধ হয় যে, বিজ্ঞান সর্ব্বত্র ঠিক না হইলেও, একেবারে যে অঠিক, তাহা তিনিও মনে করেন না। সে যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় বয়স সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একটা স্থির নির্দ্দিষ্ট নিয়মরাখা সম্ভব নয়। ধর্ম্মজ্ঞানউন্মেষ, চরিত্র-গঠন এবং স্বাস্থ্যোন্নতি—এ সকলের উপরই বিবাহ সম্বন্ধে অধিক পরিমাণে নির্ভর করা উচিত। দেশ, কাল, অবস্থা, এসকলকেও লক্ষ্য করিতে হইবে। ধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে কোন ক্রমেই পাত্রপাত্রীর বিবাহ দেওয়া সঙ্গত নয়। সেটা বালিকার পুতুল, পুতুল-বিয়ে-খেলার ন্যায়। ধর্ম্ম জ্ঞান উন্মেষের জন্য সমাজকে বিশেষ রূপ প্রস্তুত হইতে হইবে। না হইলে, পদে পদে অমঙ্গল ঘটিবে। এ সকল কথা আমরা বিস্তৃত রূপে আলোচনা করিয়াছি। ধর্ম্মজ্ঞান কাহার কোন্ সময়ে হইবে, কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারে না। তবে দর্শন বিজ্ঞান ও মনুষ্যের অভিজ্ঞতা যত দূর আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, তাহাতে ইহা স্থিররূপে বলা যাইতে পারে, পুরুষের ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সাধারণত ধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মে না। বালিকাদিগের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। তবে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে স্থানে স্থানে নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হয়। সকল অভিভাবকের বয়স্থা বালিকাকে গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিবার তত সুবিধা নাই বলিয়া, স্থান বিশেষে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটা অপরিহার্য্য। একেবারে যে সুবিধা নাই, সে কথাও কিন্তু বলা যায় না। আমাদের দেশে কুলীন ব্রাহ্মণ-ঘরে অনেক অধিক বয়স্কা যুবতী বালিকা থাকে। কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। ধর্ম্ম জ্ঞান ও চরিত্র লাভ অতি আবশ্যকীয়। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে

* নবজীবন—কার্ত্তিক, ১২৯৩।

যে কার্য্য দ্বারা চরিত্রে দুর্নীতি ও অধর্ম্ম স্থান পাইবার সম্ভাবনা, তাহাতে কাজেই নিয়মের অন্যথা করিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বালিকার বিবাহ দেওয়াও বাঞ্ছনীয়, যদি ধর্ম্ম ও চরিত্র রক্ষার আর উপায় না থাকে। বয়স বাড়িলেই যে সর্ব্বত্র ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, তাহা নয়। বয়সের সঙ্গে যে রূপ শিক্ষা না দিলে সুফল ফলে না। যেখানে যে অবস্থায় সে রূপ শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব, সেখানে বয়স বাড়াইয়া বৃথা দুর্নীতি এবং অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এ সকল বিষয় বিশেষ সতর্কভাবে বিবেচনা করিয়া অভিভাবকগণ পাত্র পাত্রীর বয়স নির্দ্ধারণ করিবেন। ১৬ বৎসর বা ২০ বৎসর পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে, এরূপ নিয়ম করিলেই যে সমাজ ধর্ম্মনীতিতে ভূষিত হইবে, তাহা নয়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহা দেখা যায় নাই।

তারপর কথা হইতেছে, অসম বয়স্ক পাত্র পাত্রীর সহিত বিবাহ দেওয়া উচিত কি না? আমাদের বিবেচনায়, তাহা একেবারেই উচিত নয়। কেবল জড়বিজ্ঞান, ও নীতিবিজ্ঞানের অনুরোধে নয়, অসম বিবাহে সমাজের ও পরিবারের নানাপ্রকার দুর্গতি ঘটে। শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয় নানা শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অসম বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। ১০ বৎসরের বালিকার সহিত ৩৫ বৎসরের যুবকের বিবাহে যেরূপ দাম্পত্য-প্রেমের ব্যাঘাত ঘটে, ২০ বৎসর বয়স্ক যুবতীর সহিত ৫০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের বিবাহেও তদ্রূপ ব্যাঘাত হয়।† অথচ দেখা যায়, সমাজে অবাধে এই অসম বিবাহ প্রথা চলিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজেও বিপত্নীক বিবাহে স্থানেং এই বয়সের ঘোরতর বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিরূপে ৩০ বৎসর অধিক বয়স্ক স্বামীর সহিত অপরিপক্কমন বালিকা স্ত্রীর গভীর প্রণয় জন্মিবে, তাহা আমরা কোন ক্রমেই কল্পনা করিতে পারি না। এই অসম বিবাহের দরুণই আমাদের দেশে অনেক বিধবা দুশ্চরিত্র হয়। সমাজের দুশ্চরিত্রতা নিবারণ করিতে হইলে, এই অসম বিবাহ সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিতে হইবে।

অসম বিবাহে সমাজে যে পাপ প্রশ্রয় পাইতেছে, একথা বুঝাইতে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে যে আমাদের দেশে স্বৈরিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। * তদ্ভিন্ন আর একটী কুফল ফলিতেছে। আমাদের দেশে কন্যার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। + সাধারণত স্বামীর বয়স স্ত্রী অপেক্ষা ২৫ বৎসর অধিক হইলে পুত্রের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে, এবং স্ত্রী পূর্ণাবস্থা (২৫বৎসর) প্রাপ্ত হইলে এবং স্বামী ৭৫ বৎসরের হইলে পুত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে।"‡ আমাদের দেশে অসম বিবাহের দরুণ সাধারণত কন্যার সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, পাত্র মেলা ভার। অন্য দিকে এই অসম বিবাহের দরুণ বিধবার সংখ্যাও খুব বাড়িতেছে। রিপুর উত্তেজনাকে দমন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়, সুতরাং দুর্নীতি যথেষ্ট প্রশ্রয় পাই-

† হিন্দুবিবাহ সমালোচন—প্রথম খণ্ড—৮৯ পৃষ্ঠা।

* Census Report, 1881. Vol. 1.

\+ Census Report Vol. 1. P. 42.

‡ Hygiene & Public Health in Bengal By Dr. D. Bose. Vol. II. p. 145.

তেছে। এই দুর্নীতি নিবারণ করিতে হইলে অসম বিবাহকে একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে। আত্মসংযম জীবনের একটা প্রধান কর্ত্তব্য, ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ। ইহা যদি আমাদের দেশের বৃদ্ধ বিপত্নীকগণ জীবনে প্রতিপালন করিয়া আদর্শ দেখাইতে না পারেন, তবে কখনই আশা করা যাইতে পারে না যে, অপেক্ষাকৃত অল্পজ্ঞানী বিধবারা তাহা পারিবে। এইজন্যও বিপত্নীক বিবাহের স্রোত থামাইতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। কেবল একন্যও নয়। প্রকৃত বিবাহ মানুষের একবার ভিন্ন হওয়া উচিত কি না, ঈশ্বরের সে বিধান কি না, পরকাল-বিশ্বাসীর পক্ষে যে বিষয়ে গভীর সন্দেহ বিদ্যমান। ১৮৭২ সালের ৩ আইনে স্ত্রী জীবিত থাকিতে পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু পরকালে স্ত্রী যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন আর রাজার আইন খাটে না, সুতরাং তখন অবাধে বিবাহ চলে। এটা অত্যন্ত অন্যায়। স্ত্রী ইহকালেই থাকুন, পরকালেই থাকুন, একাধিকবার বিবাহ করিলেই বহুবিবাহ হয়। বহুবিবাহের প্রতিরোধ করা একান্ত উচিত। অন্য দিকে অসমবিবাহের স্রোত প্রতিহত করিবার জন্যও এ কার্য্য অবশ্য-কর্ত্তব্য। বিপত্নীকগণ অধিক বয়সের কন্যা পাইতে আশা করিতে পারেন না, সুতরাং বাধ্য হইয়া বালিকাদিগকে বিবাহ করিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতেছে বটে, কিন্তু বয়স্থা বিধবার পুনর্বিবাহ যে দূষিত, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজেও ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্ক বিপত্নীক যদি পুনঃ বিবাহ করেন, তবে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অন্ততঃ ২০ বৎসর ছোট যুবতীকে বিবাহ করিতে হইবে। ইহাতেও অসম বিবাহের নানা কুফল ফলিতে থাকিবে। বৃদ্ধ বিপত্নীক বা বৃদ্ধ বিধবার পক্ষে নানা কারণে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয়। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, স্ত্রীর চিতার আগুণ নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে কি ব্রাহ্মসমাজ, কি হিন্দুসমাজ, সর্ব্বত্রই অধিকাংশ বিপত্নীকগণ পুনর্ব্বিবাহের জন্য পাত্রী অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ হওয়াতে, মানুষকে নিতান্ত রিপু-পরবশ বলিয়া মনে হয়। উপযুক্ত পুত্র কন্যা বর্ত্তমানেও পুত্র কন্যা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া এদেশের লোকেরা কত অসারত্বের পরিচয় দিতেছে। ব্রহ্মচর্য্য, আত্মসংযম, এ সকল আমাদের দেশে এখন কথার কথা হইয়া উঠিয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থায়, আত্ম-সংযম ব্রত শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের দেশের সমাজের পক্ষে খুব চেষ্টা করা উচিত। আত্মসংযম ব্রত-শিক্ষা না দিলে, এবং বিপত্নীক ও বিধবাবিবাহের স্রোতের গতিরোধ না করিলে, নানা দুর্নীতি যে প্রশ্রয় পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ জন্য, আত্মসংযম ব্রত এদেশের মনুষ্যকে অতি শৈশব হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

আমরা বলিয়াছি, আদর্শ বিবাহ সমাজে প্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা বালবিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী। অর্থাৎ উপযুক্ত বয়সে ধর্ম্মজ্ঞান লাভের পর পছন্দ-সই বিবাহ হইলে এবং বিবাহের পর স্বামী সহবাস হইলে আর বিধবা-বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। সতীত্বের মর্য্যাদা অপ্রতিহত রাখিবার জন্য, এবং পাশ্চাত্য সমাজের কুফল নিবারণের জন্য ইহা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। তবে স্থান

বিশেষে, মানুষের ব্যভিচার নিবারণের জন্য বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু সে বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হইবে, আদর্শ মনে করিতে হইবে না। না হইলে বিবাহ কার্য্যটা কালে একটা ব্যবসার ন্যায় হইয়া উঠিবে। এই রূপ চুক্তি-বিবাহ যে সমাজে চলিয়াছে, সেই সমাজেরই দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। এই জন্য হিন্দু সমাজের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজেও যাহাতে সতীত্বের আদর বৃদ্ধি পায় এবং বিবাহটা কোনক্রমে একটা চুক্তিতে বা ব্যবসাতে পরিণত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। সৌভাগ্যের বিষয়, এ বিষয়ে অনেকের দৃষ্টি আছে। বিধবা এবং বিপত্নীক, এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা বিস্তৃত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টার এখনও আবশ্যক। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অনেক বিপত্নীক মহাত্মা এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া উচ্চ জীবনের আদর্শ দেখাইতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম ঘটিতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত। আমাদের একান্ত অনুরোধ এই, ১৮৭২ সালের আইনানুসারে যে সকল যুবক যুবতীর বিবাহ হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিধবা বা বিপত্নীক হইলে আর বিবাহের চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ বিবাহ করে, তবে সে বিবাহকে আদর্শ মনে করা উচিত নয়। কিম্বা পূর্ব্ব-বিবাহিত যে সকলবিধবা বা বিপত্নীকের সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদের পুনর্বিবাহে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ভারতের অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সে বিবাহ চিরকাল নিন্দিত ও ঘৃণিত। ভূমিষ্টসন্তান লইয়া কোন বিধবা ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ করিয়াছেন, আমরা শুনি নাই। কিন্তু উপযুক্ত সন্তান বর্ত্তমান থাকিতে বিপত্নীক বিবাহ করিয়াছেন, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ সাম্যবাদানুসারে না চলিয়া বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকারের লিখিত অনুপাতবাদানুসারে চলিতেছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বয়স্থা বিধবা এবং অধিক বয়স্ক বিপত্নীকদিগের জন্য এক রূপ ব্যবস্থা হওয়াই উচিত। কেহ রিপু-দমন করিবে, কেহ রিপু চরিতার্থ করিতে থাকিবে, এ কলঙ্কের প্রথা ব্রাহ্মসমাজের সাম্যবাদের মধ্যে স্থান পাইতেছে বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্ম যাঁহাদের লক্ষ্য, আত্মসংযম যাঁহাদের মূল মন্ত্র, তাঁহারা কার্য্যকালে আত্ম-সংযম করিতে পারিবে না, ধর্ম্মগত জীবন লাভ করিতে পারিবে না, ইহা বড়ই দুঃখের কথা।

বিবাহ আধ্যাত্মিকতা সাধনের অবলম্বন। বিবাহ কেবল সংসারের ইষ্টানিষ্ট সাধনের জন্য নয়, ধর্ম্মসাধনের সহায়তার জন্য। কিন্তু সেই বিবাহ ক্রমাগত অসংখ্য বার হইতে দিলে প্রেমের পরিবর্ত্তে রিপু পরিচর্য্যারই অধিক প্রশ্রয় দেওয়া হয়। পরকালে এক পা দিয়া, পক্ককেশ ও গলিতচর্ম্ম, জীর্ণ শীর্ণ দেহধারী যে সকল বিপত্নীক দ্বিতীয় তৃতীয় বার বিবাহের জন্য লালায়িত হন, তাহাদিগের রিপুর উত্তেজনা নাই, "কেবল দুধ গরম করিয়া দিবার জন্য বা সন্তান পালনের জন্য, বা আধ্যাত্মিকতা উপার্জ্জনের জন্য যে বার বার স্ত্রী গ্রহণ করিতেছেন."

একথা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। ম্যাল্‌থাসের মত রক্ষার জন্য নয়, আমাদের বিবেচনায়, আধ্যাত্মিকতা সাধনের জন্যও একাধিক বার বিবাহ হইতে পারে না। বহুবিবাহ আমাদের দেশের শাস্ত্র বিরুদ্ধ।* স্ত্রী সংসারে থাকিলে বিবাহ দূষিত, আর পরকালে থাকিলে বিবাহ দূষিত নয়, পরকালবিশ্বাসী ধর্ম্ম-পিপাসু লোকের পক্ষে এ কথা বলা সঙ্গত নয়। তবে বালক বালিকাদের বিবাহের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের বিবাহকে আমরা বিবাহ বলিয়াই স্বীকার করি না। বাল বিধবার বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাল বিধবার বিবাহ শাস্ত্র সম্মত।† বহুবিবাহের অযৌক্তিকতা ও বালবিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এস্থানে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না। কারণ, বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অন্যান্য অনেক কৃতবিদ্যব্যক্তি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

আমরা বিগত কার্ত্তিক মাসের পত্রিকায় দেখাইয়াছি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক নিয়মের বাধ্যবাধকতা, এ উভয়েরই প্রয়োজন আছে, এবং একের সহিত অপরের মিলনের স্থান আছে। উভয়ের মধ্যে সীমা-রেখা নির্দ্ধারণ করা কিছু কঠিন বলিয়া আমরা অনেক বিজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। তৎপর দেখাইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজে এই রূপ সামাজিক নিয়মের আবশ্যকতা. ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য নেতা মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই নবসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন; এবং এই নবসংহিতা অনুসারে যাহাতে পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য দরবার (Apostolic Durbar) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দরবার ব্রাহ্ম-সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের দ্বারা সংগঠিত। সুতরাং ইঁহাদিগের সমবেত-বিবেক-শাসন দ্বারা চালিত হইলে, ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইবে, এ আশা করিয়া তিনি বড় ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার এই কার্য্য কতদূর সুফল-প্রসূ হইবে, ভবিষ্যতের ইতিহাস সে কথার উত্তর দিবে।

এই নবসংহিতায় বিবাহ সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর। আমরা এ পর্য্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে সে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা অতি সুন্দর রূপে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অত্যল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত নয়, হঠাৎ-বিবাহ মঙ্গলপ্রসূ নয়, নির্ব্বাচনের সময় রিপুর অধীন হইয়া রূপজমোহের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নয়, ধর্ম্ম ও নীতিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত উচিত, বিবাহে অভিভাবকের সম্মতি ও পাত্র পাত্রীর সম্মতি উভয়ই গ্রহণ করা উচিত, সম্বন্ধের পর পাত্র পাত্রীর আলাপাদি অভিভাবক-দিগের অজ্ঞাতে বা অসাক্ষাতে হওয়া উচিত নয়, একাধিক বার বিবাহ দেওয়া

---

* বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক বিচার, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত, চতুর্থ সংস্করণ দেখ।

† বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত, ষষ্ঠ সংস্করণ দেখ।

উচিত নয়, বিবাহ-ভঙ্গ-প্রথা কোন স্থলেই বাঞ্ছনীয় নয়, বয়স্থ বিপত্নীক বা বিধবার বিবাহ ভাল নয়, কোন প্রকার নৈতিক বা রক্তমাংস সম্পর্কে আবদ্ধ পাত্র পাত্রীর বিবাহ সঙ্গত নয়, ইত্যাদি যে সকল কথার আমরা আলোচনা করিয়াছি,সে সমুদায় অতি বিস্তারে সহিত ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায়, আজ হউক কাল হউক, এই নবসংহিতার ন্যায় কোন সংহিতা অনুসারে ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ প্রথাকে নিয়মিত করিতে হইবেই হইবে। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সূক্ষ্মদৃষ্টি ভাবী সমাজভিত্তির এক প্রধান অবলম্বন হইবে।

অনেকের এইরূপ ধারণা আছে, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে একটা নিয়ম প্রণালী আছে। আমরা বারম্বার একথা অস্বীকার করিয়াছি। সমাজের একটা কিছু স্থির সিদ্ধান্ত না থাকায় নানা রূপ দোষ-মিশ্রিত গোলযোগ দেখা যাইতেছে। সেই সকল গোলযোগের কথা আমরা বাধ্য হইয়া স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল দোষ সংশোধিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহা করিতে হইলে সমাজে আদর্শমত প্রতিষ্ঠিত করা চাই। এই আদর্শমত সমবেত বিবেক-শক্তি সংস্থাপন করিবে। সেই মত অনুসারে সমাজের সকল লোক ধর্ম্মত ও ন্যায়ত চলিতে বাধ্য। কারণ, সমাজের আবশ্যকতা মানিতে গেলে এ বাধ্যবাধকতা চাই। এই সকল কথাই আমাদের বলিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আমরা যথাসাধ্য তাহা বলিয়াছি। ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার করা আমাদের লক্ষ্য ছিল না। অনেক ব্যক্তি আমাদিগকে দোষী ব্যক্তি সকলের নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং ঘটনার স্থান ও নামোল্লেখ করিতে জেদ করিয়াছেন। আমাদের প্রতিবাদকারী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও তন্মধ্যে একজন। ব্যক্তিগত দোষের সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই। সকল সমাজের সকল লোকই কিছু স্বর্গের দেবতা হইবে না। কোন সমাজই একেবারে নিষ্পাপ হয় নাই। সকল সমাজেই দুষ্টপ্রকৃতির লোকের সমাগম আছে। ব্রাহ্মসমাজে যে খারাপ লোক একেবারে থাকিবে না, তাহা নয়। খারাপ লোক আছে, এবং তাহা থাকিবে। পাপ সমাজে আছে, এবং তাহা থাকিবে। খারাপ লোকদিগের অন্যায় কার্য্য সমাজের দ্বারা প্রশ্রয় পাইতেছে, ইহাই আমাদিগের প্রধান দুঃখ। পাপ-কার্য্য পুণ্যকার্য্যের নামে প্রশ্রয় পায়, ইহাই খেদ। খারাপ লোক যাহারা আছে,তাহাদের আচার ব্যবহার,কার্য্যপ্রণালী সমাজের দ্বারা নিয়মিত হওয়া একান্ত উচিত। নচেৎ সমাজ রক্ষার আর উপায় নাই। ব্রাহ্ম-সমাজ এক বিষম অগ্নি পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। একদিকে যৌবন-বিবাহ, এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা, অপর দিকে জাতিভেদ-নাশ এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে, সতর্ক না হইলে, পদে পদে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে কিছু দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে, ইহার ফলভোগ যে কত কাল ভুগিতে হইবে, তা বিধাতাই জানেন। কঠোর আত্মসংযমের ব্যবস্থা না হইলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। একদিকে পবিত্রতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা, অন্যদিকে বৈরাগ্য ও রিপুনিগ্রহ ;— একদিকে সুখস্বাচ্ছন্দতা বা বিলাসিতা বিসর্জ্জন, অন্যদিকে নিষ্কাম পরোপকার ব্রত গ্রহণ ভিন্ন সমাজের

মঙ্গলের পথ নাই। কার্য্যকর্ম্মহীন জীবনেই রিপুর আধিপত্য অধিক স্ফূর্ত্তি পায়। কার্য্য-শিথিলতার সহিত ব্রাহ্ম-জীবনে রিপু-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। যাহাতে প্রত্যেকে উপরোক্ত সকল সৎগুণে ভূষিত হইতে পারে, তজ্জন্য এখনই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। আদি বংশের দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সংসাধিত না হইলে, পরবংশ যে আরো অধঃপতিত হইবে, তৎপক্ষে একটুও সন্দেহ নাই। সুতরাং এখন ব্রাহ্মসাধারণের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। মন্দ লোক যাহারা আছে, তাহাদিগকে সংশোধন করিয়া যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ দেশের পরম মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, বিধাতা এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। পাপ যাহাতে এই নব সমাজে আর প্রশ্রয় না পায়, ভগবান তাহা করুন।

এক বৎসরের অধিককাল ব্যাপিয়া আমরা এই বিষয়টী লইয়া আন্দোলন করিতেছি। আমাদের সকল বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। তবুও আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম। তাহার কারণ, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া একটা বিষয় লইয়া আন্দোলন করায় অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, সকল কথা বিস্তৃত রূপ লিখিতে গেলে আরো অন্ততঃ ৬ মাসের প্রয়োজন। এই ৬ মাস ব্যাপী প্রবন্ধে নব্যভারতের যে স্থান লাগিবে, তাহাতে আরো অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইবে। তৃতীয়ত,যে উদ্দেশ্যে নব্যভারতেপ্রবন্ধটীর সূত্রপাত হইয়াছিল,তাহা একপ্রকার সুসিদ্ধ হইয়াছে। দেশের অনেক লোকের মন এই গুরুতর বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। চতুর্থত,—ব্রাহ্মসমাজে যদিও এখন পর্য্যন্ত ইহার সুফল ফলে নাই বটে, কিন্তু আন্দোলন যথেষ্ট হইয়াছে। আমাদিগকে অপদস্থ করিবার জন্যই হউক, বা যে কারণেই হউক, বিষয়টী ব্রাহ্মসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যখন মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে, তখন সময়ে যে ইহাতে একটা সুফল ফলিবে, তাহা নিশ্চয়। আর না ফলিলেও আমরা কি করিব? আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য আমরা যথাসাধ্য করিয়াছি। সুতরাং আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য একরূপ সাধিত হইয়াছে। এখন বৃথা আর আন্দোলন করিয়া প্রয়োজন কি? এই সকল নানা কারণে আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। প্রবন্ধটীতে ভুল ভ্রান্তি যথেষ্ট হইয়াছে, তাহা জানি। দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সে সমুদায় সংশোধন করিয়া এদেশীয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সহ তাহা বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল। সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবে কি না, বিধাতাই জানেন।

কেহ কেহ বলেন, এই প্রবন্ধের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করা হইয়াছে। আমরা খুব ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু একথার মূল কি, বুঝিতে পারি নাই। ধর্ম্মের নিকট যে সমাজ খাটী, সে সমাজের কে অনিষ্ট করিতে পারে? আর যে সমাজ তাহা নয়, তাহাকেই বা কে পতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে? ধর্ম্ম ও নীতির মিলন স্থান—সমাজের এই বিবাহপ্রণালী। যে সমাজে এই বিবাহ-প্রণালী আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ, সে সমাজের পতন নাই। ব্রাহ্মসমাজ এই

বিবাহ-প্রণালীকে ধর্ম্ম ও নীতির উজ্জ্বল ভূষণে যদি এতকাল যাবৎ সজ্জিত করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে এ সমাজের নিশ্চয় পতন হইয়াছে, আমরা কিম্বা শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু না বলিলেও পতন হইয়াছে। আর যদি ধর্ম্ম ও নীতিকে অপ্রতিহত ভাবে বজায় রাখিতে পারিয়া থাকেন, শতকণ্ঠে শতজন ব্রাহ্মসমাজের দোষ ঘোষণা করিলেও ইহার পতন নাই। সুতরাং আমাদের দ্বারা ইহার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, তাহা হয়ও নাই। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়া ব্রাহ্মসমাজ আপনি যে পতনের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, আমরা তাহার কেবল পুনরুক্তি করিয়াছি মাত্র। সমাজ অধিক দোষী কি আমরা দোষী? একথার বিচার ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা করিবে। আর যাঁহারা ধর্ম্মভীত ব্যক্তি, তাঁহারা করিবেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দোষ আছে বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ গুণশূন্য নয়। গুণশূন্য হইলে ব্রাহ্মসমাজ এতদিন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু সে কথা ব্রাহ্মসমাজের লোকের পক্ষে অধিক না বলাই ভাল। আত্ম-প্রশংসা সর্ব্বনাশের মূল।

যৌবন-বিবাহই জীবনের এক মাত্র মঙ্গলের পথ। তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, এই কথা গুলির বিশেষ আন্দোলন করাই আমাদের অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। যে কারণেই হউক,— এদেশে যৌবনবিবাহের সূত্রপাত হইয়াছে,—ইহার গতি আর ফিরিবে না,—ফিরিবার নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের পতিত সমাজের উপর দিয়া এক প্রবল পরিবর্ত্তনের স্রোত চলিয়াছে, ইহার স্রোত থামাইতে পারেন, এমন ব্যক্তি দেখি না। এই স্রোত আমাদের সমাজকে তোলপাড় করিয়া ফেলিতেছে। অনেক বিষয়ে ভালও করিতেছে, অনেক বিষয়ে মন্দও করিতেছে। আমরা দেখিতেছি, বিবাহ বিষয়েও অলক্ষিত ভাবে সমাজে একটা বিষম পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে বালিকা ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ হইত, এখন অনেক স্থলে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। কোন মহারথীর আর এ স্রোত ফিরাইবার শক্তি নাই। আমাদের বিবেচনায় পরিবর্ত্তনের এই কার্য্যটী ভাল হইতেছে। কিন্তু ভয় হয়, পাছে পাশ্চাত্য সমাজের নানা দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। আমাদের দেশে সতীত্বের যেরূপ সম্মান, অন্য কোন দেশে এরূপ সম্মান নাই। এই জন্য উভয় দেশের আইনেই বা কত পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের দেশে পত্যন্তর-গ্রহণ কত ঘৃণিত, পাশ্চাত্যসমাজে কতবার পত্যন্তর গ্রহণ হইতেছে, অথচ কোনই সম্মানের হানি নাই! আমাদের দেশে পতিতা রমণীর সমাজে স্থান নাই, পাশ্চাত্য সমাজে সেরূপ নয়। ভয় হয়, পাছে যৌবন-বিবাহ-প্রচলনের সহিত আমাদের দেশে স্বেচ্ছাচারিতা, লজ্জাহীনতা বা সতীত্ব-বোধ-হীনতা প্রচারিত হয়, পাছে বিবাহ-ভঙ্গ প্রথা স্থান পায়, পাছে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই জন্য আমরা এই গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান সময়ে এই সকল গুরুতর সংস্কারকার্য্যে অগ্রণী বলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই অধিকাংশ কথা বলিয়াছি। সংস্কারের পথে যে অগ্রসর হয়, তাহাকে অনেক সহিতে হয়; ইহা আমাদের ধারণা। ব্রাহ্ম সমাজকে এই জন্য অনেক লাঞ্ছনা

সহিতে হইয়াছে, আরও হইবে। আমরাও কতক সেই লাঞ্ছনা দিলাম। এই জন্য অনেক সহৃদয় ব্যক্তি হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছেন, জানি। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে, দেশ এবং সমাজের মঙ্গলের মমতায়, কঠোর হইতে কঠোর হইয়া আমাদিগকে এই কার্য্য পালন করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ এক দিন আমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আশা করি। আর সমগ্র দেশ,যাহার মঙ্গলের সহিত আমাদের রক্ত মাংসের জড়িত-যোগ, আশা করি, এই বিষম পরিবর্ত্তনের সময়ে ধীরতা এবং ধৈর্য্যতা সহকারে, নীতি ও ধর্ম্ম যাহাতে অপ্রতিহত ভাবে বজায় থাকে, তৎপক্ষে চেষ্টা করিবেন। আমাদের স্থির বিশ্বাস, ধর্ম্ম ও নীতি লক্ষ্য পথে না থাকিলে, এবং তাহা ব্যবহারিক জীবনে প্রতিপালিত না হইলে, দেশের কোন প্রকার মঙ্গল নাই। ধর্ম্ম মানবের সঞ্জীবনী শক্তি। ধর্ম্মই মানবের এক মাত্র চরিত্রের ভিত্তি। যে সমাজে ধর্ম্ম নাই, সে সমাজে কিছুই নাই। হিন্দু সমাজে অপ্রতিহত প্রভাবে যাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, সকলে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করুন। এক মাত্র ধর্ম্মহীনতাই বর্ত্তমান সময়ের, দারিদ্র্যই বল বা দৌর্ব্বল্যই বল, যাহা বল, সকলের মূল। অতএব যাহাতে ধর্ম্ম আবার দেশে জাগে, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্মশূন্য যৌবন-বিবাহ সর্ব্বনাশের মূল। পাশ্চাত্য সমাজ সমূহ ইহার শোচনীয় ফলভোগে পর্য্যুদস্ত হইতেছে, সাবধান সাবধান,—নব হিন্দুসমাজ এই পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া যেন সেই ধর্ম্ম শূন্য-যৌবন-বিবাহ বা সর্ব্বনাশের আকর্ষণে, জীবন প্রাণ, ধন মান অপেক্ষা অধিক পূজ্য পবিত্র চরিত্র ও ধর্ম্ম ধনে বঞ্চিত না হয়। ভারত যেন মহা অমূল্য সতীত্ব রত্নে বঞ্চিত না হয়। ভারত-রমণীর এই চিরপূজ্য, চিরোজ্জ্বল সতীত্ব রত্নের নিকট কোটী কোটী কহিনুর তুচ্ছ কথা। সাবধান, ভারত যেন এই রত্নহীন না হয়।*

* আপাততঃ এই প্রবন্ধ শেষ হইল। আবশ্যক হইলে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আবারও ইহার আলোচনা হইতে পারিবে। কিন্তু আমরা এখন আর সে ইচ্ছা রাখি না। প্রবন্ধ শেষ হইলে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাদের উত্তর দিব, প্রতিশ্রুত ছিলাম। আমাদের মূল প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার প্রায় সকল প্রধান কথাগুলির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বাকী অংশের অনেকগুলির উত্তর প্রকাশ বাবু দিয়াছেন। অবশিষ্ট গুলি অবান্তরিক কথা। সে গুলিও খণ্ডন করিয়া দেখাইতে একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সামান্য সামান্য প্রতিবাদে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিরক্ত হইয়া আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে আর আমাদের ইচ্ছা নাই। তিনি এত বিরক্ত হইবেন, পূর্ব্বে জানিলে আমরা তাঁহার প্রতিবাদ-প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতাম না। যাহা হউক, তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত -ভাবে আমাদের কোন বিরক্তির কারণ নাই। তিনি আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন,ভগবান তাঁহাকে সেজন্য ক্ষমা করুন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন অদূরদর্শী সভ্য আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন,তাহার জন্যও ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। দুর্নীতিপ্রশ্রয় পাইতেছে দেখিয়া যখন এই সমাজের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছি,তখন আর এই সমাজের সভ্যদিগের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। সুতরাং দ্বারিক বাবুর প্রবন্ধের অন্যান্য কথা কিম্বা তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় বার প্রবীণ লোকের ন্যায় যে যুক্তিতর্কহীন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও আর সমালোচনা করিব না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। গোধন-রক্ষা।— তাহিরপুর কৃষি-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ভারতবর্ষে গোজাতির দিন দিনই অবনতি হইতেছে, পীড়া, অযত্ন এবং গোমাংসাহার-প্রিয়তাই ভারতবর্ষের গো জাতির অবনতির কারণ; গোমাংস ভারতবর্ষের উপযোগী আহার নয়, প্রভৃতি বিষয় সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিয়া লোকের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। তিনি গোজাতির রক্ষার উপায় সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, কেবল গোহত্যা-নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। লেখকের শেষোক্ত মত সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু বলিতে চাহি না, তবে তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তিনি যে অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য-সাধন সম্বন্ধে গ্রন্থখানি মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

২। Helps to the Bengalee Course, for the Entrance Examination of 1888. by Sarat Chandra Mitra.— আমরা অর্থ বহি পড়ানের তত পক্ষপাতী নহি, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তাকে উৎসাহ প্রদান করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। তিনি অনেক স্থলে শব্দের অর্থগুলি বেশ পরিষ্কাররূপে লিখিয়াছেন, কিন্তু আবার কোন কোন স্থলে তাঁহার লিখিত অর্থ মূল শব্দ হইতেও কঠিন হইয়াছে। আমরা একটী উদাহরণ দিতেছি, "উল্কা"—এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ মধ্যে মধ্যে আকাশ-মার্গে জলিত হইয়া থাকে।"

৩। ভৈষজ্য-বিজ্ঞানম্।— শ্রীমতা ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়বিশারদেন সঙ্কলিতম্। প্রথমো ভাগঃ। এ গ্রন্থে কেবল পরিমাণ নির্ণয় এবং পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, এ গ্রন্থের অবয়ব আরো বর্দ্ধিত হইবে। এরূপ গ্রন্থ যত প্রচার হয়, ততই ভাল। আমরা এ অসম্পূর্ণ অবস্থায়, গ্রন্থের কোন দোষ গুণ আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করি না।

৪। বালা।— এ খানি পদ্যময় গ্রন্থ, মাইকেলের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর অনুকরণে লিখিত। গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার বালাকে বাবু যোগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের কর-কমলে সাদরে অর্পণ করিয়াছেন। সে ভালই

আর কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি আমাদিগের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাও আর নব্যভারতে স্থান পাইবে না। কারণ, প্রতিবাদের সমালোচনা যাঁহারা সহ্য করিতেপারিবেন না, তাঁহাদিগের এ পথে অগ্রসর হওয়া মহা ভুল। দ্বারিকবাবু আমাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, নানা কারণে তাহা উল্লেখ করিলাম না। তাঁহার প্রবন্ধের বাকী অবান্তরিক কথার উত্তর দিলাম না বলিয়া পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। তাঁহার কথা যাঁহারা বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারা আমাদিগকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং কুৎসা-প্রিয় ব্যক্তি মনে করিবেন। আর আমাদের কথা যাঁহাদের নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইবে, তাঁহারা তাঁহাকে সেইরূপ মনে করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত, সুতরাং সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মনে করিবেন। যাঁহার যাহা মনে করিতে হয়, করুন, আমাদের বক্তব্য আমরা এখানেই আপাততঃ শেষ করিলাম।

করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ গুণহীনা, লাবণ্য-হীনা বালাকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করাটা তত ভাল হয় নাই।

৫। অবসর-বিকাশ।—জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত। যাহারা এই গ্রন্থখানি ছাপা-ইতে গ্রন্থকর্ত্রীকে পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বন্ধুর মত কার্য্য করেন নাই। এই গ্রন্থে আমরা প্রশংসা করিবার কিছুই পাইলাম না।

৬। অবসর-চিন্তা।—শ্রীমহেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানিও পদ্যময় গ্রন্থ, দেশের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য ও দেশের কুপ্রথা সমুদয় দূর করিবার জন্য কবি দেশের লোকদিগকে কবিতায় অনুরোধ করিয়াছেন। কবিতায় যে যে গুণ থাকিলে, মানুষ মুগ্ধ হইয়া, বৈরাগী হইয়া, আত্মহারা হইয়া, অথবা মৃত্যুকে স্বর্গের সোপান মনে করিয়া কবির নির্দ্দেশানুযায়ী কায করে, অবসরচিন্তায় সেরূপ উচ্চ কোন গুণের বিকাশ নাই। তবে গ্রন্থকর্ত্তা একটী বিষয় বেশ জানেন, কি ভাবে ছবি দাঁড় করাইলে দেখিতে সুন্দর হয়, তাহা তিনি জানেন। গ্রন্থকর্ত্তার আঁকিবার শক্তি একটু ভাল থাকিলে গ্রন্থখানি সুন্দর হইত।

৭। অভিমন্যুবধ কাব্য।—শ্রীউমা-চরণ দাস প্রণীত। এখানিও কবিতা-শূন্য কাব্য, না লিখিলেই ভাল হইত।

৮। সাহিত্য-কুসুম।—শ্রীতারিণী-কান্ত মজুমদার প্রণীত। গ্রন্থখানিকে বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে, বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচনার সহিত সন্নি-বেশিত হইয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে ব্যবহার-বিরুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থখানির সৌন্দর্য্য কিছু হ্রাস করিয়াছেন।

৯। একাক্ষর-কোষঃ।—শ্রীকালি-প্রসন্ন বিট সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানিতে একাক্ষর-শব্দগুলির অর্থ সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। এ ক্ষুদ্র কোষ খানির ভাষার একখানি পুরাতন গ্রন্থ। ভাষা-জ্ঞানার্থীদিগের একবার পড়া উচিত।

১০। চিরপঞ্জিকা।—"অতীত ও ভবিষ্যৎ, চির দিনের নিমিত্ত বার এবং দণ্ড পলাদির পরিমাণের সহিত তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি পঞ্জিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ ও গ্রহ সঞ্চার গণনা করিবার সহজ উপায়" এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং গ্রন্থ খানিকে সাধারণের পাঠোপযোগী করিতেও কৃত-কার্য্য হইয়াছেন। গণনার সঙ্কেতগুলি যদি শুভঙ্করের প্রণালী মত লেখা হইত, তবে স্মরণ রাখার পক্ষে সুবিধা হইত।

১১। শব্দতত্ত্ব-কৌমুদী—শ্রীজয়-গোপাল গোস্বামি-প্রণীত। এখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ। বাঙ্গালা-ভাষা-শিক্ষার্থী উচ্চ শ্রেণীর পাঠকগণের পাঠ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।

১২। শিশু ব্যাকরণ।—শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ দাস গুপ্ত প্রণীত। এ ব্যাকরণ খানিও নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্যের উপযোগী হই-য়াছে।

১৩। The Speaker or English odioms &c. By Manmatha Nath Mastafi B. A. ইংরাজী ভাষার ইডিয়ম ফ্রেজ্ প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া উপযুক্তরূপে ব্যবহার করা ছাত্রদিগের পক্ষে বড় কষ্টকর। মন্মথ বাবুর এই পুস্তকখানি হইতে তাহারা বিশেষ সাহায্য পাইবে।

১৪। প্রবন্ধ-মুক্তাবলী।— অর্থাৎ সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রবন্ধ; ১ম সংখ্যা। এই সংখ্যায় "মঙ্গলাচরণ," "ইয়ুরোপীয় সভ্যতাই কি প্রকৃত সভ্যতা" এবং "শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার অধিকারী মহাশয় প্রণীত প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রকৃত বিজ্ঞান না বিকৃত বিজ্ঞান," এই কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রবন্ধটীতে লেখকের তর্ক শক্তির এবং লিখিবার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটীতে সেরূপ ক্ষমতার পরিচয় পাইলাম না। তৃতীয় প্রবন্ধে সূর্য্য বাবুকে লক্ষ্য করিয়া যে সমুদয় কথা বলা হইয়াছে, তাহার অনেক কথা আমাদের নিকট সুরুচি-বিরুদ্ধ ও অসঙ্গত বোধ হইল। গ্রন্থকর্ত্তা মতের দোষ, লেখার দোষ দেখাইতে অবশ্য অধিকারী, কিন্তু লেখককে উপহাস ও বিদ্রূপ করিবার প্রয়োজন কি? স্থায়ী সাহিত্যে এই রূপ ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা উচিত।

১৫। সমালোচক কাব্য।— দ্বিতীয় ভাগ, লেখক যে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে জানেন,তাহার পরিচয় এ ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ কাব্য খানির অধিকস্থলেই আছে। আজি কালিকার গ্রন্থলেখা-রোগ দূর করিবার জন্য তিনি কিছু তীব্র ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। "যেমন রোগ তেমন ঔষধ," এজন্য আমরা তাঁহাকে নিন্দা করি না।

১৬। কাননে কামিনী কাব্য।— শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সমর্থ-কোষ প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ।০ আনা। এখানি পদ্যময় গ্রন্থ। আমরা শুনিয়াছি,লেখক অন্ধ, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। এ গ্রন্থখানি সেই অনুরাগের সুফল। তাঁহার বহুযত্নপ্রসূত এই সুন্দর গ্রন্থ খানিকে আমরা তীব্র সমালোচনার আগুণে ফেলিয়া পরীক্ষা করিতে ততপ্রস্তুত নহি। পদ্যগুলির ভাষা অনেকস্থলে সরলএবং সুমিষ্ট হইয়াছে।

১৭। ভৈষজ্য নাড়ী বিজ্ঞান-চন্দ্রিকা। শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস কবিরাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত; ও শশীভূষণ দাস ডাক্তার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা প্রথমত মনে করিয়াছিলাম, গ্রন্থকর্ত্তা বোধ হয় নাড়ী পরীক্ষা সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন মত এবং নাড়ীর গতি পরিবর্ত্তনের কারণ ইত্যাদি বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, সেরূপ কিছুই করা হয় নাই। তিনি নাড়ীর গতি ও পরীক্ষা সম্বন্ধীয় যে সমুদয় শ্লোক সঙ্কলন করা উচিত মনে করিয়াছেন, তন্নাদি হইতে কেবল তাহাই সংগ্রহ করিয়াছেন। এরূপ সংগ্রহ পূর্ব্বেও দুচারি খানি বাহির হইয়াছে। কিন্তু এগ্রন্থ খানির ছাপা, কাগজ প্রভৃতি পূর্ব্ব-প্রকাশিত এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক ভাল।

১৮। ছিন্ন-হৃদয়।—উপন্যাস। বালকের সহিত বালকের বিমল প্রেম, সেই প্রেমে বিরহ, বিদ্বেষ প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা চিত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তা বোধ হয় নূতন লেখক; চিত্রের সৌন্দর্য্য, ভাবের বিকাশ বা ভাষার পারিপাট্য কিছুই তাঁহার গ্রন্থে নাই। তারপর আবার ঘটনা-সন্নিবেশেও তিনি নিতান্ত অপটু।

১৯। ভারত কামিনী।—স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ, শ্রীদুর্গাচরণ দাস গুপ্ত কবিরাজ প্রণীত।

২০। ললনা সুহৃদ—শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

এই দুই খানি গ্রন্থেই স্ত্রীদিগের শিক্ষার উপযোগী অনেক বিষয় সন্নি-

বেশিত হইয়াছে। কিন্তু দুই খানি গ্রন্থের আরম্ভে উভয় গ্রন্থকর্ত্তাই স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য এবং বিষয় সম্বন্ধে একরূপ অদ্ভূত-পূর্ব্ব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ইহাঁরা বলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাব পুরুষের স্বভাবের মত নয়, সুতরাং পুরুষের যে বিষয় জানা আবশ্যক, স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা জানিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বিভিন্ন প্রকৃতির পুরুষের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটিবে কি? মতের অংশ বাদ দিলে, গ্রন্থ দুখানিতে মেয়েদের শিখিবার অনেক কথা আছে।

২১। **রমণীর কর্ত্তব্য।**—গিরিবালা মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। যিনিই প্রকাশ করিয়া থাকুন না কেন, গ্রন্থখানিতে গৃহস্থের মেয়ের শিখিবার অনেক কথা আছে। কিন্তু জেলী, পাওয়ারুটী প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালীর বর্ণনা করিয়া যে সময় ও কাগজ নষ্ট করা হইয়াছে, দেশীয় অন্যান্য একান্ত-প্রয়োজনীয় খাদ্য (সে সমুদয় সম্বন্ধে গ্রন্থে কোন কথার উল্লেখ নাই) সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিয়া ঐ কাগজটুকু এবং সময়টা ব্যয় করিলে কি ভাল হইত না?

২২। **শান্তিজল।**—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত। কবি প্রকৃত পদার্থকে কাল্পনিক পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া, লোকের সম্মুখে, পরিচিত অথচ পূর্ব্বে-না-দেখা একরূপ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া আনিয়া উপস্থিত করেন। দর্শক সে রূপ দেখিতে দেখিতে মোহিত হয়, আবার সেই মোহের মধ্যেই প্রকৃত পদার্থকে চিনিতে পারে। নূতনত্ব-প্রিয় মনুষ্যের মন পুরাতন জিনিষের দিকে আকর্ষণ করার এটী যেরূপ অমোঘ উপায়, সেরূপ উপায় আরএকটীও নাই। যে কবির কবিতায় এইরূপ সাজসজ্জা যত, তাহার কবিতা মানুষের কাছে তত আকর্ষণ-কারিণী, তত মনোমোহিনী ও তত আদরের জিনিষ। গোবিন্দ বাবু তাঁহার কবিতাগুলিকে এ শ্রেণীর কল্পনায় সজ্জিত করেন নাই; তিনি মানব-মনের অসজ্জিত ভাবগুলির চিত্র আঁকিয়াছেন। কোন স্থানে অধিক রং দেন নাই। এই নিমিত্ত শান্তিজল সাধারণ পাঠকের নিকট বোধ হয় তত আদর পাইবে না। কিন্তু যে শ্রেণীর পাঠক নিজের হৃদয়-ভাবের ছায়া অন্য স্থানে দেখিলে সন্তুষ্ট হন, তাঁহারা শান্তিজল পড়িয়া সন্তুষ্ট হইবেন। শান্তিজলের লেখক সকল প্রকার মনোবিকারের ব্যাখ্যা করিয়াই রোগী সম্বন্ধে শান্তিজল ব্যবস্থা করিয়াছেন। শান্তিজল উচ্চ কল্পনাময়ী কবিতা নয়, কিন্তু এখানি যে প্রকৃতির বার্ণিস-ছাড়া একখানি হৃদয়গ্রাহী চিত্রফলক, সে বিষয় বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

২৩। **মা ও ছেলে।**—শ্রীচণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এখানি নূতন ধরণের পুস্তক। সন্তানকে মানুষ করিতে হইলে পিতা মাতাকে কিরূপ প্রস্তুত হওয়া উচিত, এবং কি কি উপায়ে সে রূপ প্রস্তুত হওয়া যায়, এই সমুদায় বিষয় গল্পচ্ছলে গ্রন্থকার লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। উদ্দেশ্য অতি সৎ, অতি মহৎ। আমাদের দেশের ছেলেরা মানুষ না হইলে এদেশের মঙ্গল নাই। এ কথাটী গ্রন্থকার বিশেষ রূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই একার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি স্পেন্সরপ্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেক কথা এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কাল্পনিক অংশ অতি সুন্দর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যবহারিক অংশে

সেরূপ হয় নাই। পুস্তক খানি বেচে-রের জন্য লিখিত, কিন্তু ভাষা বিশুদ্ধ এবং সরল হয় নাই। যাহা হউক, গ্রন্থকার যে মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধ হইলে আমরা সুখী হইব। একটী জীবনও যদি ইহার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়, তবেই যথেষ্ট হইল। বিধাতা গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

[illegible] সম্পূর্তি।—শ্রীরামমোহন দাস [illegible] সঙ্কল্য, শিশু-[illegible]কপে [illegible] গ্রন্থে [illegible] শত হইয়াছে। [illegible] এক খণ্ড প্রত্যেক গৃহস্থের [illegible] ঘরে থাকা উচিত। পুস্তক খানির মূল্য।৹ চারি আনা এটীও একটী বিশেষ গুণ। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা স্থানে স্থানে অনেক গুরুতর বিষয়ে আবশ্যকীয় অনেক কথা বলেন নাই। যদি তিনি পুস্তকের আকার ক্ষুদ্র করিবার জন্য এরূপ প্রনালী অবলম্বন করিয়া থাকেন, তথাপি এটীকে আমরা গুরুতর দোষ না বলিয়া থাকিতে পারি না।

২৫। দীক্ষা দর্পণম্।—শ্রীবেচারাম সার্ব্বভৌমেন প্রণীতম্। হিন্দুমাত্রেরই দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, তিনি শাস্ত্রীয় বচন অবলম্বন করিয়া এই কথা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রমাণ যে অকাট্য, তাহা নহে। যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় দ্বারাই তাহার মত খণ্ডন করা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের এ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা স্তম্ভে তত স্থান নাই। মোটের উপর তাঁহার কথাগুলি তিনি শাস্ত্র দ্বারা এক রূপ রক্ষা করিয়াছেন, তিনি কোন বিশেষ যুক্তি অবলম্বন করেন নাই। সে ভালই করিয়াছেন।

২৬। চিন্তা-প্রবাহিনী—১ম ভাগ। শ্রীপ্রিয়নাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা এই গ্রন্থখানি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। মনো-বিজ্ঞানের কঠোর প্রশ্ন সমূহ তিনি এরূপ সরল ভাবে মীমাংসা করিয়াছেন যে, তজ্জন্য তাঁহাকে সকলেরই প্রশংসা করিতে হইবে। লেখক কথোপকথনচ্ছলে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় এ প্রণালীর গ্রন্থ এই, নূতন। গ্রন্থ-কর্ত্তা যে ঘটপটের ছড়াছড়ি না করিয়া ছোট ছোট কথায় বড় বড় বিষয় [illegible] [illegible] যে কোন স্থান পাঠ করিলেই বু[illegible] সঙ্গে দশজনের মতভেদ হও[illegible] কিন্তু তাহা আর গ্রন্থকর্ত্তা দূর করিবেন কিরূপে?

২৭। অবলাবালা।—শ্রীসত্যচরণ [illegible] প্রণীত। গ্রন্থকর্ত্তা প্রায় সমুদয় স্থানেই তাঁহার উপন্যাস-লেখার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন গ্রন্থের অধিকাংশ স্থানই ভাল। কয়েকটি স্থানে মাত্র কয়েকটী দোষ লক্ষিত হয় [illegible] পিতৃশোকাতুরা বারবৎসর বয়সের মে[illegible] পুতুল লইয়া খেলা করা, মাতৃশবের [illegible] বসিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ [illegible] মেয়ের ক্ষুধা বোধ, ডাক্তারের সহিত হরিদ[illegible] বাবুর প্রথম আলাপ, দাঁতকাটাকে বিবা[illegible] করিবার নিমিত্ত দিগম্বরীর সঙ্কল্প, প[illegible] দাঁতকাটার মায়ের কাছে ১২ বৎসর[illegible] সের মেয়ে দিগম্বরীর সেই [illegible] বলা, যোগেন্দ্র নাথের আকস্মিক স্ব[illegible] মনোবিকার, এই কয়েকটী স্থানই অত[illegible] পরিমাণে অস্বাভাবিক বা অসাধারণ হ[illegible] অবলাবালা স্ত্রীলোকের একখানি ভাবপূর্ণ পাঠ্য পুস্তক।

২৮। ভারত-ভ্রমণ,—প্রথম খণ্ড, শ্রীবরদা কান্ত সেন গুপ্ত বিরচিত। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িবার নিমিত্ত লোকের মনে নানা কারণে কৌতুহল জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক শোভা, ভূতকালের বীরত্বের, আত্মোৎসর্গের, পবিত্র প্রেমের, ধর্ম্ম জীবনের, ও কঠোর অন্যান্য কর্ত্তব্য সাধনের অথবা মানসিক নিকৃষ্ট বৃত্তি নিচয়ের তুষ্টি সাধনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ যেখানে যাহা কিছু আছে, তাহার বিবরণ, সামাজিক অবস্থা, জ্ঞানাদির চর্চ্চা প্রভৃতি বিষয় পরিব্রাজকের ... জানিতে পারি ... ...গে। বরদা বাবুর ...র পাঠকের এ সকল আকাঙ্ক্ষা ...্ হয় না। তিনি সামাজিক রীতি নীতি, ...মালোচনা প্রভৃতির প্রসঙ্গ করেন নাই, ...কেবল বড় বড় জায়গার বড় বড় ঘর বাড়ী, ...টি বাট প্রভৃতি এবং তৎসম্বন্ধীয় জনশ্রুতি-...লক অথবা ঐতিহাসিক যাহা কিছু ...নেন, তাহাই তাঁহার পাঠকদিগকে ...হার প্রদান করিয়াছেন। ভারত-ভ্রমণ-...র ভ্রমণবৃত্তান্তে যাহা থাকা উচিত, ... তাঁহার গ্রন্থে নাই। তবে যাহা তাঁহার ...ে আছে, তাহা অতি সুন্দর রূপই লেখা ...াছে। লেখকের ভাষার উপর অধিকার ...ছে, তিনি অনায়াসে সরল ভাষায় অনেক ...থা প্রকাশ করিতে পারেন, সে বিষয়ে ...ান সন্দেহ নাই। তাঁহার ভাষা অতি ...জল এবং সুখশ্রাব্য।

২৯। ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত— "বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি ...চ জেলার সংক্ষেপ বিবরণ।" শ্রীরসিক ...ন্দ্যাপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, রচিত, ...কাশিত, প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড। টাইটেল পেজের ও অংশ টুকু, বোধ হয়, ছাপাইবার পূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্তা দেখেন নাই। সে যাহা হউক, এ গ্রন্থ খানির কোন কোন স্থানে সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখিয়াছেন। ইঁহার প্রদত্ত বিবরণ বরদা বাবুর পুস্তকের ন্যায় অসম্পূর্ণ নয়; কিন্তু এই গ্রন্থ খানির ভাষা স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত ছিল।

৩০। কৃপামিহির।— শ্রীকালী... প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ... এই গ্রন্থখানি বিশ বৎসর ... বোধ ... স্বর্গ-সন্দ-বাহন ... অতিশয়োক্তি-অলঙ্কারের ... আবার সেই নব-জল... গেছের বাঙ্গালা লোকে আর ভালবাসে না। লেখকের কল্পনা শক্তি আছে, তিনি ধনী লোক, তাঁহার ঘরে মূল্যবান রত্নের অভাব নাই, কিন্তু কোথায় কি ভাবে তাহা রাখিতে হইবে, তাহা তিনি জানেন না। জ্ঞানদার চরিত্রটী মন্দ আঁকা হয় নাই।

রূপসনাতন।—শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। গিরীশ বাবু বঙ্গদেশের নাট্যসমাজের রুচির বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। রূপসনাতন গ্রন্থখানিতে প্রেমে মাতোয়ারা বৈষ্ণবদিগের ও ভাবে বিভোর বৈষ্ণবীদিগের ছবি তিনি দক্ষতার সহিত চিত্র করিয়াছেন; আর রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের প্রকাশ প্রভৃতি যে সমুদয় বিষয় এই নাটক খানিমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। বৈষ্ণবদিগের এ সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস, গ্রন্থকর্ত্তা তাহাই দেখাইয়াছেন। গ্রন্থখানি নাট্যাংশে তত উৎকৃষ্ট হয় নাই, তাহার কারণ, বোধ হয়, গ্রন্থকর্ত্তাকে বাধ্য হইয়া অনেক সময় অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষের অবশিষ্ট পুস্তকের সমালোচনা আগামী মাসে যাইবে।